

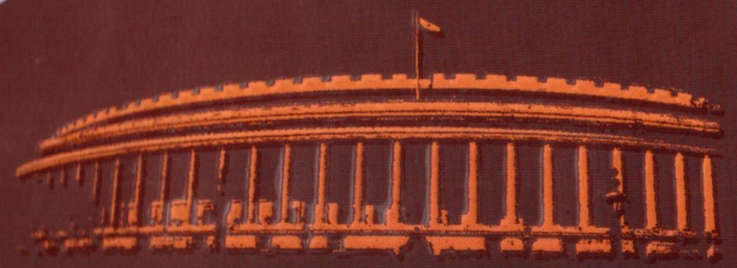
কৃষ্ণা বসুর তিনবারের পার্লামেন্টারি জীবনের অভিজ্ঞতা এই বইয়ে বিধৃত হয়েছে। বেশ এক অস্থির রাজনীতির সময়ে তাঁর পার্লামেন্টারি জীবন। দেখেছেন দেবগৌড়া, গুজরাল ও বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল। দেখেছেন বাংলায় কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে তৃণমূলের জন্ম। আফগানিস্তানের সংকট, ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার নূতন সম্পর্কের সূচনা দেখেছেন কাছে থেকে। এই কাহিনি এক বিশেষ সময়ের রাজনীতিক ও সামাজিক দলিল।



9 788177 568530

পার্লামেন্টের অন্দরমহলে • কৃষ্ণা বসু

আনন্দ



# পার্লামেন্টের অন্দরমহলে



কৃষ্ণা বসু

পার্লামেন্টের অন্দরমহলে

# পার্লামেন্টের অন্দরমহলে

কৃষ্ণা বসু

আনন্দ

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১

© কৃষ্ণা বসু

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-853-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

PERLIAMENTER ANDARMAHALE
[Memoir]
by
Krishna Basu

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

শিশিরকুমার বসুর স্মরণে
শ্রদ্ধা

যাদবপুর পার্লামেন্টারি নির্বাচন-কেন্দ্রের
সকল মানুষের প্রতি
কৃতজ্ঞতা

# নিবেদন

ইংরেজিতে আমার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হবার পর অনেকে পার্লামেন্টের দিনগুলির কথা বাংলাতে পড়তে চেয়েছিলেন। নূতন করে তাই বাংলাতে সেসব দিনের কথা আবার লিখতে হল। এই লেখার সময়ে আমার দুই পুত্র সুগত ও সুমন্ত্র ছাড়াও আর যাদের সাহায্য নানাভাবে পেয়েছি তারা কার্তিক চক্রবর্তী, সুখময় চৌধুরী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, মনোহর মণ্ডল, রাখহরি ও অমলা। তাদের সকলকে ও আনন্দ পাবলিশার্স-কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

## প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

এমন এক সময়ে আমি পাঠকদের হাতে আমার পার্লামেন্টারি জীবনের তিন অধ্যায়ের কাহিনি তুলে দিচ্ছি যখন এই বাংলার রাজনীতি এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের স্বাধীনতার ষাট বছরের মধ্যে ত্রিশ বছর আমরা এই রাজ্যে কমিউনিস্ট শাসনে অভ্যস্ত। জীবনের সব দিকে এদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। মনে হয়েছিল এরা অপরাজেয়। অবশেষে আজ বত্রিশ বছর পরে পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট শাসন অবসানের পথে। দিগন্তে দেখা দিয়েছে নূতন বিকল্প। এই পটভূমি গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। সেই পশ্চাৎপটের কিছু খণ্ডচিত্র ধরা আছে আমার এই কাহিনিতে।

আমি কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রথমবার পার্লামেন্টে যাই। আমার রাজনীতির প্রাঙ্গণে পদার্পণ মমতার অনুরোধে। সে কংগ্রেসের জনপ্রিয় যুবনেত্রী। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ চাপা বিরোধ ধীরে প্রকাশ্যে এসে পড়ছে। বিরোধের মূল কারণ মমতার কমিউনিস্ট শাসকদলের প্রতি আপসবিরোধী মনোভাব। রাজ্য কংগ্রেস সেভাবে শাসকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিতে অনিচ্ছুক অথবা অপারগ। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস দলেরও এ ব্যাপারে দোলাচল মনোভাব। মমতা তৃণমূল স্তরের কর্মীদের তার চারপাশে সংগঠিত করে তুলল। দল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আগেও তৃণমূল কর্মীদের আয়োজিত কয়েকটি সভায় আমি মমতার সঙ্গে উপস্থিত থেকেছি। বারুইপুরের একটি সভা মনে পড়ছে। মমতা, শোভনদেব ও আমি রয়েছি। মমতার জনআকর্ষণী ক্ষমতার ফলে লোকসমাবেশ যথেষ্ট।

শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ভেঙে যাওয়া ও তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক জন্মের আমি সাক্ষী। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে এক ঐতিহাসিক বিশাল সমাবেশ থেকে শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি যাত্রা। নবগঠিত দলের প্রতি মানুষের মনে বিপুল আশা। এতদিনে শাসকদলের এক প্রকৃত বিকল্প দেখা দিয়েছে।

গণতন্ত্র মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে এক মস্ত হাতিয়ার। ব্যালট বক্সের মাধ্যমে তাদের মতের প্রতিফলন ব্যক্ত করার ক্ষমতা। গত দু' দশকের বেশি সময় ধরে এই রাজ্যে মানুষের ইচ্ছার সঠিক প্রতিফলন ঘটতে দেওয়া হয়নি। একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য মানুষ প্রকৃত বিকল্পের সন্ধান পায়নি। মমতার আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহস তৃণমূল কংগ্রেসকে সেই বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

দিন সমান যায় না। ২০০১ সাল থেকে তৃণমূলের কঠিন সময়। 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' অর্থাৎ সি পি এম-এর বিরোধী আমার বন্ধু এই মনোভাব থেকে মমতা বি জে পি-র সঙ্গী হয়েছিল যদিও তার নিজের এবং তৃণমূলে আমাদের সকলের বি জে পি-র সঙ্গে আদর্শগত ফারাক ছিল দুস্তর। ২০০১ সালে মূল কংগ্রেসের সঙ্গে কাছাকাছি আসার চেষ্টা হল। বিরোধী ভোট ভাগ বন্ধ করা কত জরুরি এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত ছিল না। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হল না। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও একবার কাছাকাছি আসার চেষ্টা শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যায়। হতে পারে সময় তখনও হয়নি, সবকিছুর পরিণতি লাভের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তখনও অপেক্ষা।

আজকে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে নির্দ্বিধায় বলা যায় সময় হয়েছে। এবং তার সুযোগ নিতে হবে।

There is a tide in the affairs of men which taken at the flood, leads on to fortune.

On such a full sea are we now afloat:

অদৃষ্টপূর্ব কোনও অঘটন না-ঘটলে আগামী ২০১১ সালের নির্বাচনে তিন দশকেরও বেশি সময়ের কমিউনিস্ট শাসনের অবসানে রাজ্য নূতন শাসকদল পাবে।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে ২০০৪ সালের বিপর্যয়ের কিছুদিন পর কোনও এক উপলক্ষে ধর্মতলায় মঞ্চ বেধে তৃণমূলের সভা হচ্ছিল। দর্শকের আসনে আমি আমাদের মহিলা কাউন্সিলার, মহিলা বিধায়ক সখীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসে ছিলাম এমন সময় মমতা মঞ্চে ঘোষণা করলে, এবার কৃষ্ণাদি বক্তব্য রাখবে। এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বলতে উঠে আমি বাংলার মানুষের উদ্দেশে বলেছিলাম, "আপনারা সাবধান হবেন। পশ্চিমবাংলাকে বিরোধীশূন্য করে দেবার প্রচেষ্টা চলেছে। সংসদে আমাদের বিপুল পরাজয় হয়েছে। আমার পিছনে বিধায়কেরা বসে আছেন। আজ তারা সংখ্যায় ষাট, পরবর্তী নির্বাচনে এদের ক'জন থাকবেন সন্দেহ আছে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল একান্ত জরুরি। গণতন্ত্র বিরোধীশূন্য হয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনারাই পারেন রাজ্যকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করতে।"

মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি শুনতে পেলাম আমাদের এক নেতাকর্মী মাইকে বলছেন— আমরা কৃষ্ণাদিকে কথা দিচ্ছি আমরা কিছুতেই রাজ্যকে বিরোধীহীন করে দিতে দেব না। আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করব।

ক্ষমতার আসনে যাবার প্রাক্‌মুহূর্ত খুব কঠিন। তখন প্রমাণ করতে হয় ক্ষমতায় এলে আমি কতখানি দায়িত্বশীল হব। মমতা ঘোষণা করেছে যখন তখন রাস্তা অবরোধ চলবে না। অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সদ্য নির্বাচিত সাংসদ হবার পরই দেখলাম বেহালা এলাকায় নানা কারণে খুন-খারাপি ক্রাইম হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। আমার কর্মীরা ফোন করে, 'দিদি, অমুক স্কুলের সামনে সকালবেলা একটি লোক খুন হয়ে গেছে। বেহালা চৌরাস্তা অবরোধ করে দিয়েছি।' সে কী! আমি অসন্তুষ্ট। এই অবরোধে যে মৃত সে প্রাণ ফিরে পাবে না, খুনি পলাতক, ধরা পড়বে না। মাঝে থেকে সাধারণ মানুষের হয়রানি, ইস্কুলের গাড়িতে বাচ্চারা কাঁদছে। আমার প্রতিক্রিয়ায় কর্মীরা বিস্মিত। এরকমই হয়ে থাকে, একে বলে প্রোগ্রাম। এবার বাসে ঢিল ছোড়া, তারপর আগুন লাগানো। এ সব না হলে চলে। আমাকে নিয়ে তারা বিব্রত। মমতা আরও বলেছে যখন তখন 'বন্‌ধ' ডাকা চলবে না। আমার মনে পড়ছে একবার 'বাংলা বন্‌ধ' ডাক নিয়ে মমতার ছোট অফিসঘরটিতে আমাদের মিটিং চলছে। আমরা ঠাসাঠাসি করে বসে আছি। সবাই মতাদি দিচ্ছেন। আমি মৃদু গলায় বললাম, 'বন্‌ধ' আজকাল মানুষ আর পছন্দ করেন না। প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে বিভিন্ন দলের বারবার ব্যবহারে বন্‌ধ মানুষের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুব্রত (মুখার্জি) আমাদের নেতা, তৃণমূলের সে মেয়র, বললে, কৃষ্ণাদি যে কী বলে ঠিক নেই। বন্‌ধ ছাড়া রাজনীতি করা যায় নাকি। শুনে আমি ম্রিয়মাণ হয়ে যাই।

ক্ষমতার অলিন্দে গেলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি সব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণের প্রশ্ন এসে যাবে। তা নিয়ে চিন্তাভাবনা যথেষ্ট চলছে। কিন্তু আজ যা বলছি ও ক্ষমতাসীন হলে কী করব এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব যেন না-ঘটে। কোনও এক সময়ে একাকী মমতা তার চারপাশে ডেকে নেয়

এককালে বামপন্থী ও পরে দলত্যাগী কিছু ব্যক্তিত্ব এবং অতিবাম কোনও কোনও দল। আজ কংগ্রেস মমতার পূর্ণ সহযোগী। নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংঘাতের চোরাস্রোত দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। আজকাল শুনতে পাই জনপ্রিয়তা ও উন্নয়ন নাকি পরস্পর বিরোধী। মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কখনও অপ্রিয়, কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আবার শুধু জনপ্রিয়তার কথা ভাবলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। আমাদের বাঙালিদের জাতি হিসেবে আত্মঘাতী বলে অখ্যাতি আছে। আমরা কোন পথে চলব ভবিষ্যতই বলবে।

পিছন ফিরে দেখলে গত ষাট বছরে আমাদের এই রাজ্যের মানুষ কী চেয়েছিল আর কী পেল বা পেল না তার হিসেব মেলানো মুশকিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে মনে হয়েছিল বিদেশি শাসকের হাত থেকে মুক্তি পেলেই সব দুঃখ ঘুচবে। দেশ ভাগ নিয়ে এল আরও অনেক দুঃখ। কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের একদলীয় শাসন চলেছিল দীর্ঘকাল। ১৯৬৭ সালে শাসন ক্ষমতায় বামপন্থীদের পদার্পণ। সেবারের নির্বাচনে আরামবাগ পার্লামেন্টারি কেন্দ্রে নেহাতই দৈবচক্রে আমি বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছিলাম। শিশিরকুমার বসু ওই কেন্দ্রে তার দাদার নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। নির্বাচনের দিন হরিপালের অদূরে একটি গরিব, সংখ্যালঘু গ্রামে ছিলাম। মেয়েরা মাটির দাওয়াতে মাদুর পেতে দিয়েছেন, বসে আছি। এলাকার মানুষ সাধারণভাবে কংগ্রেস সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন। সেদিন গ্রামের কৃষকেরা আমাকে বলেছিলেন, "এবার ঘুটি পালটে দিব।" তারা কথা রেখেছিলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন গ্রামে অজয় মুখার্জির নির্বাচনি কার্যালয় থেকে শহরে ফিরছি, দেখলাম মানুষ কংগ্রেসের পরাজয়ে উল্লসিত।

মাঝের কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৭৭ থেকে একটানা কমিউনিস্ট শাসন। অন্যান্য অকাজের কথা ছাড়াও, শুধু প্রশাসনে নয়, জীবনের সর্বস্তরে যোগ্যতা বা মানবিক মূল্যবোধের চাইতে দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে তারা মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েছেন। মানুষ আবার বললে, এবার ঘুটি পালটে দিব। অনেক 'বিদ্বজ্জন' এর সমাহার হওয়াতে কথাটা মার্জিত হয়ে দাঁড়াল 'পরিবর্তন'। আজকে যারা পরিবর্তনপন্থী তাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে পরিবর্তনের দাবি যুগে যুগে উঠবে ভিন্ন সুরে। পরিবর্তনেরও পরিবর্তন চাই বলবে মানুষ। আজ যারা ক্ষমতায় যাবেন তারা পূর্বসূরিদের ক্ষমতা থেকে, পতন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তো! দম্ভ নয় বিনয়, দুর্নীতি নয় সুশাসন, নেতৃত্বের প্রতি স্তাবকতা নয় প্রকৃত আনুগত্য। আবার মানুষকেও ভাবতে হবে তারা কী চান! তাদের ভাগ্য কি আশা ও আশাভঙ্গের মধ্যে দোদুল্যমান চিরকাল।

খলিল জিব্রানের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি মনে আছে তো—

> Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpetings, and farewells him with hootings, only to welcome another with trumpetings again.

২১ জুলাই, ২০০৯ **কৃষ্ণা বসু**

বসুন্ধরা

৯০ শরৎ বসু রোড, কলকাতা ২৬

এক

## এক অন্য জীবন

সে বছর গ্রীষ্মকালে বেশ গরম পড়েছিল। আমি বলছি ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মের কথা। তবে শুধু গরমের জন্য এই গ্রীষ্ম আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে তা কিন্তু নয়। ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমার জীবনে আকস্মিকভাবে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। যে ধরনের জীবনযাত্রায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম, আমার চারপাশে যে আবহ ছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি যেন হঠাৎ দেশান্তরী হয়ে গেলাম। আমার চারপাশে হাজার মানুষের ভিড়, আমার কাছে তাদের অনেক প্রত্যাশা, অনেক দাবি। চিরদিন আমি একজন প্রাইভেট পার্সন। নিজের বইপত্র, সংগীত, অধ্যাপনার জগতে বাস করি। তার মানে এই নয় যে বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান নেই। একজন প্রফেশনাল পার্সন, কর্মরত নারী হিসেবে বাইরের জগতে যথেষ্ট বিচরণ করতে হয়। নানান সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনে জড়িত থাকার ফলে আমজনতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাও করতে হয়। বিভিন্ন লেখক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে সভা-সমিতি মতের আদান-প্রদান চলতে থাকে। কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে যে পাবলিক লাইফ শুরু হল তার চরিত্র একেবারে আলাদা। লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর 'জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে যখন বেশ বিব্রত বোধ করছি তখন নানাবিধ অভিনন্দন বার্তার মধ্যে একটি পোস্টকার্ড হাতে এল। কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষিণী লিখেছেন— ঈশ্বর যখন তোমাকে হাত ধরে দেশ ও দশের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তখন তোমার দ্বারা নিশ্চয় কোনও কাজ সিদ্ধ হবে। পোস্টকার্ডটি টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হলে হতাশা এলে পোস্টকার্ডটি মনে ভরসা দিত। শাস্ত্রে বলে, যেন বা ভবতি সুখজাতম। যা ঘটে তা নাকি শেষপর্যন্ত ভালর জন্যই ঘটে থাকে। হবেও বা।

আমার পার্লামেন্টারি জীবনের একটি অত্যন্ত ভয়াবহ অথচ ঐতিহাসিক

দিনের কথা দিয়ে এই কাহিনি শুরু করি। সেদিন লোকসভার অধিবেশন বসতে না-বসতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুলতবি হয়ে গেল। এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। প্রায়ই নানা গণ্ডগোলে অধিবেশন যখন তখন মুলতবি হয়ে যায়। ক'দিনই বা শান্তিতে কাজকর্ম করা সম্ভব হয়। অনেকে বাড়ি চলে গেলেন। অনেকে সেন্ট্রাল হল-এ বসে আড্ডা দেবেন ঠিক করলেন। খানিকক্ষণ আমিও সেন্ট্রাল হল-এ ছিলাম। অনেক বন্ধুরা ডাকাডাকি করলেন, তাদের সঙ্গে বসে কফি খাবার ও আড্ডা দেবার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ঠিক করলাম আমার অফিসে বসে একটু কাজকর্ম করব। এমনিতেই সেদিনের কোশ্চেন আওয়ার, জিরো আওয়ার সব পণ্ড হয়েছে। অফিস বলতে পার্লামেন্ট ভবনের ঠিক উলটোদিকে যে পার্লামেন্ট অ্যানেক্সি আছে সেখানে আমার অফিসঘর। সে সময়ে আমি বিদেশমন্ত্রক পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন। সেই সুবাদে পাওয়া ছিমছাম অফিসঘর। বিদেশমন্ত্রক কমিটির কাজকর্ম হয়, নানান বিদেশি রাষ্ট্রনায়ক বা ডেলিগেশন এলে তাদের এই ঘরে স্বাগত জানাই।

পার্লামেন্টের এক নম্বর গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে আমাকে দেখেই গেটের সিকিউরিটি অফিসার হাঁক দিয়েছেন, কৃষ্ণা বোস এম পি সাহেবা কো গাড়ি এক নম্বর গেট পর লে আইয়ে—এ-এ-এ। সিঁড়ির একপাশে সরে দাঁড়িয়ে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। মাঝে মাঝে গাড়ি আসতে বেশ দেরি হয়। পার্কিং জায়গাটা একটু দূরে। সেদিন বেশ তাড়াতাড়ি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গাড়ি এসে গেল। গাড়িতে উঠে শুধু রাস্তার ওপারে যাওয়া। অ্যানেক্সি ভবনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি বেশ উত্তেজনা, লোকজনেরা ছুটোছুটি করছে। বড় বড় দরজা টেনে বন্ধ করছে, ভারী পরদা টেনে দেওয়া হচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, কী হয়েছে। ওরা বললে, পার্লামেন্টে আক্রমণ হয়েছে, গুলিগোলা চলছে। আমি বললাম, অসম্ভব! আমি তো এইমাত্র সেখান থেকে এলাম, মিনিট দুয়েকও হয়নি। এগিয়ে গিয়ে জানলার পরদা সরিয়ে দেখতে যাচ্ছি পিছন থেকে সিকিউরিটির লোকজন হাঁ-হাঁ করে উঠল— ম্যাডাম জানলা খুলবেন না, পরদা সরাবেন না, শিগগির সরে দাঁড়ান।

আমার ঘরের টেলিভিশনের সামনে আশেপাশের কমিটিরুম থেকে আসা অফিসারদের জটলা। টেলিভিশনের পরদায় চেয়ে দেখি একটু আগে আমি সিঁড়ির যে ধাপে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ। খবর বলছে এক নম্বর গেটের সামনে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এক জঙ্গি গিয়েছে



প্রধানমন্ত্রী যে গেট দিয়ে ঢোকেন সেইদিকে। গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্যসভার অধ্যক্ষ যে গেট দিয়ে বার হবেন তার সামনে। এরপর আমরা বেশ অনেকক্ষণ ধরে টেলিভিশনের পরদায় এক রোমহর্ষক নাটিকা দেখলাম। সাধারণ নাটিকার সঙ্গে প্রভেদ একটাই। এখানে 'সব চরিত্র কাল্পনিক' নয়, কঠিন বাস্তব। ফিরে ফিরে দেখাচ্ছে সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা জঙ্গির মৃতদেহ। আর আমি মনে মনে চমকে উঠছি আমার গাড়ি আসতে আর যদি সামান্য দেরি হত তবে কী হত। বেলা তিনটে অবধি বন্দি ছিলাম। তিনটের সময়ে দু'জন সশস্ত্র কম্যান্ডো এসে গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দিল। গাড়িতে আমার মোবাইলে কলকাতা থেকে মমতার উদ্বিগ্ন টেলিফোন পেলাম। কলকাতার বাড়িতেও কথাবার্তা বলতে পেরেছিলাম।

আমরা অবশ্য ঠিক করলাম ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর এতবড় আঘাত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পার্লামেন্টের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখব। অর্থাৎ পরদিন লোকসভার অধিবেশন যথাসময়ে বসবে। সকালে সেই একনম্বর গেটের গাড়ি-বারান্দায় নামলাম। গাড়ি-বারান্দার দেওয়ালে গুলির দাগ। সিঁড়ি দিয়ে ঢুকেই যে নোটিশ ঘর, যেখানে আমাদের এম পি-দের নিত্য আনাগোনা সে ঘরের দেওয়ালেও গুলির চিহ্ন। বাইরে থেকে ছিটকে এসেছে গুলি। পার্লামেন্ট ভবনের অন্দরে কোনও জঙ্গি প্রবেশ করতে পারেনি। সেদিন পার্লামেন্টের সিকিউরিটি স্টাফ যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে লেখা থাকবে। সেদিন ন'জন সিকিউরিটি অফিসার নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে জনপ্রতিনিধিদের রক্ষা করেছিলেন। পার্লামেন্টের ভিতরে সিকিউরিটির লোকজনেরও অস্ত্র রাখার অনুমতি নেই। হাতে শুধু ওয়াকি-টকি। তাই দিয়ে তারা পরস্পরকে বিপদের সংকেত দিতে পেরেছিলেন। পেটে গুলি লাগা অবস্থায় পার্লামেন্টের ভারী ভারী দরজা টেনে বন্ধ করে দিতে পেরেছিলেন।

সেদিন অনেক 'যদি' নিয়ে আলোচনা হল। যদি হঠাৎ অধিবেশন বন্ধ হয়ে না যেত তবে কী হতে পারত, একজন জঙ্গিও যদি ঢুকে পড়ত তবে কী সর্বনাশই না হত। কেউ একজন মন্তব্য করলেন ইংরেজরা এমন মজবুত পার্লামেন্ট ভবন বানিয়ে রেখে গেছে বিস্ফোরক ভরতি গাড়ি নিয়ে ধাক্কা দিলেও খুব ক্ষতি করতে পারত না।

২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে জঙ্গি আক্রমণের ফলে

ভারত-পাক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকল। এত অল্প সময়ে এমন নাটকীয় অবনতি ভাবা যায় না। পাকিস্তান হাইকমিশনের দু' নম্বর অফিসার জিলানিকে বিদেশ দপ্তরে তলব করে বলা হল আপনাদের জঙ্গিদের মৃতদেহ নিয়ে যান। পার্লামেন্ট চত্বরে পাঁচজন জঙ্গির মৃতদেহ ছিল। পাকিস্তান জবাবে বললে আগে প্রমাণ দিন যে ওরা পাকিস্তানি। চাপান-উতোর চলল কূটনীতির স্তরে। সামরিক দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সাজো সাজো করে সীমান্তে দাঁড়িয়ে গেল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে ভারত-পাক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। আরও চিন্তার কারণ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান দু'দেশেরই আছে পরমাণু অস্ত্র। ২০০২ সালের মে-জুন মাসে আমি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় গেলাম। সেখানে আতঙ্কের বহর দেখে বেশ চিন্তিত হলাম। ইংল্যান্ডে আমাদের রাষ্ট্রদূত তখন রণেন সেন এবং আমেরিকাতে ললিত মান সিং। ভারতের তরফে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে যে আমরা দায়িত্বশীল দেশ, কোনও হঠকারী কাজ আমাদের তরফে অন্তত হবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তখন বাজপেয়ী। তিনি প্রথম থেকে বলে আসছেন— নো ফার্স্ট ইউজ, ভারতের দিক থেকে প্রথম আঘাত কখনওই হবে না। এত বোঝানো সত্ত্বেও আমেরিকা ও ইংল্যান্ড তাদের দূতাবাস থেকে পরিবার-পরিজনকে সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিল। সব ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হল এখন ভারতীয় উপমহাদেশে কেউ যেন না যায়। শেষ পর্যন্ত সবই যাকে বলে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'-তে পর্যবসিত হল। ধীরে বিশ্বের এই অকারণ আতঙ্কের মনোভাব কেটে গেল।

এর আগে আমরা আফগানিস্তানের ঘটনাবলি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। সেই সময়ে একদিন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মি. ব্ল্যাকউইল আমার কাছে একটা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তিনি আমাদের কমিটির কাছে আফগানিস্তান নিয়ে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেলে খুশি হবেন। একটু চিন্তা করে আমি সম্মত হলাম। সেইমতো কমিটি রুম বুক করে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললাম। বিদেশ দপ্তরে অফিসাররা খুব নার্ভাস বোধ করতে লাগলেন। ম্যাডাম, এরকম কি করা যায়! আগে কখনও হয়নি। আমি বললাম, আমাদের সমস্যা কোথায়? সমস্যা অ্যামবাসাডর সাহেবের হতে পারে। আমাদের সর্বদলীয় কমিটি হতে ব্ল্যাকউইল সাহেবকে অনেক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। অফিসারকুলের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও



মিটিং হল। কমিটির সদস্যদের তরফে অনেক প্রশ্ন হল। মি. ব্ল্যাকউইল তার মোকাবিলা করলেন।

এরপর আমার মনে হল আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে আমাদের কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো উচিত হবে। খবর পেলাম তিনি তখনও হাঁটাচলা করতে পারেন না। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামী জননায়ক আহমদ শাহ মাসুদ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হন তখন রাষ্ট্রদূত খলিলি তার ডানপাশে বসেছিলেন। তিনি গুরুতর জখম হন, অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাতে তার বাড়িতে চলে গেলাম। রাষ্ট্রদূত খলিলি-র সঙ্গে আলাপ করে আমি মুগ্ধ হলাম। একঘণ্টা ধরে তিনি আমার সঙ্গে সুফি কবিতার আলোচনা করে কাটালেন। তারপর আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হবার সেই ভয়াবহ দিনটির কথাও বললেন। মাসুদ ছিলেন তার শ্রদ্ধেয় নেতা এবং পরম বন্ধু। "বারবার ও আমাকে ভারত থেকে এসে দেখা করে যাবার জন্য আহ্বান করছিল। খুব ব্যস্ত ছিলাম তবুও এতবার ডাকছে একবার যাওয়া দরকার মনে হল। দু'জনে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হল। জালালউদ্দিন রুমির একটি শায়েরির বই আমার সঙ্গে ছিল। একটা সংস্কার আছে বইটির যে পাতা তুমি হঠাৎ খুলবে সেখানে তুমি একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী পাবে। আমরা দু'জনে বইটি খুললাম। যে শায়েরি বার হল তাতে বলছে— 'দুই বন্ধুর অনেকদিন হয়তো দেখা হবে না, আজকের দিন আনন্দ করে কাটিয়ে নাও।' ভাবলাম তাইতো আমি ফিরে যাব ভারতে অনেকদিন দেখা হবে না। সে রাত্রি দু'জনে গল্প করে কাটালাম। পরদিন সাংবাদিকের ছদ্মবেশে আততায়ীরা এল। আমাদের দিকে ক্যামেরা তাক করল, পরমুহূর্তে বিস্ফোরণ। বারোদিন পরে হাসপাতালে চোখ মেলে তাকালাম, সারা শরীরে অজস্র বোমার টুকরো। এখনও পুরোপুরি সেরে উঠতে পারিনি।"

আমি হুইলচেয়ার করে তাকে আমাদের বিদেশ দপ্তরের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে নিয়ে এলাম। তার সৌম্য চেহারা ও সম্ভ্রান্ত কথাবার্তায় সকল সদস্যরা অভিভূত হয়েছিলেন। ততদিনে বিদেশ দপ্তরের সকল সেক্রেটারিরা আমার কার্যকলাপে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আমাকে ওরা 'আনকনভেনশনাল চেয়ারপার্সন' হিসেবে মেনে নিয়েছেন অর্থাৎ আমি প্রায়ই বিধি-বহির্ভূত কাজকর্ম করব। আপত্তি করে বিশেষ লাভ নেই।

আফগানিস্তানে ভারতের তরফে আমরা পুনর্গঠনের কাজ শুরু

করেছিলাম। হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে, সড়কপথ মেরামত চলছে। ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে কাবুলে গিয়েছেন সতীশ লাম্বা। এবার আমি কমিটিতে ডেকে পাঠালাম সতীশ লাম্বাকে। অ্যামবাসাডার লাম্বা একটি নিখুঁত 'প্রেজেন্টেশন' বা বক্তব্য কমিটির সামনে রেখেছিলেন। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া বুঝতে লাম্বার বক্তব্য আমাদের খুবই কাজে লেগেছিল।

ইতিমধ্যে এক কূটনীতিক পার্টিতে পাকিস্তানের হাইকমিশনার আমাকে ধরলেন, শুনলাম আপনি আফগানিস্তান নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য শুনছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ব্ল্যাকউইলকেও ডেকেছিলেন। আমাকে কিন্তু আপনি ডাকেননি। স্মিতমুখে জবাব দিলাম রাষ্ট্রদূত ব্ল্যাকউইল আমার কাছে তার বক্তব্য রাখার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। জবাব হল, বেশ তো এই এখনই আমি আপনার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করছি, আমাকেও একটা সুযোগ দেওয়া হোক। কথাটা এড়িয়ে গেলাম। জানি কাজটা কঠিন। তবুও আমার সেক্রেটারি মিসেস ব্যাটরাকে ডেকে বললাম, সামনের হপ্তা দুয়েকের মধ্যে কোনও কমিটি রুম পাওয়া যাবে কিনা দেখুন, আর পেলে ধরে রাখুন। কোন মিটিং-এর জন্য? উনি জানতে চাইলেন। পরে বলব বললাম। একটু ভেবে দেখার সময় দরকার। এই কথোপকথনের সাতদিন পরেই পার্লামেন্টে জঙ্গি হানা। এরপর যত 'আনকনভেনশেনাল' হই না কেন এ ধরনের মিটিং-এর প্রশ্নই ওঠে না।

লোকসভার জন্য আমার নির্বাচনি প্রচার মোটেই ভালভাবে শুরু হল না। ১৯৯৬ সালে একইসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন। আমার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে আছে সাতটি বিধানসভা এলাকা। আমি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী। বিধানসভা কেন্দ্রের সাতজন কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে আমাকে যৌথভাবে নির্বাচনি প্রচার করতে হবে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র বলতে গেলে কলকাতারই একটি এলাকা। সাতটি বিধানসভার মধ্যে চারটি কলকাতায়— বেহালা পশ্চিম, বেহালা পূর্ব, কবিতীর্থ ও যাদবপুর। বাকি তিনটি কলকাতার গা-লাগোয়া গ্রামকেন্দ্রিক এলাকা— বিষ্ণুপুর পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম ও বারুইপুর। এর আগে আমার নির্বাচনি প্রচারের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯৮২ সালে যখন আমার স্বামী ডা. শিশিরকুমার বসু চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী



হয়েছিলেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ উনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে বুঝলাম এবার পরিশ্রম সাতগুণ বেশি। সাতটি বিধানসভায় ছড়ানো এলাকা। শুনলাম জনসংখ্যা পনেরো লক্ষ। দমদম লোকসভা কেন্দ্র হল বৃহত্তম, যাদবপুর দ্বিতীয়।

একদিন সকালে বেহালা পূর্ব থেকে নির্বাচনি প্রচার শুরু হল। এখানে বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী সোনালী গুহ। সোনালীর তখনও অত নামডাক হয়নি। তার একমাত্র পরিচয় সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াসঙ্গিনী', সব সময়ে মমতার সঙ্গে থাকে। তবে ঠিক এই প্রচারের সময়ে মমতা তার প্রতি দারুণ বিরূপ হয়ে আছে, প্রচারে তার হয়ে মমতা কোনও সাহায্য করবে না এমনি কী এক ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে। সোনালী ও আমি একই দিনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের হাত থেকে নির্বাচনি প্রতীক গ্রহণ করি। আমি 'ধন্যবাদ' বলে বেরিয়ে এলাম। বয়সে অনেক ছোট সোনালী সোমেন মিত্রর পায়ে হাত দিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। কোনও চতুর সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার তার ছবি তুলে পরদিন বিশেষ একটি কাগজে ছাপিয়ে দেয়। সেই ছবি দেখে মমতা ফায়ার। আমি নবাগত হিসেবে এই জটিলতাগুলো তখনও ভাল বুঝে উঠতে পারিনি। ধীরে অনেককিছু আমার কাছেও স্পষ্ট হল।

করুণাময়ী সেতুর কাছে সকালবেলা কর্মীরা জড়ো হয়েছে। প্রশ্ন হল ডানদিকে করুণাময়ী মন্দির থেকে শোভাযাত্রা শুরু হবে না বাঁদিকে গাঁধীজির ছোট আবক্ষ মূর্তি থেকে শুরু হলে ভাল হবে। রাজনৈতিক প্রচারের পক্ষে আমি গাঁধীজির মূর্তি বেছে নিলাম। মূর্তির সামনে থেকে ছোটখাটো শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। বেহালায় গলির গলি তস্য গলি। রাস্তা এবড়ো-খেবড়ো, খানাখন্দে ভরা। শোভাযাত্রার পুরোভাগে আমি। দু'পাশের জানলা থেকে বারান্দা থেকে লোকে আমাকে দেখছে। উৎসাহী কর্মীরা আমার কানে কানে বলছে— বউদি, বাঁদিকে দোতলার জানলায় তাকান, অন্যজন বলছে, দিদি ডানদিকে বারান্দায় দেখুন। দু'দিকে নমস্কার করতে করতে চলেছি, মাঝে মাঝে মাথার ঘোমটা ঠিক করছি। একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন গলিতে সবে প্রবেশ করেছি সামনে ইটের টুকরোয় পা লেগে একটা সাংঘাতিক আছাড় খেলাম। হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম, যদিও ডান হাতে অসহ্য

যন্ত্রণা। পাশের ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি থেকে একজন স্টিলের গেলাসে খাবার জল নিয়ে দৌড়ে এলেন। সঙ্গে সাংবাদিক ছিলেন তাই পদস্খলনটি খবর হল। সকলকে আশ্বস্ত করে বললাম, কিছু হয়নি, চলুন এগিয়ে যাই। দীর্ঘ শোভাযাত্রার শেষে জোকাতে একটি কর্মী সম্মেলনে যেতে হল। জোকা থেকে গাড়িতে সোজা যাদবপুর। সেখানে একটি হলঘরে বিশাল কর্মীসমাবেশ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র— 'সোনার বাংলার সোনার ছেলে সোমেন মিত্র জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে এসে পৌঁছলেন। তার সঙ্গে স্টেজে বসলাম, ছোটখাটো বক্তৃতাও দিলাম। এদিকে হাতের ব্যথা বেড়েই চলেছে। প্রচারের শেষে বাড়ি ফিরে দেখলাম ডান হাতের উপরদিক বীভৎস নীল হয়ে আছে। বহুদিনের সেবিকা অমলা ছুটে এসে ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে হাতে ঘষে দিতে লাগল। যত ঘষে ততই হাতের রং ভয়াবহ নীলচে-বেগুনি হয়ে উঠল। এমন সময় শিশিরকুমার হাসপাতালের কাজের শেষে বাড়ি এলেন। হাতের অবস্থা একঝলক দেখেই ডা. অশোক সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। অশোক হাড়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। সে বললে, ভিতরে প্রচণ্ড রক্তপাত হয়েছে, সেরে উঠতে তিন থেকে চার সপ্তাহ লাগবে। আমার হাতে প্রচারের সময় তিন থেকে চার সপ্তাহ-ই আছে। হাত একটা স্লিং বা ব্যান্ডেজ থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে বললে এইভাবেই রাখতে হবে।

এরপর কঠিন প্রচার সামনে। হাতজোড় করে নমস্কার করার উপায় নেই। ডান হাত ঝুলছে! জনতার উদ্দেশ্যে বাঁ হাত নেড়ে অভিবাদন জানাই। একটা সুবিধা কংগ্রেসের প্রতীক হল হাতচিহ্ন। তাই বাঁ হাত তুলে প্রতীক দেখাতে পারি। বেহালা পশ্চিমে প্রচার শুরু হয়েছে। সেখানে বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী কুমুদ ভট্টাচার্য। অনেকদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিক। তিনি আমাকে দেখে প্রথমে অপ্রসন্ন হলেন। বললেন, এ কী ওভাবে বাঁ হাত নাড়লে লোকে বামপন্থী ভাববে। আপনি বরং কয়েকদিন বিশ্রাম নিন। কুমুদ ভট্টাচার্যর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কিন্তু আমি ওকে নামে চিনি। আর বিশেষ একটি কারণে ওর নামটা আমার মনে রয়েছে। বেশ অনেকদিন আগের কথা, উনি তখন ছাত্রনেতা। কী কারণে কংগ্রেসের দুই উপদলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বিক্ষোভ। একদিকে কুমুদবাবু অন্যদিকে কংগ্রেসেরই লক্ষ্মীকান্ত বোস। সে সময়ে কুমুদ ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে ওরা স্লোগান দিয়েছিলেন— কুমুদ ভটচাজ—ওয়াক থুঃ। এরকম স্লোগান আমি আগে



কখনও শুনিনি। মুর্দাবাদের এই অপরূপ সংস্করণটি তাই আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল।

প্রথমে অপ্রসন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত উনি আমাকে মেনে নিলেন। আমাদের যৌথ প্রচার ভালভাবেই চলতে লাগল। বেহালা এলাকায় আমাকে ঘিরে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে মনে হল। হয়তো আমি নবাগত তাই। প্রচারে বার হলে আমাদের কর্মীরা যখন গলা ভেঙে ফেলে চিৎকার করতে থাকেন— আমাদের প্রার্থী এসে গেছেন অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু, আপনারা তাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করুন ইত্যাদি— তখন জানলা খুলে সবাই উঁকি দেন, বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। মেয়েরা হাসিমুখে হাত নাড়তে থাকেন। আমার সঙ্গে প্রচারে বার হলে ক্ষতি নেই এমনকী বাঁ হাত নাড়লেও নয়।

প্রচারের একেবারে গোড়ার দিকে বেহালায় আমাদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়েছিল। সে সময়ে বেহালায় কংগ্রেসের বেশ কিছু কাউন্সিলার ছিলেন। তাঁরা সকলে অন্যতম কাউন্সিলার ভোলাবাবুর বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। আমিও আমন্ত্রিত। একটু আড়ষ্টভাবে সভায় বসে আছি। ভোলাবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারে আবার এই ঘোড়া রোগে ধরল ক্যান? সত্যিই তো আমি হঠাৎ এই অজানা জগতে প্রবেশ করতে গেলাম কেন?

লোকসভা নির্বাচনের আগে একদিন মমতা ফোন করে বলল, কৃষ্ণাদি বাড়ি আছেন, আমি আসব। সদলবলে মমতা এল। তার সঙ্গীরা নীচের ঘরে অপেক্ষা করছিল। মমতা দোতলার বসবার ঘরে এল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে বললে, কৃষ্ণাদি লোকসভার নির্বাচনে আপনি যাদবপুরে কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন। শুনে আমি বললাম, যাদবপুর? সে তো একেবারে হেরে যাওয়া সিট। মমতা বললে, না, না আপনি জিতবেন। বলেই চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়িয়ে যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল তেমনি সবেগে প্রস্থান। আমরা দু'জন ছাড়া আর উপস্থিত ছিলেন শিশিরকুমার বসু। মমতা চলে যেতে উনি আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তুমি যেন রাজি হয়ে গেলে— আমাকে তো কই জিজ্ঞাসা করলে না। আমি একটু বিভ্রান্তভাবে বললাম, আমি কি হ্যাঁ বলেছি। আমি রাজি হয়েছি কি হইনি তা যেন খানিক অমীমাংসিত রয়ে গেল। কিন্তু পরদিন খবর কাগজ খুলে বড় হেডলাইন— 'মমতার চমক'— এরপর ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেল। যদিও শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকে বেশ কিছু সাবধানবাণী এসেছিল। সকালে খবর কাগজ দেখে অনেকে টেলিফোন

করলেন। প্রথমে মনে ভাবলাম প্রার্থীকে বুঝি সবাই অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু তা নয়। যেখানে যত আত্মীয় বন্ধু ছিলেন তারা যে বার্তা পাঠালেন তার মর্মার্থ— তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, এখনই এসব থেকে সরে দাঁড়াও। আগেই বলেছি তখন আমার হাতে আর নেই।

সংগ্রামপুর নামে একটি গ্রাম থেকে প্রকৃত অর্থে আমার সংগ্রাম শুরু হল। মগরাহাট এলাকার কিছু কর্মী এসে আমাকে ধরলেন, আপনাকে সংগ্রামপুরে একটি জনসভা করে দিতে হবে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটি জনসভা করে এসেছেন। তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমার মতো এক নবাগত রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ প্রার্থীর জন্য কোনও বড় কংগ্রেস নেতা প্রচারে আসবেন এমন আশা করা যায় না। তাই চ্যালেঞ্জটা আমাকেই নিতে হবে।

একটি বন্ধ জিপ গাড়িতে রওনা হলাম। সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে আমি। ড্রাইভার লালন আমার খুবই অনুগত হয়ে পড়েছিল। পিছনে একজন সিকিউরিটি গার্ড, এক কংগ্রেস কর্মী রতন আর এ যাত্রায় সঙ্গী ছিল সুমন্ত্র। মগরাহাট সম্বন্ধে আমাকে অনেক ভয়ের কথা শোনানো হয়েছিল। দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য, খুনখারাপি লেগেই থাকে। মানুষের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলা হয়। নির্বাচনি প্রচার সেরে সন্ধ্যার আগেই স্থানত্যাগ করা সমীচীন। আমার দেখা মগরাহাটের সঙ্গে এ ছবি সবসময়ে মেলেনি। পরবর্তীকালে মগরাহাট আমার প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। দরিদ্র মুসলমান প্রধান অঞ্চল। সাধারণ মানুষ সরল, শান্তিকামী। তবে স্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে আর বিভিন্ন মাফিয়া বাহিনী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। তারই জেরে হিংসা ও অশান্তি।

কলকাতার ধোঁয়া, ধুলো ছেড়ে জিপ গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করল। পূর্ব বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমার আর এক এলাকা। দু'ধারে কলাবাগান, বাঁশঝাড়, চারিদিক সবুজ, ছায়া সুনিবিড়। মগরাহাটের দিকে যেতে প্রকৃতি অন্যরকম। দু'ধারে বিস্তীর্ণ ধানের খেত, তার উপর রৌদ্রছায়ার খেলা চলেছে। আকাশে জলভরা মেঘ, তারই ছায়ায় ধানখেত আরও গাঢ় সবুজ। পথের মধ্যে থেমে কয়েকটা ছোটখাটো পথসভা করতে হল। সংগ্রামপুরের কাছাকাছি পৌঁছলে ওদিক থেকে আসা কর্মীরা খবর দিলে জনসভায় খুব ভিড় হয়েছে। তারা বললে আগে জানলে ইস্কুল বাড়ির মাঠে যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা



হয়েছিল সেখানে করতাম। আমরা আয়োজন করেছি চাররাস্তার মোড়ে, তার একদিকে রেললাইন। ভিড় উপছে পড়ে রেললাইনে চলে গেছে। কর্মীরা একটু আশ্চর্য হচ্ছে, আমার জন্য এত ভিড় ওদের প্রত্যাশায় ছিল না।

রাস্তার ওপর মঞ্চ অর্থাৎ একটি তক্তপোশ। তার উপর খানতিনেক টিনের চেয়ার। দুটিতে স্থানীয় দু'জন মুসলমান নেতা বসে আছেন। মাথায় সাদা টুপি, একমুখ দাড়ি। আমি তাদের পাশে বসলাম। সংগ্রামপুরের মতো ছোট জায়গার পক্ষে ভিড় সত্যিই বেশ ভাল। প্রথমে একপ্রস্থ মাল্যদান পর্ব। বিভিন্ন কর্মী মঞ্চে উঠে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের মালা পরাবেন। তারপর মঞ্চে আসীন নেতাদের মধ্যে একজন আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকে প্রার্থী হিসেবে পেয়ে তারা সুখী হয়েছেন জানালেন। এবার আমার পালা। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। আমি বললাম, আমি আপনাদের কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। আমি জানি আমার মতো আপনারাও প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে ক্লান্ত। এইটুকু শুধু বলব যদি দিল্লিতে পৌঁছই সেখানে আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করব। আপনাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ হবার ফলে হয়তো আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা সহজে বুঝব। ঠিক এই সময়ে বছরের প্রথম কালবৈশাখী আছড়ে পড়ল। প্রবল হাওয়ায় মাইক্রোফোনের তার ছিঁড়ে পড়ল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিও নামল। আশ্চর্য মানুষজন বিশেষ বিচলিত হলেন না। একজন মাইক্রোফোনের তারটা জুড়ে দিলেন। আমি আবার বলতে শুরু করলাম। সংগ্রামপুরের সেই কালবৈশাখীর সন্ধ্যা আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল।

মগরাহাটের আরও একটি প্রচারের দিন আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। সকালে পৌঁছেছি। একটি গ্রামে ঢুকব। কিন্তু কোনও যানবাহনই গ্রামে ঢুকবে না। কে যেন বললে, একটা 'ভ্যান' নিয়ে আসি। ভ্যান বলতে দুই চাকার ওপর একটা তক্তা ফেলা, সামনে একটা সাইকেল। তা সেই ভ্যানে পা ঝুলিয়ে বসলাম। সেদিন আমার প্রচারসঙ্গী বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী আবুল বাশার। তিনি একজন জবরদস্ত স্থানীয় নেতা। তবে এই মুহূর্তে মগরাহাটে ঢোকা তার পক্ষে বিপজ্জনক। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী তাকে খুন করে ফেলতে পারে। আমি ঢুকলে তিনি আমার সঙ্গে ঢোকেন তারপরই এলাকা ছেড়ে ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে থাকেন। তারও অবশ্য খ্যাতি কম নয়, হাতে আছে অস্ত্রশস্ত্র, নিজস্ব বাহিনী। ভ্যানে দু'দিকে দু'জনে পা ঝুলিয়ে বসে চলেছি। আমি মনে ভাবছি এ

কোথায় এলাম! আমার কর্মীরা অবশ্য আমাকে বলেছে মগরাহাটের মতো কঠিন জায়গায় ওর মতো প্রার্থীই প্রয়োজন। আমার মতো নিরীহ, অধ্যাপনার জগতের মানুষ এখানে একেবারে অনুপযুক্ত।

গ্রামে ঢোকামাত্র অনেক বাচ্চাকাচ্চা ও মহিলারা কলরব করে আমাকে ঘিরে ধরলেন। একজন হাতে ডাব ধরিয়ে দিলেন, সোজাসুজি চুমুক দিয়ে ডাবের জল খেতে হবে। ডাব হাতে বসে আছি, বাচ্চারা আমাকে একটু ছুঁয়ে দেখছে। কৌতূহলী মেয়েদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী আমার খুব কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর আমাকে চমকিত করে দিয়ে তিনি একটি অনুরোধ করলেন— মা, তুমি যদি জিতে আসো আমাদের একটু খাবার জল দিয়ো। আমি হতবাক। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে পশ্চিমবাংলায় পঁচিশ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের পরে আমরা দরিদ্র গ্রামবাসীর কাছে পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারিনি। সেদিন সেই গ্রামে আমি অনেক সময় কাটিয়েছিলাম। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে তাদের দারিদ্র্য ও জীবন সংগ্রামের কথা যত জেনেছিলাম অর্থনীতির বই পড়ে তার কিছুই জানা হত না। পানীয় জল নেই, প্রাথমিক ইস্কুলগুলো ভেঙে পড়েছে, ছাগল চরছে, বাচ্চারা তারই মধ্যে বসে পড়া করে। রাস্তাঘাট নেই, যেখানে আছে অবস্থা খারাপ। সেদিন তাদের 'খোদা হাফিজ' বলে বিদায় নেবার আগে পানীয় জলের অনুরোধ মাথায় রেখেছিলাম। জয়ী হবার পর তাদের সেই সামান্য অনুরোধ রাখতে পেরেছিলাম।

মগরাহাটে ফিরে ফিরে গিয়েছি। মাঠের মধ্যে বসে কৃষকদের সঙ্গে, ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে বসে গল্প করেছি। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে এলেও তাদের সঙ্গে মিশে যেতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। রমজানের সময়ে ইফতার-এ যোগ দিয়েছি তাদের সঙ্গে। মগরাহাট এলাকায় আমার সঙ্গী ছিল গিয়াসুদ্দিন মোল্লা নামে এক তরুণ কংগ্রেস কর্মী।

পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেসে চিরদিন দল-উপদলে কোন্দল লেগেই থাকে। সেই আশির দশকের গোড়ায় একবার ইন্দিরা গাঁধী কলকাতা এসেছেন, শিশিরকুমারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যখনই কলকাতা আসি প্রদেশ কংগ্রেসে কার সঙ্গে কার ভাব আর কার সঙ্গে কার শত্রুতা চলছে বুঝে ওঠা অসম্ভব হয়। আমি কংগ্রেসের সভানেত্রী কিন্তু হু ইজ ফাইটিং হুম অ্যাট



হোয়াট পয়েন্ট বুঝতে পারি না। ১৯৯৬-র লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে কংগ্রেসে দুটি ভাগ ছিল। একদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র ও তার অনুগামীরা, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সহচরবৃন্দ। মমতা কংগ্রেসের যুবনেত্রী ও সাংসদ। লোকসভায় প্রার্থী বাছাইয়ের সময়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিছু প্রার্থী সোমেনের ও কিছু মমতার পছন্দমতো হবে। মমতা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। একসময়ে ঘোষণা করে বসল প্রতিবাদে ও দাঁড়াবেই না। ওর মতে অপর পক্ষের কোনও কোনও প্রার্থী অত্যন্ত অযোগ্য এমনকী দুষ্কৃতী। এই নিয়ে সে সময়ে একটা নাটক হয়ে গেল। মমতার অফিস থেকে আমাকে ও শিশিরকুমারকে খবর দেওয়া হল যদি 'শিশিরদা' বোঝালে মমতা বোঝে। দিল্লি থেকে দ্বিগ্বিজয় সিং ফোনে শিশিরকুমারের সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু মমতা অনড়। সে তার কালো শাল গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দিয়ে বসল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মিটল এবং মমতা মনোনয়ন পত্র দাখিল করল।

নির্বাচনি প্রচারে নেমে ধীরে ধীরে আমি সোমেন ও মমতার এই দ্বন্দ্ব যে কতখানি প্রকট তা হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা আমাকে পেয়ে খুশি, তারা আমাকে কোনও দল-উপদলে চিহ্নিত করত না। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকী চতুর্থ সারির স্থানীয় নেতা হলে তারা আমাকে মমতার লোক বলে চিহ্নিত করলেন। যে সাতজন বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তাদের মধ্যে চারজন সোমেন মিত্রের অনুগামী। বেহালা পশ্চিমে কুমুদ ভট্টাচার্য, কবিতীর্থে রামপিয়ারি রাম, বিষ্ণুপুর পূর্বে মহাদেব নস্কর আর মগরাহাটে আবুল বাশার। মমতার তালিকা থেকে বারুইপুরে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বেহালা পূর্বে সোনালী গুহ আর যাদবপুরে কাকলি ঘোষদস্তিদার। কুমুদ ভট্টাচার্য, আবুল বাশার বা মহাদেব নস্করকে নিয়ে আমার তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। শুধু প্রচারের অর্থ যখন সাতটি বিধানসভায় ভাগ করে দেওয়া হল তখন মহাদেব নস্কর আমাকে বললেন, আমাকে একটু বেশি দেবেন। কত বেশি সে অঙ্কটাও আমাকে বললেন। উনি অকপটে স্বীকার করলেন প্রার্থী হবার টিকিট পাবার জন্য এক কংগ্রেস নেতাকে তিনি ওই অঙ্কের অর্থ দিয়েছেন। সরলভাবে তার নামও বললেন। মনে পড়ে শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

এরকম হয় বুঝি! পরে জেনেছিলাম এরকম আখছার হয়ে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার সব চেয়ে মুশকিল হল রামপিয়ারি রামকে নিয়ে। তিনি কিছুতেই আমার সঙ্গে তেমন সহযোগিতা করছেন না। মগরাহাট ছিল বাঙালি মুসলমান এলাকা। কবিতীর্থ উর্দুভাষী, অবাঙালি মুসলমান প্রধান অঞ্চল। আর আছে কিছু বিহারি হিন্দু যাদব সম্প্রদায়ের। এই অজানা এলাকাতে নিজের প্রচার ব্যবস্থা নিজেই করতে হল। এলাকার কিছু বিশিষ্ট মুসলমান আবাসিকের বাড়িতে গিয়ে আলাপ করলাম। বিহারি এলাকার কিছু দরিদ্র বস্তিতে পদযাত্রা, কিছু দলিত এলাকায় প্রচার। একটি অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকায় আছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি। কর্মীরা খবর দিতে লাগল রামপিয়ারি রাম শুধু অসহযোগিতা করছেন না বিরুদ্ধাচরণও করছেন। এসব খবরের সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবুও প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্রকে ফোন করে অসুবিধার কথা জানালাম। রামপিয়ারি ওঁর অত্যন্ত কাছের লোক। সোমেন আশ্বস্ত করে বললেন, চিন্তা করবেন না, ও অত্যন্ত ভাল লোক। জানেন তো সব সময়ে কাঁটাপুকুর মর্গেই পড়ে থাকে। কাঁটাপুকুর মর্গ থেকে মৃতদেহ ছাড়ানোতে সাহায্য করেন এমনি কিছু হবে মনে হল, ঠিক বুঝলাম না।

কবিতীর্থে প্রচার অবশ্য চলতে লাগল। এখানে প্রচারের চরিত্র একটু আলাদা। অটোর উপর দাঁড়িয়ে আছি, জনাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছি। বাজারের মধ্যে প্রবেশ করলাম। দু'ধারে সেমাইর স্তূপ, কেনাকাটা চলছে। কোনও দোকানে লাল নীল বাল্‌ব জ্বলছে নিভছে। আমার গলায় গাঁদা ফুলের মালার স্তূপ। শোভাযাত্রা থেকে মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে— 'জিতেগা জিতেগা' তারপর সমবেত গর্জন—'কৃষ্ণা বোস জিতেগা।' আমি চমকে উঠছি।

প্রচারের গোড়ার দিকে প্রথম একটি মোটের উপর বড় জনসভায় বক্তৃতা করতে হল বারুইপুরে। সেখানে বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শোভনদেবের সঙ্গে যৌথ প্রচার বেশ ভালভাবে চলত, কোনও সমস্যা নেই। বেশ কয়েকবার বারুইপুরে প্রচারে এসেছিলেন শিশিরকুমার বসু। বারুইপুর বাজারে, শহরের একমাত্র রাস্তাটি ধরে শিশিরকুমার, শোভনদেব ও আমি শোভাযাত্রার পুরোভাগে হেঁটে চলেছি এমন ছবি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। বারুইপুর রাসের মাঠে মস্ত বড় জনসভা হয়েছিল। বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম চারিদিকে শুধু মানুষের মাথা। মঞ্চে



শোভনদেব ও মমতা ছিল। নীচে আমজনতার সঙ্গে সুমন্ত্র দাঁড়িয়েছিল। কী বলেছিলাম ঠিক মনে নেই। কিন্তু সকলে বললে খুব ভাল বলেছি। শোভনদেব রেকর্ড করেছিলেন। তারপর তার প্রচারের অটো থেকে রোজই আমার সেই বক্তৃতা বাজতে থাকত।

বিষ্ণুপুর পূর্বে আমার সবসময়ে প্রচারসঙ্গী সুফল সর্দার। ধর্মে খ্রিস্টান একনিষ্ঠ কর্মী। এখানে গ্রামে ঢুকতে হলে জিপ থেকে নেমে অটোতে চড়ে কিছুদূর যাই, তারপর অটো ছেড়ে পায়ে হেঁটে। একবার বিষ্ণুপুরের একটি গ্রামে গিয়েছিলাম খালের মধ্য দিয়ে ডিঙি নৌকোতে। খালের জল কচুরিপানাতে বুজে গেছে। একজন কোমরজলে নেমে হাত দিয়ে কচুরিপানা ঠেলে এগিয়ে চলল, তার পিছনে আমার নৌকো।

আমার কাছে সবচাইতে কৌতূহলপ্রদ এলাকা ছিল যাদবপুর যার নামে পুরো লোকসভা কেন্দ্রটির নামকরণ। যাদবপুর কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি, লালদুর্গ বলে পরিচিত। কোনও নির্বাচনে এ পর্যন্ত যাদবপুর কেন্দ্র থেকে কোনও অকমিউনিস্ট জিততে পারেননি। লোকসভার অন্য কেন্দ্রগুলোতে মোটের উপর ভাল করলেও যাদবপুর এলাকাতে ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। ১৯৮৪-র নির্বাচনে মমতা তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে দিয়ে প্রায় একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল। মমতা তখন কংগ্রেসের এক কনিষ্ঠ কর্মী মাত্র। সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন তাকে ঘুম থেকে তুলে দিল্লির ফোন এসেছিল যাদবপুরের জন্য একটি নাম চেয়ে। তিনি মমতার নাম করেন। মমতার জয়ের জন্য তার নবাগত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, প্রচারের জনপ্রিয় ভঙ্গি যেমন কাজ করেছিল তেমনি অন্য একটি বিষয়ও যোগ হয়েছিল। ইন্দিরা গাঁধীর হত্যার পর জনমানসে একটা সহানুভূতির ঢেউ উঠেছিল। এই প্রথম কংগ্রেস পশ্চিমবাংলা থেকে ষোলোজন এম পি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। যাদবপুর সেগমেন্ট সেবারও মমতার অধরা ছিল। ১৯৯৬-তে আমি যখন লোকসভায় বিজয়ী হলাম তখনও যাদবপুর সেগমেন্টে পরাজিত হয়েছিলাম।

যাদবপুর এলাকা আমার কাছে সবসময়ে খুব কৌতূহলপ্রদ মনে হত। এখানে যারা বসবাস করেন তাদের পিতৃপুরুষ একসময়ে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসেছিলেন। দেশভাগের জন্য তারা কংগ্রেসকে দায়ী করেছিলেন, ক্ষমা করতে পারেননি। আজকে তাদের বংশধরেরা উদ্বাস্তু

কলোনির জীবন ছেড়ে নিজেদের কাজকর্ম ঘর-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব রয়ে গিয়েছে। অনেকে হয়তো প্রকৃত অর্থে বামপন্থী হয়েছেন। আমি তো বামপন্থায় দোষের কিছু দেখি না। যদি বামপন্থী শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘ সিকিশতক বিরোধীশূন্য শাসনকাজ চালাবার পরেও পশ্চিমবাংলার উন্নতির জন্য কিছুই না করে থাকেন সেটা তাদের দোষ। আদর্শ হিসেবে বামপন্থার কোনও ত্রুটি নয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বামপন্থী নেতা হিসেবে কারা পরিচিত ছিলেন? সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু। এসব কথা মাথায় রেখে আমি যাদবপুরে গিয়ে প্রচার করতে খুব উৎসুক হতাম।

আমার নির্বাচনি এজেন্ট রঙ্কু ঘোষ যাকে আমরা রঙ্কুদা বলে ডাকি তিনি আমার যাদবপুর যাওয়ার ঘোরতর বিরোধী। 'ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করে কী লাভ। ওখানে তো হারবেন। যেসব জায়গায় জিতবেন সেখানে মনোনিবেশ করুন। বেহালায় যান, কবিতীর্থে যান, বারুইপুরে আরও বেশি যান।' আমার মন বলে আমি যদি যাদবপুরে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে দু'কথা বলতে পারি তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। রঙ্কুদার অনুমতি নিয়ে, কখনও বা তাকে অমান্য করে আমি মাঝে মধ্যে যাদবপুরে যাই।

যাদবপুরে কংগ্রেসের প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মমতার কাছের মানুষ বলে পরিচিত। সি পি এম-এর প্রার্থী সেখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখনকার পুলিশ ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী। কাকলি খুব আক্রমণাত্মক প্রচার শুরু করে দিয়েছে। সে জোরালো ভাষায় সি পি এম-কে আক্রমণ করছে, তাদের ব্যর্থতার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরছে। আমাদের কর্মীরা ওর প্রচারে খুবই উৎসাহিত। আমার প্রচারের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মালিনী ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করিনি। সি পি এম-কে নাম করে কিছু বলি না। সাধারণভাবে শাসনকার্যে ব্যর্থতার নিন্দা করি। আমি বলতে চেষ্টা করি পজিটিভ কিছু কথা। আমরা এলে কী করতে চেষ্টা করব সে কথা। যাদবপুরে আমি বলি আপনাদের স্বাধীনতা ও দেশভাগ-উত্তর জীবনের সংগ্রাম আমি বুঝতে পারি। আমি পূর্ব বাংলার মেয়ে। আমি আমার নিকট আত্মীয়দের রাতারাতি সম্পত্তিশালী ধনী পরিবার থেকে নিঃস্ব হয়ে যেতে দেখেছি।

প্রথমবারে যাদবপুরে প্রচারের অভিজ্ঞতা বেশ অদ্ভুত। ক্ষুদ্র পথসভা।



আমাদের অল্প কয়েকজন চেয়ার পেতে বসে আছে। আমি ফাঁকা মাঠে বক্তব্য রাখছি। মানুষজন কেমন যেন ভীত, ত্রস্ত। বক্তৃতা দিতে দিতে লক্ষ করছি রাস্তার ওপারে পথচারী দু'-একজন থমকে দাঁড়াচ্ছেন। কেউ পিছন ফিরে দোকানে জিনিস কিনছেন কিন্তু কান রয়েছে এদিকে। অদূরে দু'-একটি জানলা খুলে গেল, এক-আধজন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সভার শেষে দু'-একজন মহিলা রাস্তা পার হয়ে এসে মৃদু গলায় বললেন— আপনার বক্তব্য আমাদের ভাল লেগেছে। সাধারণত মহিলারাই সাহস করে আসতেন, ছেলেরা নয়।

এই যাদবপুরের এক অসাধারণ পরিবর্তন আমি লক্ষ করলাম পরের দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে। ১৯৯৮ সালে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। খোলা জিপে নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়েছি। রাস্তার দু'ধারে ভিড়। মেয়েরা পথে নেমে এসেছেন। হঠাৎ করে মানুষের মনে ভয় ভেঙে গেছে। মাথার উপর সূর্য। কেউ খাবার জল নিয়ে আসছেন। কেউ বলছেন, দিদি একটা ছাতা এনে দেব, রোদে কষ্ট হচ্ছে? এইখানে একটা ছাতার কাহিনি বলে রাখি। রাজনীতিক নেতাদের একটা ধারণা আছে প্রচারের সময়ে ছাতা মাথায় দেওয়া চলবে না, মানুষ পছন্দ করে না। এখন যখন মানুষই আমার কষ্ট দূর করতে ছাতা এনে দেবেন বলছেন তখন আমি পরদিন আমার ছোট বর্মি ছাতাটা বার করলাম। মণিপুরের মোরে শহর থেকে সীমান্ত পার হয়ে বর্মার টামু শহরে ঢুকেছিলাম। টামুতে বর্মি টাকা ভাঙিয়ে ছাতাটা কিনেছিলাম। ছোট্ট গোল ছাতা, মাথাটুকু ঢেকে রাখে, মুখ দেখা যায়। তারপর থেকে সবক'টি নির্বাচনে এই বর্মি ছাতা আমার সঙ্গী ছিল। একবার এক টেলিভিশন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি এই ছাতাটা সবসময়ে ব্যবহার করেন কেন। বলেছিলাম, এটা আমার সৌভাগ্যের প্রতীক।

তবে শুধু দিনের বেলা নয়। রাতের অন্ধকারে যাদবপুরের গলিতে সভা করছি, মানুষজন উপছে পড়ছে। অত রাতে বাচ্চা কোলে মহিলারা ভিড় করছেন। এই যাদবপুর ১৯৯৬ সালের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার পরিচয় নির্বাচনের ফলেও চোখে পড়ল। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম আমি এক অকমিউনিস্ট প্রার্থী যাদবপুর সেগমেন্টে এগিয়ে গিয়ে জিতলাম। মনে পড়ছে যাদবপুরের গণনা কেন্দ্রে ঢুকে দেখলাম আমার তরুণ কর্মীদের চোখে জল। ভয় পেয়ে বললাম, কী হয়েছে। সামনে বসা ছেলেটি অবিশ্বাসের গলায় বলল,

দিদি আমরা জিতছি। সেবার আমি সকলকে আশ্চর্য করে শুধু যাদবপুরে বুদ্ধদেববাবুর জায়গায় ষোলো হাজার ভোটে এগিয়ে গেলাম।

যাহোক, এসব অনেক পরের কথা। ১৯৯৬ সালের ছবি অন্যরকমই ছিল। রঙ্কুদাকে অমান্য করে আমি মাঝে মধ্যে যাদবপুরের মানুষের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করি। ওদিকে আমাদের তেমন কোনও কর্মীও নেই। দুলাল দাসঠাকুর ও জহর দাস মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গী হন। আমি যে যাদবপুরে সময় নষ্ট করছি এ বিষয়ে রঙ্কুদার কোনও সংশয় নেই।

আমার দিন শুরু হয় কাক-ভোরে। জিপে করে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গী ড্রাইভার লালন আর নিতান্ত তরুণ এক কর্মী রতন। রতন পথঘাট খুব ভাল চেনে, মাথায় কম্পিউটার আছে, আমি তাই বলি। মগরাহাট বা বিষ্ণুপুরের গ্রামের পথে বা বেহালার অলিগলিতে পথ হারাবার ভয় নেই। কোনওদিন দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য বাড়ি ফিরতে পারি। বাঁ হাতে কাঁটা-চামচ ধরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আবার পথে। ডান হাত তো ব্যান্ডেজে ঝুলছে। কখনও মগরাহাটের বিপজ্জনক এলাকায়, কখনও বিষ্ণুপুরের গ্রামীণ রাস্তায়, কখনও বা বেহালার অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে একটার পর একটা পথসভা করতে করতে চলি। কিছুদিনের মধ্যে চেহারা হল যেন ভুশণ্ডির মাঠে পরশুরামের সৃষ্ট পেতনি। গায়ের রং 'জলে ধোওয়া পান্তুয়া'। গভীর রাতে যখন বাড়িতে ফিরি তখন আর কথা বলার অবস্থা থাকে না। কিছু খাওয়াও সম্ভব হয় না। শিশিরকুমার হাতে একটা মালটি ভিটামিনের বড়ি ধরিয়ে দেন। একটা পার্লামেন্টারি নির্বাচন যে কতটা কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপার তার কোনও ধারণাই ছিল না।

আরও একটা ব্যাপার আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। নিজের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানলাম নির্বাচনে অর্থ কতখানি জরুরি। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে বাড়ি আসা মাত্র অর্থচিন্তা। কর্মীদের নানারকম দাবিদাওয়া। প্রথমেই দেওয়াল লিখনের জন্য চুন ও রং-তুলি। তারপর নানা সাইজের কাপড়ের ব্যানার। তারপর বিভিন্ন আকৃতির পোস্টার ছেপে দেওয়া। তারপর যা অবশ্য করণীয় ভোটারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছবার জন্য স্লিপ ছেপে দেওয়া। এ ছাড়া প্রার্থীর ছবি সহ পরিচয়পত্র ও প্যামফ্লেট। তবে সবচাইতে বড় খরচ ভোটের দিন ও গণনার দিন। ভোটের দিন প্রায় হাজার দেড়েক বুথে কর্মীরা বসবে। তাদের সকালের চা-জলখাবার, দুপুরের খাওয়া, বিকেলে আর



একপ্রস্থ চা ও টা। এ ছাড়া চা-কফি-সিগারেটের অবিশ্রান্ত জোগান। গণনার দিন গণনার সেন্টারে যারা বসবে তাদের একইরকম ব্যবস্থা। গণনা শেষ না হলে দ্বিতীয় দিনে পড়বে। তখন রাতের খাওয়ারও ব্যবস্থা। তখনও ইলেকট্রনিক মেশিনে গণনা শুরু হয়নি। বিপুল অর্থের জোগান কোথা থেকে হবে ভেবে আমার সামান্য ক' ঘণ্টার রাতের ঘুম ছুটে গেল। শিগগিরই শিশিরকুমার ও আমি সর্বস্বান্ত হলাম। যেমন ইয়োরোপের কোনও কোনও দেশে আছে তেমন স্টেট ফান্ডিং বা প্রার্থীদের জন্য সরকারি সাহায্য বরাদ্দ না হলে নির্বাচনে দুর্নীতি এড়ানো সম্ভব নয়, তেমনি সৎ ও ভাল মানুষদের রাজনীতিতে আনাও সম্ভব নয়।

আমি আর মালিনী ভট্টাচার্য একই দিনে মনোনয়ন পেশ করেছিলাম। আমরা দু'জনেই ইংরেজির অধ্যাপনা করি। আমার পাশে বসা মালিনীকে আমি বললাম— যদিও আমরা একই পেশায় আছি তবু আপনার সঙ্গে আমার কখনও আলাপ হয়নি। মালিনী বললেন— না না, আপনি আমাকে খুব ভাল চেনেন, অনেক দেখেছেন। আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। আমি তো একে চিনি না। লোকমুখে শুনেছি ইনি কট্টর সিপিএম। আড়ালে ওকে স্ট্যালিনি বলে ডাকা হয়। আমি কী করে ওকে চিনব! মালিনী আমার এক অত্যন্ত প্রিয় বান্ধবীর নাম করে বললে, আমি ওর মাসতুতো বোন। আপনি আমাকে ওদের বাড়িতে ছেলেবেলায় অনেক দেখেছেন। আমার স্মৃতিতে ঝাপসাভাবে ভেসে উঠল— ফ্রক-পরা একটি ছোট মেয়ের চেহারা। আমরাও তখন স্কুলের ছাত্রী। আমার স্কুল জীবনের সেই প্রিয় বান্ধবী পরে অকালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে। আজ এই লেখা লিখতে বসে আমি সত্যি বলছি আমার মনে হল এই মেয়েটির বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারব না। কী করে দাঁড়াব! এ আমার প্রয়াত বান্ধবীর ছোট বোন। সেই মুহূর্তে রঙ্কুদা আমাকে ডাকতে এলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলে আমার ডাক পড়েছে। জীবনে নিয়তি বা ডেসটিনির একটা হাত থেকেই যায়।

আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে একটিও কটু মন্তব্য না করে সৌজন্যের সঙ্গে প্রচার চালিয়ে গেলাম। এক সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনারা দু'জনেই ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। আপনার প্রিয় ইংরেজ কবি কে? আমি বললাম, ব্রাউনিং। ঈশ্বর আছেন,

পৃথিবীতে সবই মঙ্গলের জন্য হয়— ব্রাউনিং-এর এই জীবনদর্শন আমাকে আত্মবিশ্বাস দেয়। একই প্রশ্নের জবাবে মালিনী বলেছিল তার প্রিয় কবি শেলি। 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড' তার প্রিয় কাব্য। আমাদের এই মন্তব্য কেমন করে যেন সারা ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমি যেদিন পার্লামেন্টে প্রবেশ করলাম সেদিন পঞ্জাবের কংগ্রেস এম পি শৈলজ আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন সো ব্রাউনিং ওয়ান ওভার শেলি, শেলির ওপর ব্রাউনিং এরই জয় হল। শৈলজ পরে জানলাম ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্রী।

নির্বাচনি প্রচারের শেষের দিকে শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আমাকে তীব্র আক্রমণ করে বক্তব্য রাখছেন। শুনে বেশ আশ্চর্য হলাম। আমি যে তার মনোযোগ পাব এমন আশা করিনি। এই নির্বাচনে আমি জয়ী হব এমন আশা বেশি কেউ করছিলেন না। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— কী ব্যাপার! জ্যোতিবাবু আপনাকে আক্রমণ করছেন কেন! তবে কি আপনি জিতছেন নাকি? একদিন মগরাহাট ও বিষ্ণুপুরে পরপর অনেক সভা করে রাতের দিকে শ্রান্ত অবস্থায় বেহালা পৌঁছলাম। সেখানেও পরপর অনেক নির্বাচনি সভা। সরশুনাতে পার্কে একটি বেশ বড় জনসভা চলছে। পৌঁছে দেখি সেখানে শিশিরকুমার ও সুগত উপস্থিত। নির্বাচনের শেষপর্বে আমার পুরো পরিবার আমার জন্য পথে নেমে পড়েছিল। আমার দুই পুত্র ও কন্যা যে যার মতো সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। শিশিরকুমারও কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। আমি যখন পৌঁছলাম শিশিরকুমার বক্তব্য রাখছিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে উনি বললেন— নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলতেন তার দেশই তার পরিবার। আপনারা যখন আমার পারিবারিক পরিচিতির কথা বলেন আমি বিব্রত বোধ করি। আমার পারিবারিক পরিচিতির জন্য কোনও বিশেষ কৃতিত্ব নেই। আপনারা জানবেন সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস অনুসারে আপনারা সকলে তারই পরিবারের সদস্য।

আমি যখন বলতে উঠলাম উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে দাবি উঠল জ্যোতিবাবু আপনাকে আক্রমণ করেছেন আপনি তার জবাব দিন। আমি হলে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করতাম। কিন্তু জনতা বারবার দাবি জানাতে লাগল। নির্বাচন করার সময়ে কাগজ পড়বার, টিভি দেখবার, কে কী বলল শোনার কোনও সময় থাকে না। ভাল করে তাই জানতামও না জ্যোতিবাবু কী বলেছেন। আমাকে বলা হল উনি বলেছেন আমি বসুবাড়ির একজন হয়ে,



সুভাষচন্দ্রের পরিবারের হয়ে কেন কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালাম। আমি বললাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র আই সি এস ত্যাগ করে দেশে এসে কংগ্রেসের হয়ে গাঁধীজি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে রাজনীতিতে যোগ দিলেন। তিনি পরপর দু'বার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। দেশের বাইরে থেকে যখন তার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীনতার সংগ্রাম করছিল তাদের হাতে ছিল কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা, তার মাঝখানে চরকা। নেতাজি স্বয়ং যখন এতগুলো 'খারাপ কাজ' করে ফেলেছেন আমি না-হয় একটা করেছি কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। উপস্থিত জনতা সোৎসাহে আমার সঙ্গে একমত হল। জ্যোতিবাবুর দ্বিতীয় সমালোচনা আমি ভাল বুঝতে পারলাম না। উনি নাকি বলেছেন আমি বসুবাড়ির কেউ নই। হয়তো উনি বলেছেন আমি তাদের বাড়ি বিবাহসূত্রে বধূ মাত্র। আমি জবাবে বললাম একটু আগে আপনারা আমার স্বামী ডা. শিশিরকুমার বসুর বক্তৃতা শুনছিলেন। উনি বলছিলেন নেতাজি বলতেন তার দেশই তার পরিবার— মাই ফ্যামিলি ইজ কো-টার্মিনাস উইথ মাই কান্ট্রি। তার সেই কথা অনুসারে তার দেশবাসী হিসেবে আপনাদের সকলের সঙ্গে আমিও তার পরিবারের সদস্য। সেখান থেকে জ্যোতিবাবু আমাকে ফেলে দিতে পারবেন না। এবার তুমুল হাততালি।

সাধারণত যারা নির্বাচনি বক্তৃতা করেন তারা গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে বক্তব্য রাখেন। আমি চিরদিন মৃদু গলায় বক্তৃতা করি। একবার বেহালা চৌমাথায় বক্তৃতা করে মঞ্চ থেকে নেমে আসছি, একজন বর্ষীয়ান শ্রোতা আমার কাছে এগিয়ে এসে বলেছিলেন, চিৎকার না-করেও যে নির্বাচনি বক্তৃতা করা যায় তা আপনাকে দেখে জানলাম। তা সেদিন সরশুনা পার্কে আমি মৃদু গলায় জ্যোতিবাবুর সমালোচনার জবাব দিয়েছিলাম।

আমি তো ভোর থেকে রাত অবধি বাড়ির বাইরে। বাড়িতে নীচের তলায় নির্বাচনি অফিস। সেখানে রঙ্কুদা ছাড়া আর আছে তুষার। রঙ্কুদা ও তুষার পরস্পরের বহুদিন পরিচয় আর বন্ধুত্বও গভীর। কিন্তু প্রায়ই তাদের মধ্যে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মতবিরোধও ঘটে। রঙ্কুদা রাগতভাবে বলেন— তুই চুপ করে থাক। যা বুঝিস না তাই নিয়ে কথা বলবি না। তুষার চুপ করে অনেক সহ্য করে। রঙ্কুদা অল্পেতেই মেজাজ হারান। তবে মাঝে মধ্যে তুষারেরও সহ্যর সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন সেও রাগ করে বলে, তুমি একাই সব বোঝো, কেউ

কিছু বোঝে না। খানিক তর্কবিতর্কের পর দু'জনের মধ্যে একজন 'রইল পড়ে সব, আমি চললাম' বলে বাড়ি থেকে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হন। কিছুক্ষণ বাদে যিনি নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন তিনি নীরবে ফিরে আসেন। অফিসঘরে উঁকি মেরে দেখা যায় দু'জনে গল্পগুজব করে কাজকর্ম করছেন। এই একই চিত্রনাট্য যে কতবার অভিনীত হয় তার ঠিক নেই। রঙ্কুদা আর তুষার ছাড়া আছে রতন, সে আমার সঙ্গে ঘোরে। মাঝে মাঝে রঙ্কুদার আজ্ঞাবাহক হয়ে মগরাহাট বা বিষ্ণুপুর কাগজপত্র পৌঁছতে যায়। রতনকে ধরলে আমার অফিস চালায় এই আড়াইজন। পিছন ফিরে তাকালে এই আড়াইজনকে নিয়ে আমি যে কী করে চারটে পার্লামেন্টারি ইলেকশন করেছিলাম তা ভেবে কূলকিনারা পাই না।

নির্বাচনি প্রচারের শেষদিনে আমার নিজেকে একান্ত ভারমুক্ত মনে হল। শেষ প্রচারসভা থেকে ফিরে বাড়ি এসেই ঘুমিয়ে পড়লাম। এবার যা হবার তা হোক। 'আমি যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।' নির্বাচনের প্রচারের সময়ে আমার মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হত। একদিক থেকে দেখলে জীবনে ঈশ্বরের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে কিছু চাইনি। তাই ভোট প্রার্থনা করাটাও ঠিক ধাতে নেই। আক্রমণাত্মক প্রচারও আমি কখনও করি না। আমার সঙ্গী বিধায়ক পদপ্রার্থীরা ভালই করছেন মনে হল। পুরো এলাকা হেঁটে ঘুরলে যদি জয় সুনিশ্চিত হয় তবে সোনালীর জেতা উচিত। সে ম্যাপ হাতে নিয়ে প্রতিটি রাস্তা হেঁটেছে। কুমুদ ভট্টাচার্যও ভালই করছেন। শোভনদেব রাজনীতি বোঝেন, তিনিও ঠিকপথে চলেছেন। কাকলি যাদবপুরে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক প্রচার করছে। ওর সঙ্গে আছে আমাদের ওই এলাকার একমাত্র কাউন্সিলর গোপাল। মহাদেব নস্কর ও আবুল বাশার কেমন করবেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

প্রচণ্ড গরম, অসম্ভব কায়িক পরিশ্রম, তীব্র অর্থচিন্তা সব সত্ত্বেও নির্বাচনি প্রচার আমার মন্দ লাগল না। বিশেষ অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু শিখলাম। আমার এলাকায় আছেন খুব বড়লোক মানুষ তেমনি নিতান্ত দরিদ্র জন। আছেন প্রায় চব্বিশ শতাংশ মুসলমান, বিষ্ণুপুর এলাকায় বেশ কিছু খ্রিস্টান। শিক্ষিত বাঙালি, শিক্ষাবঞ্চিত সাধারণ গরিব মানুষ। সব মিলে এক মিশ্র জনগোষ্ঠী। তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই বিপুল জনতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ।

প্রচার শেষ হতেই আমি তো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু নীচের তলায়



আমার আড়াইজনের অফিসঘর জেগে উঠল। বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা এসে ভিড় করলেন। তাদের শেষ মুহূর্তে কাজকর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রঙ্কুদা ও তুষারের মাঝেমধ্যেই কথা কাটাকাটি হয়ে মনোমালিন্য হচ্ছে। তুষার রাগ করবার সময় পাচ্ছে না। তার উপর খাবার সাপ্লাইয়ের ভার পড়েছে। নির্বাচনের দিন আমাকে সকাল সকাল উঠতে হল। আমি আর আমার ইলেকশন এজেন্ট শুধু 'বুথ' বা ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে পারব। তাই রঙ্কুদা একদিকে যাবেন আমি অন্যদিকে। আমি সবচেয়ে কঠিন জায়গা যাদবপুর বেছে নিলাম। 'রিগিং' নামে ইলেকশনের একটি বিশেষ রীতির সঙ্গে আমার পরিচয় সেই প্রথম ঘটল। আমাকে বলা হয়েছিল সি পি এম খুব ভাল সায়েন্টিফিক রিগিং করে। আমি যখন প্রথম নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি খবর বার হল তখন সি পি এম-এর এক শ্রদ্ধেয় নেতা বলেছিলেন— ও আবার দাঁড়াতে গেল কেন? আমাদের চল্লিশ হাজারের মতো ব্যবস্থা আছে। এসব কথার অর্থ আমি বুঝিনি। রিগিং শুরু হয় ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় থেকে। সি পি এম-এর কর্মীরা নিজেদের সমর্থকদের নাম যত্ন করে তোলেন। ততোধিক যত্ন করে অপর দলের সমর্থকদের নাম কৌশলে তালিকা থেকে বিলুপ্ত করেন। সি পি এম-এর আছে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত সর্বক্ষণের কর্মী। কংগ্রেসের ছেলেরা নির্বাচনের সময়ে জেগে ওঠে এবং প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করে। কিন্তু অন্য সময়ে তারা দৃষ্টিগোচর নয়। তবে নির্বাচনের ঠিক আগে বা নির্বাচনের দিনে যে ধরনের রিগিং হয় তার চরিত্র ভিন্ন। গ্রামেগঞ্জে আগের সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের ভয় দেখানো হয়, পরদিন ভোট দিতে গেলে ফল ভাল হবে না। তবু যারা যায় তাদের মারধোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। নয়তো খুব শীতল কণ্ঠে বলা হয়, তোমাদের ভোট পড়ে গেছে বাড়ি চলে যাও। শহরে অনেক মানুষের চোখের উপর বা সংবাদমাধ্যমের নজরে থাকার ফলে এসব কম হয়।

রিগিং-এর এইসব অভিযোগের মধ্যে আতিশয্য থাকতে পারে কিন্তু মূলত এসব যে সত্য সে বিষয়ে যারা ভুক্তভোগী তারা ভালই জানে। বিষ্ণুপুরের গ্রামের মেয়েরা আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল আগের সন্ধ্যায় তাদের বিধবার পরিচ্ছেদ সাদা থান দেখিয়ে বলা হয়েছিল কাল যদি বাড়ির পুরুষেরা ভোট দিতে যায় তবে এই পোশাক পরার জন্য তৈরি থাকতে হবে। যেখানে ভোট আগেই পড়ে গেছে বলা হয় সেখানেও গ্রামের মানুষ বলেছেন তর্ক

করতে তারা ভীত। এখানে বাস করতে হবে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে না।

শুধু রিগিং-এর জন্য সি পি এম বা বামফ্রন্ট বারবার জিতেছেন একথা বলা কখনওই ঠিক নয়। একথাও বলা যায় না যে বিরোধী পক্ষ ধোয়া তুলসীপাতা। সুযোগ পেলে তারাও এরকম করবেন না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সুযোগ নেই। পুলিশ ও প্রশাসন সব সময়ে শাসক গোষ্ঠীর হাতে। ২০০৬ সালে পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ইলেকশন কমিশন প্রথম কোমর বেঁধে নামলেন। পণ করলেন রিগিংমুক্ত ইলেকশন করবেন। যথাসাধ্য তারা করলেন। তবুও যখন সি পি এম তথা বামফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হল তখন অনেকে বললেন রিগিং-এর অভিযোগ মিথ্যা। সি পি এম-এর দুর্নাম এবার ঘুচল। এই অতীত কলঙ্ক মুক্ত হওয়া নিয়ে কিন্তু অনেকেই সহমত হবেন না। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূলের বিশ্বাসযোগ্যতা নানা কারণে নেমে গিয়েছে। অপরদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীরা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে পছন্দ করবেন সে বিষয়ে সংশয় নেই। অপরদিকে সম্মিলিত বিরোধী ভোট কম নয়। সেই ভোট কংগ্রেস তৃণমূলে ভাগাভাগি হয়ে বহু সিট বিরোধীদের হাতছাড়া হল। নির্বাচন কমিশন যে কঠিন ভূমিকা ২০০৬ সালে পালন করলেন যদি ২০০১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তা করতেন অথবা ১৯৯৮-তে লোকসভা নির্বাচনে করতেন হয়তো ইতিবাচক ফল পাওয়া গেলেও যেত। যাহোক, গতস্য শোচনা নাস্তি।

মানুষ গম্ভীর মুখে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন। আমি আর সুমন্ত্র যাদবপুরের পথে ঘুরছি। সুগত বাড়িতে অফিস সামলাচ্ছে, টেলিফোনের পাশে বসে আছে। গোলমালের খবর পেলে ব্যবস্থা নেবার অক্ষম চেষ্টা করছে। আমি দেখছি সি পি এম-এর লোকবল প্রচুর। প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদের কোনও এজেন্ট নেই। হয় বসাতে পারেনি, নয় তুলে দিয়েছে। বিকেলে খবর এল কোন কোন বুথ থেকে আমাদের এজেন্টরা বেরিয়ে আসতে ভীত হচ্ছে। রঙ্কুদা গাড়ি নিয়ে বার হলেন তাদের উদ্ধারকার্যে।

গণনার দিনেও সকাল সকাল উঠে পথে বার হতে হল। আমার লোকসভা কেন্দ্র এত বিশাল ও ছড়ানো যে সব কেন্দ্রে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তবুও মগরাহাট ছুঁয়ে এলাম। প্রার্থীকে দেখলে কর্মীরা উৎসাহিত হয়। বাকি সব



গণনা কলকাতায় বিভিন্ন কেন্দ্রে চলছে। আলিপুরে ইউনিভার্সিটির ভবনে বিভিন্ন তলায় যাদবপুর, বেহালা পশ্চিম, বেহালা পূর্ব গণনা হচ্ছে। দুপুরের দিকে ছবিটা অনেক পরিষ্কার হয়ে এল। বেহালা পশ্চিমে ভালভাবে এগিয়ে আছি। বেহালা পূর্বেও সামান্য হলেও এগিয়ে রয়েছি। বারুইপুরে অবস্থা ভাল। কবিতীর্থে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছি। বিষ্ণুপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সামান্য হলেও মগরাহাটে এগিয়ে রয়েছি। কিন্তু এসব খবরে কেউ তেমন খুশি নন। কারণ আমরা সবাই জানি যাদবপুরের গণনা যখন শুরু হবে তখন এমনভাবে নেমে যাব যে এসব এগিয়ে থাকা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

যাদবপুর কেন্দ্রের গণনা খুব ধীরে চলছে। বিকেল গড়িয়ে রাত হল। আমাদের কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে দেখলাম সি পি এম ক্লান্ত কর্মীদের বদলে নতুন ব্যাচ নিয়ে এল। আমাদের তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। যেমন ভাবা গিয়েছিল আমি গণনাতে যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছি। সুমন্ত্র উদ্বিগ্ন মুখে বিভিন্ন টেবিলে ঘুরে কত পিছিয়ে আছি হিসেব করছে। সুগত গম্ভীরমুখে আমার পাশে বসে আছে। যাদবপুরে আমি কততে হারব তার উপর আমার জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। স্বভাবত আমি নিস্পৃহ। জয়-পরাজয়ে আমার খুব এসে যাবে না। এক, আমি তো বিরাট চ্যালেঞ্জ জেনেই দাঁড়িয়েছি। দুই, রাজনীতি আমার জীবনের সর্বস্ব নয়। আমি প্রফেশনাল রাজনীতিক নই। কিন্তু চিন্তিতমুখে সুমন্ত্রকে গণনার টেবিলে টেবিলে ঘুরতে দেখে আমার মনে হল আমার পরাজয়ে ছেলেমেয়েরা দুঃখ পাবে। জনগণ যাকে হোক একজন প্রতিনিধি পাবেন। কিন্তু এদের জন্যই বোধহয় আমাকে জিততে হবে।

রাতের দিকে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সুগত আর সুমন্ত্র রয়ে গেল। ততক্ষণে অন্যান্য বিধানসভার প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। কুমুদ ভট্টাচার্য পরাজিত হয়েছেন। সোনালী হেরে গেছে। মহাদেব নস্কর পরাজিত। মগরাহাটে আবুল বাশার একশো ভোটে জিতেছেন, সেখানে সি পি এম পুনর্গণনা চেয়েছে। শোভনদেব বারুইপুরে চার হাজার ভোটে জিতেছেন। বিপুলভাবে কবিতীর্থে জয়ী হয়েছেন রামপিয়ারি রাম। যাদবপুরের গণনা ধীর লয়ে চলছে। একদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তদানীন্তন পুলিশ ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী অন্যদিকে কাকলি ঘোষদস্তিদার। আমি চলে আসার পর সে রাতে

যাদবপুর গণনাকেন্দ্রে তুমুল গোলমাল শুরু হয়ে যায়। গেটের কাছে প্রচণ্ড বোমাবাজি। পিস্তল হাতে কিছু লোক গণনাকেন্দ্রে ঢুকে পড়ে আমাদের কর্মীদের ভয় দেখাতে থাকে। সুগত ও সুমন্ত্র তখন সেখানে উপস্থিত। এসব খবর আমি সকালে পেলাম। ভোরবেলা উঠে ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি গেটের সামনে মোটরবাইক দাঁড়াল। অচেনা লোক চালাচ্ছেন, পিছনের সিটে বসে আছে সুমন্ত্র। সে বললে, ভোরবেলা বাইরে এসে দেখে আমাদের একটাও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। আগের রাতের গোলমালের সময় ড্রাইভারেরা গাড়ি নিয়ে কোনওমতে পালিয়ে বেঁচেছে। অতএব সে এক পথচারীর মোটরবাইকে আসীন হয়ে চলে এসেছে। আমার ড্রাইভার শম্ভু পরে জানাল সে ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভিতরে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা একটা ট্যাকসি করে গণনাকেন্দ্রে পৌঁছলাম।

কাকলি হেরে গিয়েছে। খুব কান্নাকাটি করছে, অন্যরা সান্ত্বনা দিচ্ছে। আমি আমার পরাজয়ের হার যথেষ্ট কমিয়ে এনেছি। তখনও গণনা চলছে কিন্তু জিতেও যেতে পারি। বিধানসভার বিজয়ী প্রার্থী বুদ্ধদেববাবু তার কন্যাকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন। তার নাম জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হল। একদিকে সোফায় আমি বসেছিলাম, একপাশে সুগত অন্যপাশে সুমন্ত্র। উনি আমাদের দিকে দৃকপাত করলেন না। জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন। কথাটা লিখলাম কারণ পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে যখনই সামান্য যোগাযোগ হয়েছে উনি অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী হয়ে থেকেছেন। সেদিন তার পরিচয় পাইনি।

শেষপর্যন্ত যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে আমি বিজয়ী ঘোষিত হলাম। শিশিরকুমার ধীরভাবে তার নিজের রুগি দেখা ইত্যাদি শেষ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রঙ্কুদা, তুষার, রতন আমার আড়াইজন সহকর্মী হাজির। রঙ্কুদার একমুখ দাড়ি, যুদ্ধে জয়ী কিন্তু পরিশ্রান্ত সেনাপতির চেহারায় ঘুরছেন। সাধারণ কর্মীরা উল্লসিত। কোনও এক ফাঁকে আমি মমতার বাড়িতে গেলাম। সেখানে কর্মীরা আনন্দে অধীর। আমার ও মমতার সাক্ষাতের সময়ে ঘন ঘন ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠল। সোনালী স্লোগান দিতে শুরু করল, 'যাদবপুরের লালদুর্গ ভাঙল কে?' সমবেত গর্জন 'কৃষ্ণা বসু আবার কে?' পরদিন কাগজে হেডলাইন 'যাদবপুর ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস।'

এরপর আমরা সদলবলে দিল্লি গেলাম। আমি, শিশিরকুমার, সুগত আর মমতা ও তুষার। পার্লামেন্টে গিয়ে আমাকে অনেক ফর্ম ইত্যাদি পূরণ করতে



হল। দিল্লিতে এসব কাজে আমার সহায় ছিলেন রতন মুখার্জি। সেবার আমরা কয়েকদিন থেকে ফিরে এলাম। এর কিছুদিন পর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির আদেশনামা এসে পৌঁছল। একাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনে যোগদানের নির্দেশ।

এবার আমার সঙ্গে যাবার কেউ নেই। নেতাজি ভবন থেকে কার্তিক আমার সঙ্গী হল। এরোপ্লেনে উঠে দেখলাম একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যাচ্ছেন। উনি ওর চিরাচরিত সিট প্রথম সারির বাঁদিকে বসেছেন। আমার সিট-টি প্রথম সারির ডানদিকে। ওকে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে নমস্কার করলাম। উনি মুখ তুলে আমাকে দেখলেন তারপর বললেন— তুমি যে জিতবে তা তো ভাবিনি, যাকগে যখন জিতে গেছ, ঠিক আছে—কনগ্র্যাচুলেশনস। এরকম একটি অনিচ্ছুক অভিনন্দন দেবার পর অবশ্য উনি পাশে বসিয়ে অন্য কথাবার্তা বললেন, শিশির কেমন আছে, শুনেছিলাম শরীর খারাপ। এরপর আমার বাবার কথা স্মরণ করলেন। আমার পিতৃদেব চারুচন্দ্র চৌধুরী ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা বিধানসভার অন্যতম সচিব ছিলেন। তিনি সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। সে সময়ে দুই সদস্যের বিরোধী পক্ষ ছিলেন জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। বাবাকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন— বললেন 'ভেরি লার্নেড ম্যান।'

পার্লামেন্টে শপথ নেবার দিনটি আমার বিশেষভাবে মনে আছে। নবনির্বাচিত লোকসভায় নিয়ম অনুসারে একজন প্রোটেম স্পিকার নির্বাচিত হন। সাধারণত সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বা সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য এই পদে বৃত হন। আমি যে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ লোকসভায় শপথ নিয়েছিলাম তিনবারই প্রোটেম স্পিকার ছিলেন সিপিআই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগত। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে ওকে জানবার সুযোগ হয়েছিল। উনি ছিলেন আগের কালের বিদগ্ধ পার্লামেন্টেরিয়ান। আজকের পার্লামেন্টের মান যেমন নেমে গেছে দেখে উনি দুঃখ পেতেন। শপথ নেবার রীতি হল স্পিকারের সামনে নীচে একটি মাইক্রোফোন থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে শপথবাক্য পাঠ করতে হয়। তারপর বাঁদিক দিয়ে স্পিকারের চেয়ারের কাছে গিয়ে হ্যান্ডশেক বা নমস্কার বিনিময়। এবার সিংহাসনের পিছনদিক থেকে ঘুরে ডানদিক দিয়ে নেমে এসে খাতায় সই। বিরোধী নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একপ্রস্থ নমস্কার বিনিময়।

আমার ডাক পড়লে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পাঁচ শতাধিক সদস্য উপস্থিত। কিন্তু এত লোকের মধ্যে হঠাৎ খুব একা বোধ হল। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে শপথ নিতে চলেছি কিন্তু কোনও আপনজন উপস্থিত নেই। অনেকের আত্মীয় পরিজন গ্যালারিতে রয়েছেন। আমি দু'জন ব্যক্তিকে মনে মনে স্মরণ করলাম। একজন আমার পিতৃদেব তাঁর কাছে আমার শিক্ষাদীক্ষা সব। আমাদের কালে মেয়েদের পড়াশুনোর মাঝখানে বিয়ে হয়ে যেত। বাবা বললেন আগে পড়াশুনো শেষ হোক। তার কাছেই আমার সংবিধানের পাঠ। বিধানসভা ভবনে ছেলেবেলায় বিচরণ করতে করতে পার্লামেন্টারি প্রথা প্রত্যক্ষ করেছি। আজকে বাবা নিশ্চয় মেয়েকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে শপথ নিতে দেখলে সুখী হতেন। অপর জন যাকে আমি স্মরণ করলাম তার নাম শরৎচন্দ্র বসু। তিনি শিশিরকুমারের পিতা, সম্পর্কে আমার শ্বশুরমহাশয়। কিন্তু আমি তাকে স্মরণ করছিলাম একজন জননায়ক হিসেবে যিনি স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ও ঠিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের দিনগুলিতে তার প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। স্বাধীনতা-পূর্ব দিনগুলিতে তিনি তখনকার সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমবলি তথা আজকের পার্লামেন্টের পূর্বসূরিতে কংগ্রেস দলনেতা ও বিরোধী দলনেতা। ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যে কথাবার্তা চলছে তাতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমবলিতে তিনি সদস্য ছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারে অল্পদিনের জন্য মন্ত্রী ছিলেন। মুসলিম লিগের সদস্যদের জায়গা করে দেবার জন্য গাঁধীজির নির্দেশে তিনি ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড যখন দেশভাগ—পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ মেনে নিলেন, তিনি মেনে নিতে পারেননি। বাংলা ভাগ রোধ করার জন্য তিনি সুরাবর্দি ও আবুল হাসেমের সঙ্গে স্বাধীন যুক্তবাংলার প্রস্তাব পেশ করেন। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড তা মেনে নিলেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামে শরৎচন্দ্র বসুর যে আত্মত্যাগ তার কোনও স্বীকৃতি তিনি পেলেন না। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তার আকস্মিক মৃত্যুর পর ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত রইলেন। সেই বিরাট মানুষটির আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তাকে নীরব প্রণাম জানিয়ে আমি শপথ গ্রহণ করতে এগিয়ে গেলাম।



## দুই

# পার্লামেন্টারি রীতিনীতি

পার্লামেন্টারি রীতিনীতি নিজেই ধীরে ধীরে শিখে নিলাম। কোশ্চেন আওয়ারে কীভাবে প্রশ্ন তোলা যায় বা জিরো আওয়ারে কেমন করে জরুরি প্রসঙ্গ অবতারণা করতে হয়। পার্লামেন্টে প্রথম বলার সুযোগ এল জিরো আওয়ারে। তবে মেইডেন স্পিচ বা প্রথম বক্তৃতা দিলাম আর একটু পরে। বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলাম। চিদাম্বরম তখন অর্থমন্ত্রী। সে সময়ে মনমোহন সিং রাজ্যসভায় কংগ্রেস সদস্য। তিনি আমাকে, পৃথ্বিরাজ চৌহানকে, আরও দু'-একজন যারা বিরোধীদল অর্থাৎ কংগ্রেসের তরফে বাজেটের ওপর বলব তাদের ডেকে একটু অর্থনীতি বুঝিয়েছিলেন। সে সব কথায় পরে আসছি।

বৃহত্তম একক দল হিসেবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গড়ার ডাক পেতে পারত। কিন্তু নরসিমহা রাও জানালেন পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তিনি সরকার গড়বেন না। তখন বিজেপি-র ডাক পড়ল। অটলবিহারী বাজপেয়ী তেরোদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন। তেরোদিনের মাথায় তিনি লোকসভায় বক্তৃতা করে জানালেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি শংকরদয়াল শর্মার কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে চলেছেন। তার দলেরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না আর অন্য কোনও দলও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সময়ে একাদশ লোকসভার প্রথম যুক্ত অধিবেশন বসেছিল। সেই প্রথম আমি যুক্ত অধিবেশন দেখলাম। সেন্ট্রাল হল-এ লোকসভা ও রাজ্যসভার সকল সদস্যরা আসন গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, স্পিকার সকলে শোভাযাত্রা করে এসে হল-এ ঢোকেন। বেশ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আমি পরে যখন বিদেশ দপ্তর পার্লামেন্টারি কমিটির

চেয়ারপার্সন হলাম তখন যুক্ত অধিবেশনে সামনের দিকে আমার ভাল সিট থাকত কিন্তু আমি কখনও সেখানে বসতাম না। আমি পিছন দিকে গিয়ে বসতাম। সেখান থেকে এই বর্ণময় শোভাযাত্রা ভাল দেখা যেত। রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে সরকারের নীতির রূপরেখা বিধৃত করেন। রাষ্ট্রপতি ইংরেজিতে বক্তৃতা করলেন তারপর কী জানি কেন সেবার হিন্দিতে তর্জমা পড়ার ভার পড়েছিল রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ নাজমা হেপতুল্লার উপর। বক্তৃতার মাঝামাঝি একজায়গায় গোহত্যা বন্ধ করার কথা ছিল। মমতা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'নো-নো' বলে চিৎকার করে উঠল। ও বসেছিল বসুন্ধরা রাজে ও আমার মধ্যিখানে। আমরা দু'দিক থেকে ওর আঁচল ধরে টেনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। কারণ রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার সময়ে বাধা সৃষ্টি করা পার্লামেন্টারি রীতি বিরুদ্ধ কাজ। মমতা রাগতভাবে একাই ওয়াক আউট করল। নাজমা সামান্য থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে ধীরভাবে পুরোটা পড়ে ফেলল।

প্রথমদিকে থাকার জায়গা পাইনি। বঙ্গভবনে একটা ঘর দিয়েছিল। মমতা বললে একা না থেকে কয়েকদিন আমার কাছে এসে থাকুন। মানুদা (সিদ্ধার্থ রায়) একদিন ফোন করেছিলেন। তিনিও তাই মত দিলেন।

মমতাকে ১৯৮২ সাল থেকে ভালভাবে চিনি। ১৯৮২-তে শিশিরকুমার বসু চৌরঙ্গি থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী। মমতা অনেক সময়ে আমার নির্বাচনি প্রচারসঙ্গী। বড় বড় হাইরাইজ বাড়িতে দু'জনে লিফটে চড়ে উঠে যাই। তারপর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে প্রচার করতে করতে নেমে আসি। মমতা শিশিরকুমারের সঙ্গেও চৌরঙ্গিতে সতেরোটা বস্তিতে প্রচারে গেছে। তার নিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতা আমাদের দু'জনকে মুগ্ধ করেছিল। পথে ঘুরতে ঘুরতে মমতা আমাকে বলত, আমার রাজনীতি করতে খুব ভাল লাগে। ইস্কুল জীবন থেকে করছি। আমি সারাজীবন রাজনীতি করব। রাজনীতিতে অল্পবয়সি মেয়েটির প্রবল উৎসাহ দেখে আমার ভাল লাগত। একবার রাজীব গাঁধী নেতাজি ভবনে এলেন। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে মমতা উপস্থিত ছিল। শিশিরকুমার তাকে রাজীবের সামনে উপস্থিত করে বললেন— এই মেয়েটি খুব ভাল কর্মী। রাজীব চলে যাবার পর মমতা বলেছিল, শিশিরদা আপনি যা করলেন অনেক নেতাই তা করেন না, কর্মীকে কেউ এগিয়ে দেয় না। ঘটনাচক্রে এর কিছুকাল পরেই মমতা যাদবপুর থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জিতে সংসদে গেল। পরবর্তীকালে সে জননেত্রীতে পরিণত হয়েছে। একনিষ্ঠ



কর্মী থেকে তার নেতৃত্বে উত্তরণ আমি চোখের উপর দেখেছি। তবুও সেই প্রথম অধিবেশনের সময়ে তার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন কাটাবার ফলে তাকে আরও কাছে থেকে দেখলাম। মমতার মানসিকতা খুব জটিল। একদিকে আছে শিশুসুলভ সরলতা, একটু মিষ্ট ব্যবহারে গলে যায় অপরদিকে রাজনীতিক সুলভ কূটবুদ্ধি, চারপাশে সকলের প্রতি অবিশ্বাস, একবার কাউকে শত্রু বলে চিহ্নিত করলে তার প্রতি নির্মম ভাবে কঠোর। আবার এক এক সময়ে এক এক জনের প্রতি প্রবল আস্থা ও পরে তার জন্য আঘাত পেয়ে অনুশোচনা।

এইখানে একটা কাহিনি বলি। গোপালকৃষ্ণ গাঁধী পশ্চিমবাংলায় রাজ্যপাল হয়ে আসার পর একদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এক ডেলিগেশন গেল। মমতা নেতৃত্ব দিচ্ছে, আমিও আছি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে নালিশ জানানোর এই পদ্ধতি আমার মনঃপূত নয়। তবুও মাঝে মাঝেই রাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যপাল অনেকের কাছে যেতে হয়েছে। আমার মনে হত নালিশ জানানো একধরনের অক্ষমতার পরিচয়। আর জানিয়ে যে কিছু সুফল পেয়েছি তাও নয়। যা হোক, গোপালকৃষ্ণ গাঁধীর সঙ্গে আমার যথেষ্ট ব্যক্তিগত পরিচয় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মমতার সঙ্গে সেদিনই তার প্রথম সাক্ষাৎ। উনি মমতাকে বললেন, প্রথমেই বলি আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে আছি। আপনার কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। আপনার যারা বন্ধু তাদের কাছে যেমন, আপনার যারা বন্ধু নন তাদের কাছেও তেমনি শুনেছি। তবে তারা সকলে আমাকে একটি কথা বলেছেন। বলেছেন, (নীরবতা, আমার তরফে কিঞ্চিৎ সাসপেনস)— তারা বলেছেন, ইউ আর ইউনিক (you are unique) আপনি অনন্য। এর ব্যাখ্যা শত্রু-মিত্র বিভিন্ন ভাবে হয়তো করবেন। কিন্তু এই মন্তব্যের মধ্যে মমতার চরিত্রের একটি মূল্যায়ন অবশ্য আছে।

আমি আর মমতা অনেক রাত অবধি গল্প করি, গান করি। সি পি এম একবার মমতার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। মমতা বলে তারপর থেকে ওর রাত্রি-দিন গোলমাল হয়ে গেছে। সে সারারাত ঘুমোতে পারে না, ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে। গভীর রাত অবধি গান করি আমরা। 'কৃষ্ণাদি, রবীন্দ্রনাথের অমুক গানটা জানেন?' 'হ্যাঁ, জানি।' রাত গভীর হলে আমার ঘুম পেয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ি। পরের রাতে মমতা

খানিক অভিমান ভরে বলে, 'কাল অমুক গানটা গাইবার সময়ে আপনি তো ঘুমিয়ে পড়লেন।' লজ্জিত হয়ে বলি, 'ঠিক আছে আজকে গাও, ঘুমবো না।' মমতা বলে 'প্রমিস?' 'ঠিক আছে, প্রমিস।' আমরা গান ধরি- 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো'।

মমতার হঠাৎ মত বদল, আবেগ তাড়িত হওয়া, রেগে উঠে নানা অদ্ভুত কান্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলা দেখে পার্লামেন্টে দলমত নির্বিশেষে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি ওর সঙ্গে কীভাবে চালান! আপনি নিজে তো একেবারে অন্যরকম। আমার তরফে ওর প্রতি আছে স্নেহ। যখন মঞ্চে মমতা উপস্থিত থাকে দেখতাম যারা বক্তৃতা করেন তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় আনুগত্য প্রদর্শনের। 'আমার নেত্রী' বলতে বলতে প্রায় দেবীর পর্যায়ে তুলে ফেলেন। আমি বক্তৃতা করতে উঠলে মমতাকে সম্বোধন করি— 'আমার স্নেহের কল্যাণীয়া মমতা।' মমতাকে তার ভালমন্দ সবমিলিয়ে আমি গ্রহণ করেছিলাম। সেই প্রথম দিকে দিল্লির সব খবর কাগজে আমাদের দু'জনের হাসিমুখ ছবি ছাপা হয়েছিল। বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক ছবিটির তলায় কমরেড-ইন-আর্মস এর বদলে লিখেছিলেন— মাদার ইন আর্মস।

নর্থ অ্যাভেনিউতে একটি বাড়ি পাবার পর আমি দিল্লিতে নিজের সংসার করলাম। শিশিরকুমার ও আমি সরোজিনী নগর মার্কেট, খান মার্কেট আরও কোথায় কোথায় ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। মনে হল যেন নুতন বিয়ের পর সংসার পাততে চলেছি। প্রথমে দু'জনের মতো কাপ-প্লেট-গেলাস, কম্বল-বালিশ-চাদর। কিন্তু ধীরে অতিথি সমাগম বাড়তে লাগল অনুপাতে সাংসারিক টুকিটাকিও বেড়েই চলল। বসবার ঘরের একপাশে টেবিলে সুগত কমপিউটার সেট আপ করে দিল। সেখান থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য প্রশ্ন, জিরো আওয়ারের জন্য বক্তব্য তৈরি করে পাঠানো শুরু হল।

প্রথম জিরো আওয়ারে বলার সুযোগ হল, তার কিছুকাল পরে প্রথম পার্লামেন্টারি বক্তৃতা বাজেটের ওপর। সেদিন জিরো আওয়ারে মহিলা-বিল-এর উপর একটি প্রশ্ন জমা দিয়েছিলাম। বলতে সুযোগ হবে এমন কোনও কথাই নেই। এক একদিন সময় ফুরিয়ে যায় পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যের মধ্যেই। সেদিন একেবারে প্রথমেই স্পিকার আমার নাম ডাকাতে চমকে উঠে দাঁড়ালাম। এবারের নির্বাচনের আগে মহিলাদের জন্য পার্লামেন্টে ও



বিধানসভায় তেত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হবে এমন একটা প্রতিশ্রুতি প্রায় সব রাজনৈতিক দলই দিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন ছিল কবে এই বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হবে, কবেই বা আমরা এই বিল পাশ করব। চারিদিক থেকে উৎসাহব্যঞ্জক টেবিল চাপড়ানো শুনতে পেলাম। অনেকেই আমাকে সমর্থন করলেন। কেউ বললেন আলোচনার দরকার কী। এ তো সর্বসম্মতিক্রমে এমনিতেই পাশ করিয়ে দেওয়া যায়। যাহোক, মোটের উপর স্থির হল এই অধিবেশনেই বিলটি আনা হবে ও পাশ করানো হবে। এ হল ১৯৯৬ সালের কথা। তারপর ভারতের সব নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেল। বিল-এর ভাগ্য যথা পূর্বং তথা পরং। পরবর্তীকালে প্রথমে এই বিল নিয়ে ও পরে যখন বুঝলাম এ বিল এই চেহারায় পাশ হবার বিশেষ আশা নেই তখন তার বিকল্প নিয়ে আমি অনেক লড়াই করেছি। কিন্তু সেদিন প্রথম জিরো আওয়ারে বলে ও তার প্রতিক্রিয়া দেখে খুবই প্রীত হয়েছিলাম।

নতুন সরকারের বাজেট অধিবেশন চলছে। কংগ্রেসের চিফ হুইপ সন্তোষমোহন দেব জিজ্ঞাসা করলেন বাজেটে আমি বলতে চাই কিনা। অতএব আমার প্রথম বক্তৃতা পার্লামেন্টে যাকে 'মেইডেন স্পিচ' বলে তা হল বাজেটের ওপর। অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বাজেট পেশ করেছেন। আমি যথাসাধ্য পড়াশুনো করে তৈরি হলাম। তবে পার্লামেন্টের রীতি অনুসারে সব সময়ে 'extempore' অর্থাৎ কাগজ না দেখে মন থেকে বলতে হয়। অনেকদিন প্রফেসরগিরি করার ফলে এ ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধা নেই। উঠে দাঁড়ালে যে-কোনও বিষয়ে বক্তব্য রাখতে দ্বিধা নেই। অনেক নবনির্বাচিত এম পি-কে দেখেছি নার্ভাস বোধ করেছেন। চিদাম্বরম বাজেট বক্তৃতায় নানা ভাষায় অনেক কবিতা বলেছিলেন। আমি বললাম, কবিতা তো শুনলাম, কিন্তু 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।' চিদাম্বরম মাথা নেড়ে শুনছিলেন। এখানে আগেই বলেছি মনমোহন সিং তখন প্রবীণ কংগ্রেস সদস্য ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা যারা বাজেটে বলব তাদের উনি একদিন ডেকে পাঠিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পার্লামেন্টের বিতর্কে একবার সরকার পক্ষ একবার বিরোধী এভাবে বলতে কার সময় কখন আসবে বলা যায় না। তবু যেদিন আমার ডাক পড়ার সম্ভাবনা সেদিন সকালে কলকাতার ফোন। শিশিরকুমার অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ভরতি হয়েছেন। পেসমেকার বসাতে হবে, ডাক্তার আমার ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করবেন। আমার চোখে

ল। বাজেট বক্তৃতা মাথায় উঠল। রাত্রের প্লেনের টিকিট কাটলাম। যদি আজ াজেটে বলার ডাক না-পড়ে তাহলে কিছু করার নেই। দিল্লিতে আমার সকল াজের সহায় রতন মুখার্জি টেলি-চেকিং করে গাড়ির পিছনে আমার সুটকেস লে পার্লামেন্ট ভবনের পার্কিং-এ রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক এক করে বক্তারা বলছেন। সন্ধ্যা নেমে এল। শেষে মনোরঞ্জন ভক্ত ও সন্তোষমোহন দেব স্পিকার সাংমাকে অনুরোধ করলেন একটা পারিবারিক মডিকেল ইমার্জেন্সির জন্য আমাকে চলে যেতে হবে, আগে বলতে দিলে ভাল হয়। স্পিকার আউট অব টার্ন আগে ডাকলেন। ট্যাক্স সংগ্রহ বাড়াবার বিষয়ে আমি বলেছিলাম ধনী কৃষকদের ছাড় দেওয়া ঠিক নয়। চিদাম্বরম উঠে াঁড়িয়ে একটা মোটা বই আমাকে দেখিয়ে বললেন, কৃষকদের ট্যাক্স করা আইন বিরুদ্ধ। আমি বললাম তাহলে অন্তত ভরতুকি দেওয়া বন্ধ করুন। আমরা সকলে জানি দরিদ্র কৃষকের কাছে ভরতুকি পৌঁছয় না। মাঝপথে উধাও হয়। আমি দাবি করলাম আমরা যাকে 'সোশ্যাল সেক্টর' বলি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আরও ঢের বেশি বরাদ্দ করা হোক। চিদাম্বরম বলেছিলেন শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। আমি দেখলাম নির্বাচনের আগে মনমোহন সিংয়ের আমলে এই বৃদ্ধি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য খাতে এ বছর বরাদ্দ কমে গিয়েছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রতিরক্ষা। দেশের স্বার্থে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করতেই হবে। তবে আমি সাবধান করেছিলাম অর্থমন্ত্রী যেন যুদ্ধবাজদের দ্বারা প্ররোচিত না হন। আমি বললাম প্রতিরক্ষার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান দেশের মানুষ। কোনওমতে 'Mr. speaker, I have done' বলে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হলাম। পথে দু'-একজন এম পি বললেন, ভাল বলেছ। আমার মন সেদিকে নেই। কোনওমতে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কলকাতার প্লেন ধরলাম।

যথা সময়ে শিশিরকুমারের পেসমেকার বসল এবং তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আমি আমার পার্লামেন্টারি কাজকর্মে ফিরে গেলাম। চিদাম্বরমের কথা বলতে গেলে আমার একটা ছোট মজার ঘটনা মনে পড়ে। আমার ও শিশিরকুমারের চল্লিশতম বিবাহবার্ষিকীর সময়ে আমার কন্যা শর্মিলা ভেনিসে ছিল। সেখান থেকে সে একটি সুদৃশ্য ভিনিশিয়ান কাচের ছোট হাতি উপহার পাঠায়। দোকান থেকেই সেই উপহার প্যাক করে পাঠিয়ে দেয়। আমরা ব্যাপারটা সকলে ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময়ে আমি কাস্টমস থেকে চিঠি





প্রথম নির্বাচন, মনোনয়ন পেশ



নির্বাচনে জয়ী সাংসদ



তৃণমূলের নির্বাচনি প্রচার ১৯৯৮



বাড়ির বাগানে কর্মীদের সঙ্গে



নির্বাচনি জনসভা



ওয়াশিংটনে হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে




নির্বাচনের পোস্টার



জয়ী প্রার্থী, জয়ের আনন্দ



প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সঙ্গে



মমতা ও কৃষ্ণা দিল্লিতে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ প্রকাশিত ছবি)



অ্যামবেসেডর রবার্ট ব্ল্যাকউইল

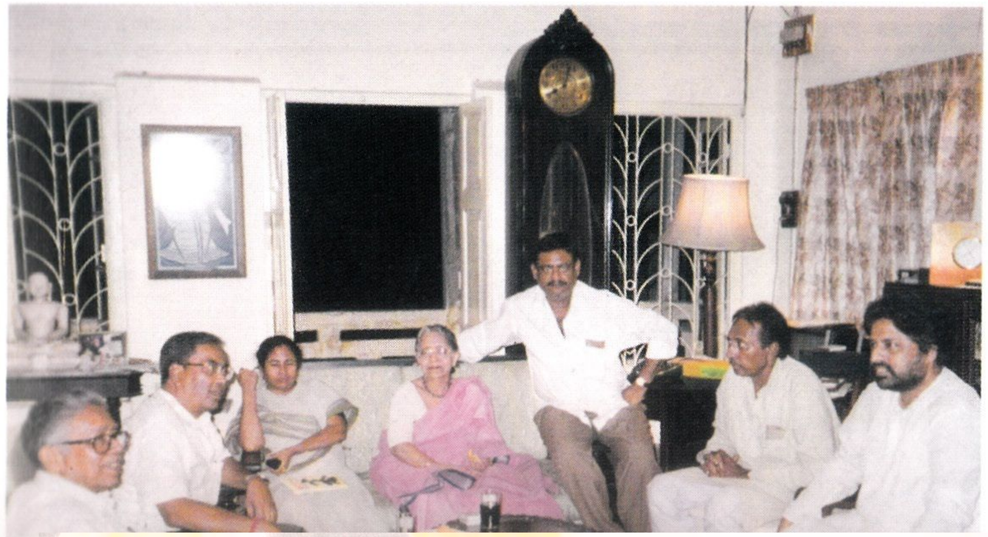


কর্মীদের সঙ্গে ইফতার



ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী হিউবার্ট ভেড্রিন











র সঙ্গে

বার্লিন, অনিতা, মার্টিন ও জুবিন মেটা



ইদের মিলন, সঙ্গে কর্মীরা



জন্মদিনে বাড়িতে মমতা



সঙ্গে সুগত ও সুমন্ত্র



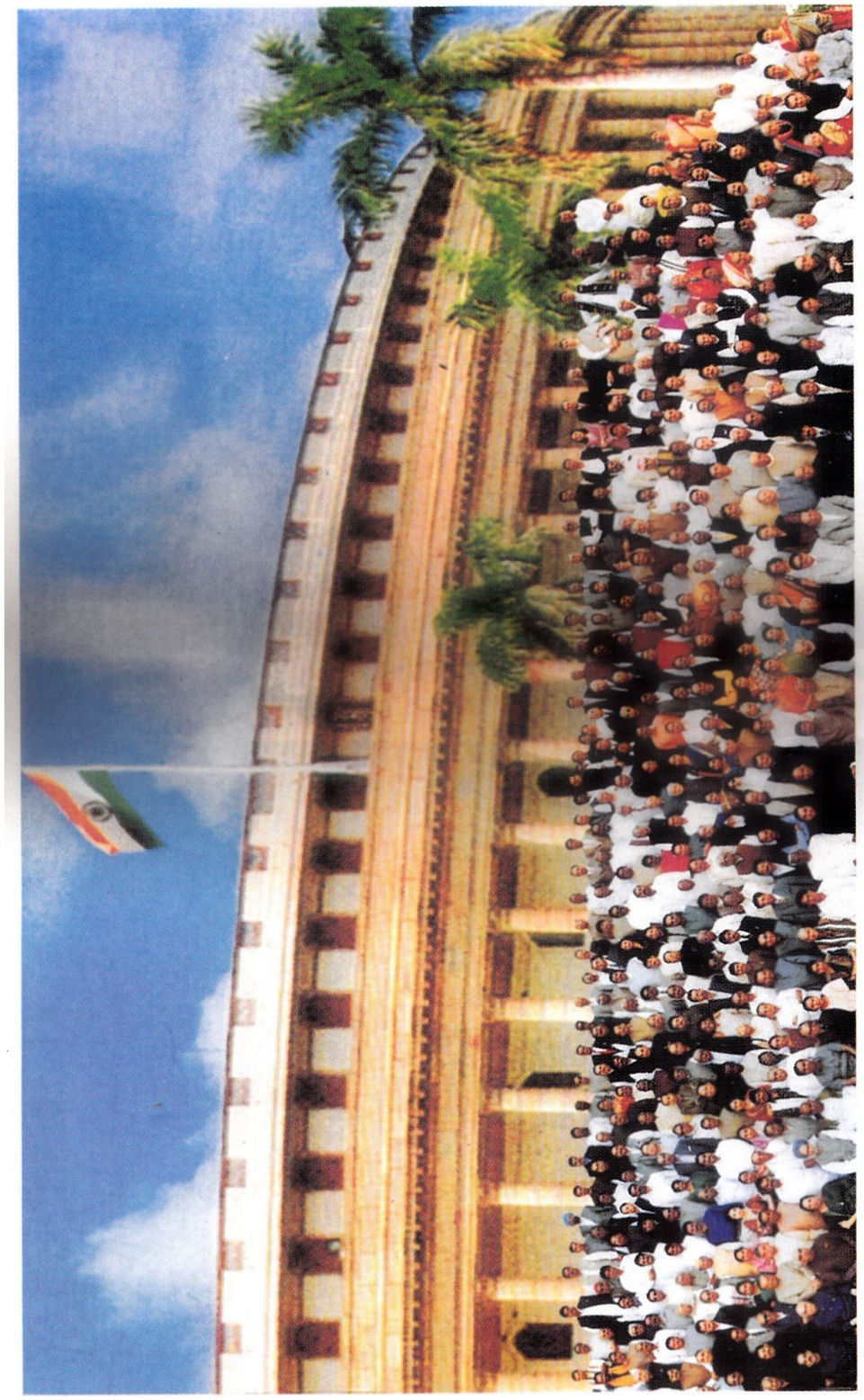
পার্লামেন্টের অফিসঘরে



প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে



অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে



পার্লামেন্টের গ্রুপ ছবি

পেলাম— ট্রেড লাইসেন্স সহ এসে দেখা করে আপনার জিনিস ছাড়িয়ে নিয়ে যান। আমি বিনীতভাবে জানালাম আমি ব্যবসা করি না, লাইসেন্সও নেই, ওটা উপহার। ওরা বললে দিল্লিতে বাণিজ্যমন্ত্রকের অনুমতিপত্র নিয়ে আসুন। অগত্যা তাদের চিঠি দিলাম। বেশ কিছুকাল পর তারা জবাব দিলে আপনার অর্থমন্ত্রককে লিখতে হবে আমাদের নয়। যথা আজ্ঞা। অর্থমন্ত্রকে চিঠি দিয়ে বসে আছি। এমন সময়ে একদিন চিদাম্বরম, আমি ও আরও কে পার্লামেন্টে বসে আলাপ করছি নেহাতই গল্পচ্ছলে আমার ভিনিশিয়ান হাতির কথা উঠল। তারপর কী হল ঠিক জানি না। কিন্তু আমার কলকাতার বাড়িতে কাস্টমস অফিস থেকে ঘন ঘন ফোন। নিয়ে যাবার তাগিদ পেয়ে নেতাজি ভবন থেকে কার্তিক গেল। তাকে খুবই আদর যত্ন করে চা খাইয়ে বাক্স সমেত হাতি তার হাতে তুলে দেওয়া হল।

রেলবাজেটের সময়ে সর্বদা খুব হইচই হয়। সব রাজ্য দাবি করতে থাকে তাদের রাজ্যের জন্য বরাদ্দ বেশি হোক, নতুন ট্রেন চলুক। সবাইকে খুশি করা অসম্ভব। আর রেলমন্ত্রী যে রাজ্যের সে রাজ্য একটু বেশি মনোযোগ পাবার আশা করে। রামবিলাস পাসোয়ান রেলমন্ত্রী, বিহারের ভাগ্য ভাল। রব উঠল পশ্চিমবাংলা বঞ্চিত। মমতা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চিৎকার শুরু করল। তারপর রাগের মাথায় তার নিজের গায়ের কালো শাল রেলমন্ত্রীর দিকে ছুড়ে দিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শালটি রামবিলাস পাসোয়ানের পাশে বসা তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের গায়ে পড়ল। তিনি শালটি হাতে নিয়ে উঠে এসে কংগ্রেসের চিফ হুইপ সন্তোষমোহন দেবের হাতে দিলেন। সন্তোষমোহন লজ্জিত মুখে শালটি নিয়ে সোজা আমার কাছে এসে সেটি আমাকে দিলেন। আমি অপ্রস্তুত ভাব সামলে নিয়ে শালটি নিলাম ও ভাঁজ করে আমার সিটের সামনের পকেটে রাখলাম। পরদিন কাগজ খুলে দেখি প্রতিটি দৃশ্য নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মমতা ততক্ষণে স্পিকারের সামনে মেঝেতে অবস্থানে বসে গেছে। স্পিকার বেশ কয়েকবার তাকে উঠে যেতে অনুরোধ করলেন, সে অবিচল। আমি ডানপাশে প্রিয়রঞ্জনের দিকে বারকতক অর্থপূর্ণ ভাবে তাকালাম যদি সে অবস্থা সামাল দেবার চেষ্টা করে। উচ্চবাচ্য নেই দেখে আমিই ওয়েলে গিয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই বৃথা। বেশ খানিকক্ষণ পরে স্পিকার ধৈর্যচ্যুত হয়ে 'গেট আউট' বলে গর্জন করাতে মমতা কক্ষত্যাগ করল

ও সেই সেশনে আর এল না। ও বলল ও বহিষ্কৃত হয়েছে। স্পিকার বললেন শুধুমাত্র সেইদিনের জন্য উনি বহিষ্কার করেছিলেন। ব্যাপারটা অমীমাংসিত রইল।

নানাবিধ পার্লামেন্টারি কমিটির কাজকর্মে আমি জড়িয়ে পড়লাম। সাধারণত দু'ধরনের কমিটি হয়। যাকে কনসালটেটিভ (Consultative) কমিটি বলে তার অধ্যক্ষ হন বিভাগীয় মন্ত্রী। আমি বিদেশ দপ্তরের কনসালটেটিভ কমিটিতে ছিলাম। তবে অন্য যে কমিটি যাকে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি বলা হয় তারা বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। কোনও মন্ত্রী সেখানে থাকেন না। সরকার পক্ষ বা অনেক সময়ে বিরোধী পক্ষ থেকেও কমিটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ত্রয়োদশ লোকসভার সময়ে আমি বিদেশ দপ্তর পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলাম দীর্ঘদিন। তবে আমার প্রথম সংসদীয় জীবনে আমি হিউম্যান রির্সোস কমিটি বা মানবসম্পদ কমিটির সদস্য হলাম। তার চেয়ারম্যান তখন এস বি চ্যবন। মানবসম্পদ উন্নয়ন তখন অনেক কিছু মিলিয়ে বেশ বড় দপ্তর। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সবই তার অন্তর্গত। এই কমিটিতে কাজ করতে করতে, ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কাজের জন্য ঘুরতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখলাম। আর স্বীকার করতেই হবে এস বি চ্যবন অত্যন্ত দক্ষ চেয়ারম্যান ছিলেন। এই কমিটিগুলি সর্বদলীয় হত এবং রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যদের মিলিত ভাবে কমিটিতে কাজ করতে হয়।

দেশের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বা পরিবার পরিকল্পনা কেমন চলছে দেখতে আমরা রাজস্থান গিয়েছিলাম। রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আমাদের অভিজ্ঞতা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। একটি গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক সন্তানসম্ভবা মায়ের সঙ্গে আমার কথা হল। তিনি ষষ্ঠ সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার তো পাঁচটি সন্তান আছে, আবার কেন? তিনি বললেন, 'আমার পাঁচটিই কন্যা, আমার পুত্র সন্তান প্রয়োজন।' 'যদি এবারেও কন্যা হয় তবে কী করবেন?' এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'তব তো মর যায়গা।' পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে যে পারিবারিক ও সামাজিক হেনস্থার শিকার হতে হয় তার করুণ কাহিনি। অপরদিকে ভয়াবহ ব্যাপার হল মা নিজে অথবা ঠাকুমা-দিদিমা অবাঞ্ছিত কন্যা সন্তানকে জন্মের পরই পাহাড়ে, জঙ্গলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ফেলে দিয়ে আসেন। কিছুকাল



পরে বিশেষ জায়গায় অনেক শিশুর হাড়গোড় পাওয়া যায়। আমাদের বলা হল রাজস্থানে এমন গ্রাম আছে যেখানে অনেকদিন কোনও বরযাত্রীর দল পা রাখেনি। কারণ সেসব গ্রামে বিবাহযোগ্য মেয়ে কেউ নেই।

জয়পুরে এসে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যখন আলোচনায় বসলাম তখন দেখলাম এই কুসংস্কার, কন্যা সন্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব দূর করার চেষ্টা চলছে। সরকার ছাড়াও কিছু সমাজসেবী সংস্থা N.G.O একাজ করছেন। আমরা অপর একটি গ্রাম দেখতে গেলাম, সেখানে মহিলারা অগ্রসর। সে গ্রামে মেয়েরা আমাদের ঢোলক বাজিয়ে গান গেয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তারা ছেলেমেয়েদের জন্য নিজে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা দাবি করেছেন, আরও চেয়েছেন পোলিও-বসন্ত ইত্যাদি রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা। সেই মতো কাজ চলছে। অন্তত কিছু আশার আলো নিয়ে আমরা রাজস্থান থেকে ফিরলাম।

মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা কীভাবে দেশের ছেলেমেয়েদের দেওয়া যায় তাই নিয়ে আমাদের কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করেছিল। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা এই ধরনের কাজ করেন তাদের কাজের ধারা আমরা দেখতে পেলাম। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল, বেলুড়, মাউন্ট আবুতে ব্রহ্মকুমারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুত্তাপুর্তি, কর্নাটকে সাঁইবাবার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই আমরা পরিদর্শন করেছিলাম। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান। সেকথা মাথায় রেখে, কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে কেমন করে ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধ সচেতন করা যায়, কীভাবে তারা ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ করতে শিখবে এই সবের উপর আমরা রিপোর্ট দিয়েছিলাম।

এই মূল্যবোধ সচেতন শিক্ষার সন্ধানে যখন আমরা পুত্তাপুর্তিতে সাঁইবাবার প্রতিষ্ঠিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যাই তখন আমাদের সাঁইবাবার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার হয়েছিল। কাজের ফাঁকে একদিন আমাদের জনতার দরবারে বসতে বলা হল। আমরা তাহলে বাবার দর্শন পাব। ধৈর্য ধরে বসলাম। বেশ কয়েক হাজার লোকের সভা। কিন্তু দেখবার মতো শৃঙ্খলা, কোনও আওয়াজ নেই। সাঁইবাবা এলেন, একটি হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উপরে তোলা, ধীর পায়ে জনতার মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চলে গেলেন। আমি কিঞ্চিৎ হতাশ হলাম। পাশের বন্ধুকে বললাম, দূর এ

আবার একটা দর্শন হল নাকি! পরদিন ভোরবেলার অধিবেশনে আবার ডাক পড়ল। আবারও হাজার মানুষের শৃঙ্খলাপরায়ণ জমায়েত। ধীর পায়ে সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ আমার সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে উনি বললেন, চলা যানা মত— চলে যেয়ো না যেন। আমার পাশের সঙ্গিনী উৎফুল্ল হয়ে বললেন— দেখো কাল তুমি ওরকম বলেছিলে, আজ তোমার ঠিক ডাক পড়বে। কিছুক্ষণ পরে সত্যিই ডাক পড়ল। আমরা জনাকয়েক এম পি একটি ছোট ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা চেয়ারে উনি বসে আছেন। আমরা একটু চাপাচাপি করে ওঁর পায়ের কাছে নীচে বসলাম। আমার দিকে চেয়ে উনি বললেন— তুমি কি একটু বিভূতি নেবে? আমি নীরবে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। এরপর আমার মেলে ধরা হাতের ওপর ওঁর উপুড় করা হাত থেকে ঝরঝর করে সুগন্ধি বিভূতি ঝরে পড়ল। উনি আমাকে বললেন, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, জনসেবার কাজে আছ, সবই খুব ভাল। তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না— তুম তো গৃহলক্ষ্মী হো। মেয়েদের এই বাইরের জগতে কাজ করা ও গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় সমন্বয় করা এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তারপর বললেন তোমার পার্লামেন্টের কাজে দুটো জিনিসে জোর দিয়ো। মানুষের কাছে শিক্ষা ও পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। এবার আমি একটু চমকে উঠলাম। কারণ এম পি হবার প্রথম দিন থেকে আমার অগ্রাধিকার ছিল শিক্ষা ও পানীয় জল। কিছুদিন পরে এর সঙ্গে আমি যোগ করেছিলাম গ্রামীণ বিদ্যুৎ। সামান্য হলেও এই তিনটি ক্ষেত্রে আমি যে সফলতা পেয়েছিলাম সেটাই আমার পরম প্রাপ্তি। আমার এলাকায় হেন স্কুল কলেজ নেই যেখানে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিইনি। গ্রামের মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার বিশাল এলাকা আর্সেনিক আক্রান্ত। খুঁজে পেতে নলকূপের সঙ্গে আর্সেনিক মুক্ত করার যন্ত্র বসিয়েছি। আর জনকল্যাণের এই কাজ করার সময়ে, জোর গলায় বলতে পারি রাজনীতির কোনও রং আমি দেখিনি। গ্রামীণ বিদ্যুতের জন্য আমি প্রচুর অর্থ আমার সংসদ তহবিল থেকে বরাদ্দ করেছিলাম। কিন্তু রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও বিদ্যুৎ পরিষদের ঢিলেমির জন্য কাজ কিছুতেই এগোতে পারতাম না।

সাঁইবাবা আমার আঁচলে ঢাকা হাতের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন— লেফাফামে ক্যায়া হ্যায়? আমার হাতে ছিল একটি খাম বা



লেফাফা। আমার এক আত্মীয়া খুব সাঁইবাবার ভক্ত, সম্প্রতি স্বামী বিয়োগ হয়েছে। আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন সুযোগ হলে যেন ওঁর হাতে দিই। উনি এত কথাবার্তা বলছেন আমি মনে ভাবছি কখন সুযোগ পাব, তখনি এই প্রশ্ন। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়লেন। তারপর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু দার্শনিক কথাবার্তা বললেন। আমার সঙ্গী এক এম পি-কে উনি বললেন, তোমার শরীর ভাল নেই, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম মানবে। তারপর শূন্যে হাত তুলে মুঠি থেকে একটি হিরের আংটি বার করে তাকে ধারণ করতে বললেন। আমাদের এক কনিষ্ঠ এম পি-কে একই ভাবে শূন্যে হাত তুলে একটি নবরত্ন আংটি দিলেন। সে প্রায় বিস্ময়ে মূর্ছিত হয়ে পদতলে পড়ল। কলকাতা ও দিল্লিতে বন্ধুরা যারা অবিশ্বাসী তারা আমাকে পরিহাস করে বললেন— তোমার ভাগ্যে কেবলি ভস্ম আর কিছু নয়! আর যারা ভক্ত ও বিশ্বাসী তাদের মধ্যে আমার সেই বিভূতি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি অনেককে ভাগ করে দিলাম।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক স্মারক বা ন্যাশনাল মনুমেন্টগুলি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য কমিটির তরফে আমরা কয়েকজন ভার পেলাম। এই কাজে গোয়াতে গিয়ে সেখানকার সুপ্রাচীন গির্জা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। এরপর গেলাম অজন্তা ইলোরা আরও অন্যান্য ঐতিহাসিক জায়গায়। ঔরঙ্গাবাদ থেকে মোটরে অজন্তা পৌঁছে দেখলাম আমার জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের লোকজন 'ডুলি' নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ন্যাশনাল মনুমেন্ট কমিটিতে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম প্রচুর হাঁটাহাঁটি, মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙা, পাহাড়ে চড়া ইত্যাদি করতে হয়। আমাদের মধ্যে একটা ঠাট্টা ছিল যে এই কমিটির সদস্য হবার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ করে আসা দরকার। আমি ডুলি দেখে খুব বিরক্ত হলাম। ওরা আমতা আমতা করে বললে, পাহাড়ে চড়তে হবে অনেক পথ তাই। আমি হনহন করে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। বেশ কিছুদূর উঠবার পর দেখলাম শেষ যখন অজন্তায় এসেছিলাম সে বয়স আর নেই। আমি একমাত্র মহিলা। চেয়ে দেখলাম পুরুষ সঙ্গীরাও অনেকে হাঁপাচ্ছেন, পথে থেমে জিরিয়ে নিচ্ছেন। খুবই কাঁচুমাচু মুখে ডুলিতে বসলাম। ডুলিবাহকেরা মহা খুশি, আমি তাদের কথা ভেবে অত্যন্ত অপরাধী বোধ করছি। তারা বললে সেকী! এ তো আমাদের জীবিকা। তারা নানা গল্প করতে করতে আমাকে নিয়ে চলল।

প্রথম গুহার কাছাকাছি গিয়ে ওরা ডুলি নামাবে। এবার হাঁটাপথ কিন্তু আমার সঙ্গীরা ঘোরতর আপত্তি করে বললেন, 'ডুলি নেহি উতরেগা।' ব্যাপার কী! শুনলাম বিহার ও উত্তরপ্রদেশে নববিবাহিতা বধূ ডুলিতে চড়ে আসে। তখন বরকে আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে বাড়ির মহিলাদের মূল্য দিয়ে খুশি করতে হয় তবেই ডুলি নামাবার অনুমতি মেলে। সঙ্গীরা দাবি করলেন— কোথায় ডা. শিশিরকুমার বসু? তিনি এসে প্রাপ্য দিলে তবেই ডুলি নামবে। শিশিরকুমার অজন্তায় ছিলেন না। কিন্তু এটা একটা চিরকালীন ঠাট্টা তামাশায় পরিণত হল। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হল-এ শিশিরকুমারের দেখা পেলেই ওরা প্রাপ্য দাবি করতেন।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া যথেষ্ট ভাল কাজ করছে আমাদের ধারণা হল। তবে তাদের আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করা, আধুনিকীকরণ, আরও অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। ঐতিহাসিক স্মারকের আশেপাশে পরিশুদ্ধ পানীয় জল, আধুনিক টয়লেট, ভাল রেস্তোরাঁ প্রয়োজন। বিশেষ বিদেশি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করতে হলে এসব জরুরি। মেরামত ও রেসটোরেশন-এর কাজে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা রিপোর্টে এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

আগেই বলেছি হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বা মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্তর্গত ছিল নানান দপ্তর। 'কালচার', সংস্কৃতি তার বিশেষ একটি অঙ্গ। পরবর্তীকালে দপ্তরগুলো ছোট করা হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী, সংস্কৃতিমন্ত্রী আলাদা নিযুক্ত হতেন। তখন কিন্তু সব এক ছাতার তলায় ছিল। আমাদের কমিটিতে সংস্কৃতিমন্ত্রক নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আমি কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে, তার মধ্যে গাঁধী স্মারক নিধি, নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, সব কিছুতেই কোটি কোটি অর্থ মঞ্জুর করা হয়। এই ধরনের জাতীয় স্মারক-এর জন্য এ কাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জরুরি। কমিটিতে এই নিয়ে আলোচনার সময়ে আমি বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছিলাম এইভাবে জাতীয় স্মারকের বিশেষ করে গাঁধীজি, নেহরুজির মতো দেশনেতাদের স্মৃতি সংরক্ষণের কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু একজনের ক্ষেত্রে আমি এ ধরনের প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ করছি তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। কমিটির অনেক সদস্যই আমার সঙ্গে সহমত হলেন। সামনেই আসছে নেতাজির শতবর্ষ। সদস্যেরা অনেকেই কলকাতার নেতাজি ভবনে



এসেছেন। চেয়ারম্যান এস বি চ্যবনও নেতাজি মিউজিয়াম আগে দেখেছেন, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর নেতাজি-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রচনাবলি প্রকাশনার কাজ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। সেই মিটিং-এ স্থির হল পরবর্তী কলকাতা ভিজিটের সময়ে কমিটি কলকাতার জাতীয় মিউজিয়াম, ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং নেতাজি ভবন পরিদর্শনে আসবেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও নেতাজির শতবর্ষে অবশ্যই কর্তব্য পালন করবেন বলে শিশিরকুমার বসুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তার সরকার পড়ে যায়। কমিটি কলকাতায় এসে নেতাজি ভবনে এসেছিলেন এবং খুবই প্রীত হয়েছিলেন। কলকাতার নেতাজি ভবনে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করে শিশিরকুমার বসু অনেক সংগ্রাম করে ধীরে ধীরে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। নেতাজির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ছিলেন উদাসীন, রাজ্য সরকারের পক্ষেও অনীহা বা বিরূপতা। শিশিরকুমারের পক্ষে কাজটি খুব কঠিন হয়েছিল।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর তেরোদিনের প্রধানমন্ত্রিত্বের পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন দেবগৌড়া। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাইরে থেকে কংগ্রেসের সমর্থন সহ মোটের উপর চলছিল। দেবগৌড়া নিজেকে কর্নাটকের সাধারণ কৃষক সন্তান হিসেবে তুলে ধরতে পছন্দ করতেন। দেবগৌড়ার সঙ্গে বিভিন্ন কাজেকর্মে আমার মাঝে মাঝেই দেখাসাক্ষাৎ হত। উনি আমাকে 'সিস্টার' বলে সম্বোধন করতেন। আমার আমন্ত্রণে উনি কলকাতায় এসে নেতাজি ভবনেও এসেছিলেন। আমরা সকলেই বুঝতে পারছিলাম ওর সরকারের বিপদ ঘনিয়ে আসছে যে-কোনওদিন পতন হবে।

কংগ্রেসে তখন সীতারাম কেশরির যুগ চলছে। কেশরি কংগ্রেস সভাপতি। নরসিমহা রাও নিজের বিরুদ্ধে নানা তদন্তে জড়িয়ে পড়েছেন। সবমিলে কংগ্রেসের পক্ষে একেবারেই সুসময় নয়। এরই মধ্যে কেশরি ঠিক করলেন তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দেবেন। আমার মতো অনেক কংগ্রেস সদস্য বুঝে উঠতে পারছিলেন না এতে কংগ্রেস দলের কী লাভ হবে। তখন শরদ পাওয়ার ও জিতেন্দ্রপ্রসাদ নেতৃস্থানীয়। সেন্ট্রাল হল-এ আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম আমরা "হারাকিরি" করছি কেন। আজ যদি নির্বাচনে যেতে হয় কংগ্রেসের ফল খুব খারাপ হবে। আমি জিতেন্দ্রপ্রসাদকে বললাম, আপনার উত্তরপ্রদেশ থেকে এখন দু'জন এম পি আছেন— নূর বানু, রত্না সিং। এরপর

তো শূন্য হয়ে যাবে। আমার বাচালতায় জিতেন্দ্রপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। সত্যিই তো আমি রাজনীতির কী বুঝি, মতামত দেবার কে! কিন্তু ভবিষ্যতে আমার কথা ফলে গিয়েছিল। দ্বাদশ লোকসভাতে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সাংসদ একজনও ছিলেন না।

সীতারাম কেশরি ঘটনাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যে সরকার এখুনি না-ফেললেও দেবগৌড়ার পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। দেবগৌড়ার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনার পর ভোটাভুটি হল। যেমন হয়ে থাকে বাইরের করিডর খালি করে দেওয়া হল। বোতাম টিপে সবাই ভোট দিলেন, কংগ্রেস সদস্য হিসেবে আমিও ওর বিরুদ্ধে ভোট দিলাম। উনি হেরে গেলেন। ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ভোট, ততক্ষণাৎ ফলাফল নিশ্চিত। আমার মনে সদ্য পরাজিত দেবগৌড়ার জন্য সহানুভূতি ছিল। আমি উঠে অন্যপ্রান্তে তখনও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসা দেবগৌড়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। আমার ধারণা ছিল টিভি ক্যামেরা তখন বন্ধ করা হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে পরে জানলাম আমার সেই হ্যান্ডশেক আপামর ভারতবাসী দেখে ফেলেছেন। আমার পর আরও দু'-একজন উঠে গিয়ে দেবগৌড়াকে সম্ভাষণ করলেন। অনেকের মনে হয়েছিল ওকে বিনা কারণে অপসারিত করা হল।

দেবগৌড়ার পতন হলেও সরকার টিকিয়ে রাখার একটা চেষ্টা চলছিল। ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীর খোঁজ চলছে। আকাশে বাতাসে কয়েকটি নাম ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি কলকাতা থেকে এরোপ্লেনে দিল্লি ফিরছি। প্লেনের বাথরুম থেকে শুনতে পাচ্ছি ক্যাপটেন বলে চলেছেন— 'আমরা এখন... হাজার ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছি। এইমাত্র আমরা পবিত্র বারাণসী শহর পার হলাম।' হঠাৎ একটু থেমে গিয়ে ক্যাপটেন বলে উঠলেন— 'ওহ্, একটি বিশেষ ঘোষণা আছে এইমাত্র খবর পাওয়া গেল ইন্দ্রকুমার গুজরাল পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।' বাথরুম থেকে বার হয়ে আমি শিশিরকুমারকে বললাম, ঘোষণা শুনলে? সেবার উনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। উনি খবর কাগজ পড়ছিলেন কিছু শোনেননি। গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শুনে আমরা দু'জনেই অত্যন্ত প্রীত হলাম। যেসব নাম শোনা যাচ্ছিল তার মধ্যে উনি যে যোগ্যতম সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পরদিন সকালে পার্লামেন্টে দেখা হতেই ওকে অভিনন্দন জানালাম। উনিও খুব খুশি।

গুজরালের প্রধানমন্ত্রিত্বের কালও খুব বেশিদিন ছিল না। কিন্তু সময়টা ছিল



খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ, সাল ১৯৯৭। আর অল্প সময়ের মধ্যেও কিছু ভাল কাজ করার চেষ্টা গুজরাল করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান হল ভারত-পাকিস্তান সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। উনি একতরফাভাবে পাকিস্তানের দিকে সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রয়াস করেন। ভিসার কড়াকড়ি ভারতের দিক থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বয়স্ক মানুষের জন্য শিথিল করা হল। আমি বলেছিলাম, আরও ছাড় দিতে পারতেন। উনি বললেন শুধু এইটুকুর জন্য সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। তবে শুধু সমালোচনা নয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি এই শান্তির বার্তা প্রশংসাও পেয়েছিল। এই শান্তি প্রয়াস পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী রূপে অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিংহ আরও এগিয়ে নেবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

আরও একটি দিকে ওর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তা হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। আমি ওকে অনুরোধ করলাম পার্লামেন্টে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াবার জন্য উনি যেন সচেষ্ট হন। উনি জবাবে বলেছিলেন— একজন যে convert-ed হয়ে আছে তাকে তুমি convert করার চেষ্টা করছ। অর্থাৎ উনি আমাদের সঙ্গে আছেন ওকে কিছু বলতে হবে না। তবে উনি যেদিন স্বয়ং মহিলা বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন সেই দিনটি আমি ভুলব না। প্রায় কুড়ি মিনিট প্রধানমন্ত্রী গুজরাল বিল হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন একদল সাংসদ তুমুল হট্টগোল করে ওকে বলতেই দিল না। তার মধ্যে ওর নিজের পার্টি জনতা দলও ছিল। সেইদিনই শারদ যাদব তার বহুবিতর্কিত মন্তব্য— তিনি সংসদে 'বব কাটি' মহিলা চান না বলেছিলেন। আমি দিনের শেষে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার নিজের দল এরকম করল কেন। উনি বিষণ্ণ হেসে বলেছিলেন— ইউ নো মাই পার্টি। সেই সময় থেকে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে মহিলা সংরক্ষণ বিল এই চেহারায় আমরা কিছুতে পাশ করাতে পারব না। তখন থেকেই আমি আমার বিকল্প প্রস্তাবের কথা বলতে শুরু করি।

সরকারি ভাবে এই সময়ে দুটি কমিটি গঠিত হয়েছিল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি আর নেতাজি শতবার্ষিকী কমিটি— এই দুটিতেই অন্যান্যদের সঙ্গে শিশিরকুমার বসু ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাঝে মাঝেই নানারকম বৈঠক বসত। এসব কমিটিতে যা হয় আলাপ আলোচনা ভালই হত কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু খুব হল না। একটি প্রস্তাব হয়

যে নেতাজির একটি ছোট, সহজবোধ্য অথচ বিশ্বস্ত জীবনী ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টকে ভার দেওয়া হয়। তারা নানারকম বইপত্র ঘেঁটে শিশিরকুমার বসুর ইংরেজিতে লেখা একটি নেতাজির জীবন-কাহিনি বেছে নেন। সেটির নতুন ইংরেজি সংস্করণ ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী হবার পর প্রথমবার কলকাতা এসে গুজরাল নেতাজি ভবনে আসেন। সেদিন কলকাতার অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক গণ্যমান্য মানুষ এবং শহরের সব কূটনীতিকেরা নেতাজি ভবনে উপস্থিত ছিলেন। ওর এসে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়েছিল। সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমে শিশিরকুমারের সঙ্গে ঘুরে উনি মিউজিয়াম দেখলেন তারপর সমবেত অতিথিদের কাছে বক্তব্য রাখলেন, এরপর উনি হলের স্টেজ থেকে নেমে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করলেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্থির হল ১৯৯৭ সালের ১৫ অগাস্ট মধ্যরাত্রে পার্লামেন্ট সেন্ট্রাল হল-এ বসবে। সকলে পাঁচ দশক আগের মধ্যরাত্রির অধিবেশন স্মরণ করবেন। এই অধিবেশনে মহাত্মা গাঁধীর কোনও একটি ভাষণ শোনানো হবে আর শোনানো হবে জওহরলাল নেহরুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ 'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি।'। আমি স্পিকার সাংমার সঙ্গে দেখা করে বললাম গাঁধীজি ও নেহরুর সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের একটি ভাষণও শোনানো উচিত হবে। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিকল্প পথের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা গাঁধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন করেছেন, দু'বার জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তেমনি তিনি স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ শত্রুকে পরাজিত করে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। ইতিহাসের এই পটভূমিকায় সুবর্ণজয়ন্তীর মধ্যরাত্রে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বরও দেশবাসীকে শোনানো কর্তব্য। বেশ কয়েকবার আমি সাংমার কাছে দরবার করলাম। তিনি যেন কিঞ্চিৎ অসহায়। 'এত দেরিতে বললে, সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন কী করে হবে—' এই ধরনের দুর্বল যুক্তি। শেষে আমি বললাম, 'বিষয়টা আমি জিরো আওয়ার-এ একবার উত্থাপন করি তারপর আপনি যদি কিছু করতে না পারেন কী-ই বা করা যাবে।' উনি অনুমতি দিলেন। পরদিন জিরো আওয়ার-এ আমি এই প্রস্তাব পেশ করা মাত্র চারিদিক থেকে দলমত নির্বিশেষে প্রবল



সমর্থন। তুমুল ডেসক চাপড়ানোর মধ্যে অনেক সদস্য উঠে আমাকে সমর্থন করে বক্তৃতা করার দাবি জানাতে লাগলেন। স্পিকার বললেন, 'থাক থাক আর বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। বুঝতে পেরেছি আপনাদের সমর্থন আছে।' এরপরও সপ্তাহ যায়, দিন যায়, ১৫ অগাস্ট দোরগোড়ায় তবুও সরকারের তরফে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

একদিন অধিবেশন চলার সময়ে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী গুজরাল তার নিজের আসনে বসে আছেন। আমি ব্যাগ থেকে কলম বার করলাম। চারিদিকে চেয়ে দেখি কাগজ নেই। সেদিনের বিজনেস পেপার থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিলাম। সেই ছেঁড়া কাগজে আমি নোট লিখলাম— 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনি সেদিন দেখেছিলেন মধ্যরাতের অধিবেশনে আমার নেতাজির কণ্ঠস্বর শোনাবার প্রস্তাবে সদস্যরা কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তারপর অনেকদিন হয়ে গেল, আর ক'দিন পরেই তো ১৫ অগাস্ট। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' এরপর আমি যোগ করলাম, 'I need a nod from you' আপনার তরফে একটু মাথা নাড়বেন তারই প্রত্যাশা। চাপরাশির হাতে ছেঁড়া কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিলাম। সে সভাকক্ষের গোলচত্বর ঘুরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সেটা দিল। সেটা পড়া হলে প্রধানমন্ত্রী ঘুরে অনেক দূরে বসা আমার দিকে তাকালেন এবং 'নড' করলেন, মাথা ঝাঁকালেন। একটু পরেই স্পিকারের ঘরে আমার ডাক পড়ল। ওর টেবিলে প্রধানমন্ত্রীর নোট— আই ফুললি এগ্রি উইথ মিসেস বোস। দিস শুড বি ডান।

সাংমা বললেন, কণ্ঠস্বর দিন। আমি বললাম, কত চাই? কণ্ঠস্বরের অভাব নেই। ১৫ অগাস্ট ১৯৯৭-র মধ্যরাতে সেন্ট্রাল হল-এ চাপাচাপি ভিড়। শিশিরকুমার ও আমার পাশে বসেছিলেন বেগম নূর, জিতেন্দ্রপ্রসাদ, সুরজিৎ সিং বার্নালা আরও কে। হল ভরতি শ্রোতা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনল গাঁধীজির ভাষণ, নেহরুর ঐতিহাসিক বক্তৃতা। যখন ঘোষণা হল এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনবেন সভাকক্ষ করতালিতে ফেটে পড়ল। তারপর পাঁচমিনিটের হিন্দি ভাষণে প্রতি বাক্যের শেষে উচ্ছ্বসিত করতালি। বার্নালা আমাকে বললেন— সো ইউ হ্যাড ইওর ওয়ে, করে তবে ছাড়লে। আমি বললাম, মানুষের প্রতিক্রিয়া তো দেখেছেন। এরা তবে কীসের ভয় করছিলেন— হোয়াট ওয়ার দে অ্যাফ্রেড অব? পিছন থেকে পঞ্জাবের আর এক এম পি বলে উঠলেন— দিস ওয়াজ হোয়াট দে ওয়ার অ্যাফ্রেড অব।

বাইরে বিজয় চক-এ তখন এ আর রহমানের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম' বাজছে, 'মা তুঝে সালাম।'

১৯৯৭-র জানুয়ারিতে দিল্লিতে নেতাজির জন্মশতবর্ষ সরকারিভাবে পালিত হয়েছিল। লালকেল্লায় বড় জনসমাবেশে নেতারা বক্তৃতা করলেন। আমাকে হঠাৎ একদিন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, তখন রাজ্যসভা এম পি, ফোন করে বললেন, নেতাজির ওপর কয়েকটা ভাল বই বলে দাও তো। বিরোধী পক্ষের নেতা হিসেবে অটলবিহারী বাজপেয়ী তার বক্তৃতা তৈরি করছেন। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা অনেকে বক্তৃতা করেছিলেন।

নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে সেবছর Essential Writings of Netaji Subhas Chandra Bose নামে একটি সংকলন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। তার বাংলা সংস্করণের নাম কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দিয়েছিলেন 'জরুরি কিছু লেখা।' 'এসেনসিয়াল রাইটিংস' বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার জন্য আমি রাষ্ট্রপতি শংকরদয়াল শর্মাকে অনুরোধ করি। ২২ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে শংকরদয়াল শর্মা বইটি রিলিজ করেন। অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর তরফে আমি, শিশিরকুমার বসু, জানকী অতিনাহাপ্পন, সুগত উপস্থিত ছিলাম। সে রাত্রেই শিশিরকুমার কলকাতা ফিরে গেলেন। পরদিন সকালে নেতাজি ভবনে জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান ছিল। আমি সেবার কলকাতার অনুষ্ঠানে থাকতে পারলাম না। সুগত ও আমি লালকেল্লার অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সুমন্ত্র ও শিশিরকুমার নেতাজি ভবনের উৎসবে যোগ দিলেন।

শিশিরকুমার বসু ও আমি নেতাজির জন্মদিনের উৎসবে যোগ দেবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বা ভারতের বাইরে থেকেও অনেক নিমন্ত্রণ পেতাম। কিন্তু কলকাতার নেতাজি ভবন ছেড়ে কিছুতেই অন্য কোথাও আমাদের যাওয়া হত না। পরে আমরা ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে শুরু করলাম। ২১ অক্টোবর উৎসবের জন্য আমরা মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনী, পঞ্জাবে জলন্ধর, মালয়েশিয়াতে কুয়ালালামপুর গিয়েছিলাম। একবার রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ ২৩ জানুয়ারি শিশিরকুমারকে সঙ্গে নিয়ে আন্দামানে নেতাজি জন্মোৎসবে গিয়েছিলেন।



সেবার আমি ও অন্য সদস্যরা কলকাতার অনুষ্ঠান সামলিয়ে ছিলাম। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত নেতাজি অরেশন দিয়েছিলেন। সে বছরের নেতাজি অ্যাওয়ার্ড পেলেন আলেকজেন্ডার ওয়ার্থ। কলকাতার জার্মান কনসাল-জেনারেল তার হয়ে অ্যাওয়ার্ড নিয়েছিলেন।

১৯৯৭-র জন্মদিনে আমি দিল্লির লালকেল্লাতে নেতৃবৃন্দের ভাষণ শুনলাম। আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফে গুরুবক্স সিং ধীলন খুব আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দেহাবশেষ সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হোক। তিনি বলেছিলেন, জানি এ নিয়ে মতভেদ আছে। যারা বিশ্বাস করেন না তারা সেই স্মৃতিসৌধে যাবেন না। কিন্তু আমরা যারা তার অনুগত সৈনিক আমাদের তাকে শ্রদ্ধা জানানো থেকে বঞ্চিত করবেন না।

নরসিমহা রাও সরকার ১৯৯৬ সালের কোনও সময়ে স্থির করেন তারা নেতাজির দেহাবশেষ সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনবেন। হঠাৎ করে কেন তারা এরকম সাহসী পদক্ষেপের কথা ভাবলেন তা শিশিরকুমার বা আমার কাছে কখনওই পরিষ্কার হয়নি। তখন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। তিনি কিছুকাল আগেই জাপানে সরকারি সফরে গিয়েছিলেন। জাপানে গেলে আমাদের ভারতীয়দের একটা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। আমার ও শিশিরকুমারেরও সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। জাপানিরা আমাদের ভারতীয় মানসিকতা বুঝতে পারে না। তারা বলে— কী আশ্চর্য, তোমাদের দেশের অতবড় নেতা তোমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও না, এই বিদেশের মাটিতে ফেলে রাখতে চাও। আমরা যখন এই অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়েছিলাম জেনারেল ফুজিওয়ারা আমাদের হয়ে বলেছিলেন— এ ব্যাপারে অনেক অসুবিধা আছে। অনেক ভারতীয় এখনও তার মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন না। তারা আশা করেন তিনি একদিন ফিরে আসবেন। শুনে জেনারেল কাটাকুরা বলেছিলেন— ভারতীয়দের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা বাস্তবকে মেনে নিতে পারেন।

নরসিমহা রাও তার বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে জার্মানিতে নেতাজির স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে কথা বলতে পাঠিয়েছিলেন। সংগতভাবেই তারা স্থির করেন পরিবারের পক্ষে তারা স্ত্রী এমিলিয়ে ও কন্যা অনিতার মত নেবেন। তারা মত

দিয়েছিলেন। এক সময়ে অনিতা এমন কথাও বলেছিল যে কেউ যদি তার পিতৃদেবের দেহাবশেষ নিতে আগ্রহী না হয় সে ব্যক্তিগতভাবে তা গ্রহণ করতে রাজি আছে, প্রয়োজনে জার্মানিতেও নিয়ে যেতে পারে। যদিও তার এবং আমাদের সকলেরই মনের কথা ছিল এই বীর দেশপ্রেমিকের প্রকৃত আশ্রয় হওয়া উচিত ভারতবর্ষের মাটিতে। তৃতীয় যে ব্যক্তির সম্মতি নরসিমহা রাও ও প্রণব মুখার্জি চেয়েছিলেন তিনি শিশিরকুমার বসু। নিতান্ত অল্প বয়সে তিনি নেতাজির কাজে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কারাগারে নির্যাতিত হয়েছিলেন। সব চেয়ে বড় কথা জীবনের দীর্ঘ কয়েকটি দশক ধরে তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবন ও স্মৃতি রক্ষার কাজ করে চলেছিলেন। শিশিরকুমার সম্মতি দিয়েছিলেন, তিনি একথাও বলেছিলেন এ বিষয়ে এমিলিয়ে ও অনিতা যা চাইবে তিনি তার সঙ্গে সহমত হবেন।

১৯৯৬-র গোড়ায় প্রণববাবুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে উনি কথাচ্ছলে বললেন সে বছর অগাস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী ও তিনি দেহাবশেষ আনার কথা ভাবছেন। শুনে আমি বললাম, মে মাসে তো লোকসভা নির্বাচন, শোনা যাচ্ছে আপনারা পরাজিত হবেন। উনি একটু অপ্রস্তুত হলেন। শিশিরকুমার তাড়াতাড়ি বললেন— না মানে ঠিক পরাজয় নয়, তবে মনে হয় মেজরিটি কমে যাবে। প্রণববাবুও মাথা নেড়ে বললেন— হ্যাঁ হ্যাঁ reduced majority-তে আমরা ফিরে আসব। আমার বলা সেই অপ্রিয় কথা সত্য হল।

জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তম একক দল হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এলেও সরকার গড়তে পারল না। দৈবচক্রে সেই মে মাসের নির্বাচনে আমি কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়ে দিল্লি এলাম। মমতা ও আমি ছাড়াও ছিলেন অজিত পাঁজা, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, গণি খান চৌধুরী, দেবী পাল।

আমি ধীরে ধীরে আমার সাংসদ জীবনের কর্মকাণ্ড বুঝে নিলাম। আমার এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের কথা দিল্লির দরবারে বলব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার এলাকার বারুইপুর, বিষ্ণুপুরের জল আর্সেনিকে আক্রান্ত। বিষাক্ত জল পান করে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে। এই কথা প্রথম যেদিন পার্লামেন্টে বলতে পেরেছিলাম সব সাংসদদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সকলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে তো কথা বলার সুযোগই পাব না মনে হল। সেদিন বিহারে কে একজন খুন হয়েছেন, তাই নিয়ে তুমুল হট্টগোল



চলছে। স্পিকার বারবার আমার নাম ডাকছেন, আমি অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটু সুযোগ পেতে আমি গলা উঁচু করে বললাম, 'আপনারা একটা খুন নিয়ে উত্তেজিত হচ্ছেন আমি এমন একটা বিষয় বলতে চাইছি যেখানে কয়েক হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়েছেন। আমাকে একটু বলতে দিন।' হঠাৎ একটা নীরবতা নেমে এল। আমার বক্তব্য আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে পারলাম। আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগে দীপঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছিলাম। উনি আমাকে ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছিলেন, আর্সেনিকের শিকার হতভাগ্য গ্রামবাসীদের ছবি দিয়েছিলেন। আমি খুব প্রস্তুত ছিলাম। সরকারি স্তরে এ সমস্যা তখনও স্বীকৃতি পায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত ছিল বৈজ্ঞানিকেরা অযথা ভীতি, ওরা বলেছিলেন 'প্যানিক', ছড়াচ্ছে। পরে অবশ্য ওরা ভুল বুঝেছিলেন। আমার বক্তৃতার শেষে আমি আক্রান্ত রুগিদের ছবি স্পিকারের টেবিলে রেখে আসি। এরপর আর্সেনিক নিয়ে আলোচনা বহুবার হয়েছে কিন্তু সেই প্রাথমিক ধাক্কায় সংসদে তুমুল তোলপাড় হয়েছিল। আমার শহর এলাকায় বেহালা তারাতলায়, যাদবপুরে ছিল অসংখ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা। আমি বারবার এই বন্ধ অথবা রুগ্‌ণ কারখানার কথা বলতে চেষ্টা করেছি। মেটাল বক্স কোম্পানির কথা একাধিকবার বলতে পেরেছিলাম। কবিতীর্থের পোর্ট বা বন্দর অঞ্চল আমার এলাকায়। কী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেখানে মানুষজন, বিশেষ শ্রমিকেরা থাকে তা তুলে ধরেছি। গঙ্গাবক্ষে জাহাজ আসতে পারে না, ড্রেজিং দরকার, সেদিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছি।

মহিলাদের রাজনীতিতে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সওয়াল করেছি। আমার আর এক প্রিয় বিষয় ছিল কাশ্মীর। কলকাতার নেতাজি ভবনে আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমার কাশ্মীরের বিভিন্ন দলের যেমন জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল। আমি কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিষ্ঠুর ইতিবৃত্ত বারবার তুলে ধরেছি। শ্রীনগরের মানবাধিকার আইনজীবী জলিল আনদ্রাবির খুন হয়ে যাওয়ার খবরে আমি বিচলিত হয়েছিলাম। পার্লামেন্টে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। যেমন ঘটে থাকে জলিল আনদ্রাবিকে পথের মধ্যে তার গাড়ি থেকে নামিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর প্রথা সম্মতভাবেই তিনি 'মিসিং' নিখোঁজ হয়ে

গেলেন। তারপর ঝিলম নদীর তীরে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল। এ কাহিনি একা জলিলের নয় অনেকের। জলিলের সঙ্গে আমার আন্তর্জাতিক সেমিনারে আলাপ হয়েছিল। কাশ্মীরে রোজই কত খুন হয়, কত নিখোঁজ হয়, জলিল আমার কাছে একটা সংখ্যা নয়, এক জন, এক পরিচিত মুখ। আমার প্রশ্নের জবাব সরকার দিয়েছিলেন বা বলা যায় দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুই ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেননি।

আমি আমার পার্লামেন্টারি কাজকর্ম তো করে চলেছি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে তখন এক অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসে সোমেন মিত্রের অনুগামী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ অনেকদিন ধরেই চলছিল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি মনে হল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবে। মমতা তৃণমূল স্তরের কর্মীদের তার মতো করে সংগঠিত করতে শুরু করল। তখনও কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ থাকলেও তৃণমূল কর্মীরা তার মধ্যেও নিজস্ব ভূমি তৈরি করে নিলেন। মমতার বক্তব্য হল প্রদেশ কংগ্রেসে ক্ষমতাসীন দলের হাতে আছে 'স্ট্যাম্প আর প্যাড' অর্থাৎ দলীয় তকমা কিন্তু সাধারণ কর্মীরা রয়েছেন মমতার সঙ্গে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখন এমন যে এই সমস্যা সামলাবার ক্ষমতা নেই। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ভাঙন রোধ করার জন্য আমার সামান্য ক্ষমতায় যেটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছিলাম। বেশ কয়েকবার কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরির সঙ্গে দেখা করে মমতার সঙ্গে সম্মানজনক কোনও মীমাংসায় আসতে অনুরোধ করি। প্রত্যেকবারই উনি বলতেন, মমতা আমার বেটি— আর কিছু অগ্রসর হত না। দু'-একবার আমি শিশিরকুমার বসুকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। উনি শিশিরকুমারকে দেখলেই নেতাজির কথা বলতে শুরু করতেন— 'তারপর কংগ্রেস সভাপতি সুভাষবাবু পটনা এলেন, ময়দানে বিশাল জনসভা। সংবর্ধনার জন্য যে ব্যান্ড পার্টি হল তাতে আমি ড্রাম বাজিয়েছিলাম।' জিতেন্দ্রপ্রসাদ সমস্যা মেটাতে কলকাতা এসেছিলেন ওর সঙ্গেও কথা বলি। কিছু হল না।

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বে সংকট চলছিল, হাল ধরার কেউ নেই। মাঝে মাঝে শোনা যেত সনিয়া গাঁধী কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু ওর দিক থেকে তখন পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। আমি যখন সদ্য নির্বাচিত হয়ে দিল্লিতে এসেছি একদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের এক মধ্যাহ্নভোজে



সনিয়ার সঙ্গে আমার দেখা। কে যেন আমার বিষয়ে বলল যে উনি একজন অ্যাকাডেমিক, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা। সনিয়া আমার রাজনীতিক জীবনের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, You must be feeling awful, অর্থাৎ এই জীবনে এসে তোমার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে। এর বছর দুয়েক পরে সনিয়া যখন সত্যিই কংগ্রেস রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন আবারও রাষ্ট্রপতি ভবনের কোনও নৈশভোজে আমাদের দেখা। দু'বছর আগে উনি আমাকে কী বলেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, Are you feeling awful now, আপনার কি ভীষণ খারাপ লাগছে। সনিয়া মৃদু হেসে বললেন, I am trying to adjust. মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ কোন্দল ব্যক্তিগত স্তরে আমাকে বেশ অসুবিধায় ফেলেছিল। মমতার প্রত্যাশা সে যে দিকে যাক আমি নিশ্চয় তার সঙ্গে থাকব। ওদিকে আমি (এবং মমতাও) তখনও কংগ্রেস দলেরই এম পি। সীতারাম কেশরি আমাকে ও শিশিরকুমারকে ডেকে বললেন এ বছরের কংগ্রেস অধিবেশন বসবে কলকাতায়, কারণ এটা নেতাজির জন্মশতবর্ষ। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কংগ্রেস অধিবেশন স্থলের নাম হবে 'সুভাষ নগর'। এ হল অগাস্ট ১৯৯৭ সাল। নেতাজি ইন্ডোরে যখন কংগ্রেস অধিবেশন চলছে বাইরে শহিদ মিনারে মমতা বিশাল জনসমাবেশ করে নিজের শক্তি ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিল।

মনে পড়ে হাজরা পার্ক থেকে আমি তৃণমূলের মিছিল রওনা করিয়ে দিলাম। তারপর শৃঙ্খলাপরায়ণ কংগ্রেসকর্মীর মতো নেতাজি ইন্ডোরে অধিবেশনে গেলাম। আমার পরিবারের কোনও কোনও সদস্যকে আমি শহিদ মিনারে পাঠালাম।

এদিকে দিল্লিতে গুজরাল সরকারের সংকট ঘনিয়ে এল। সে বছর শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেস গুজরাল সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করল। আমি আরও একবার শরদ পাওয়ার, জিতেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে কথা বললাম। আমি বলেছিলাম এখন নির্বাচনে গেলে কংগ্রেস যদি দুটি সিটও বেশি পায় নিশ্চয় নির্বাচনে যাব। কিন্তু পরিস্থিতি তার বিপরীত। জিতেন্দ্রপ্রসাদ আমার স্পষ্টবাদিতা অপছন্দ করলেন। আর শরদ পাওয়ার বললেন, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত কিন্তু আমি নিরুপায়।

গুজরাল সরকারের পতন ঘটলেও নির্বাচন না করে অন্য কোনও সরকার

গড়া যায় কিনা তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। বিজেপি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কোনও কোনও দলকে তারা সঙ্গে পাবে কি না। আমাকে সেন্ট্রাল হল-এ ধরে সুমিত্রা মহাজন বললেন, জানো তো মাত্র চার-পাঁচটা কম পড়ছে। কংগ্রেসের হাইকম্যান্ডের প্রতি মমতার অসন্তোষের কথা জানতেন বলে আমার মনে হয় ওরা মমতা, অজিত পাঁজা এদেরও নানারকম ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন।

মমতা হঠাৎ এসে বলল, কৃষ্ণাদি চলুন তো সাংমার কাছে যাই। ততদিনে ও সাংমাকে সেই 'গেট আউট' বলার ব্যাপারে ক্ষমা করে দিয়েছে। ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে সাংমার কাছে গিয়ে বলল যদি সর্বদল মিলে বা অনেকগুলো দল মিলে একটা ন্যাশনাল ক্যাবিনেট গড়া যায় উনি প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি হবেন কিনা। প্রস্তাব শুনে উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন সকলে রাজি হলে তার আপত্তি হবে না। এসব কথাবার্তা বেশিদূর এগোবার আগেই ১৯৯৭-র ডিসেম্বরের চার তারিখে গুজরাল সরকারের পতন হল। স্পিকার সাংমা লোকসভা একেবারেই মুলতবি ঘোষণা করলেন। নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হল।

লোকসভার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা মাত্র আমি কলকাতা ফিরে যাব স্থির করলাম। শিশিরকুমারের জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ওর শরীর ভাল ছিল না। রতন মুখার্জি আমাকে বললেন একজিকিউটিভ ক্লাসের টিকিট পাচ্ছেন না। উনি ইকোনমিতে কিনে আমার জন্য প্রথম সারির প্রথম সিট বুক করে দিয়েছেন। আমার ভাড়া করা ছ্যাড়ছ্যাড়ে অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিলাম। পথের মধ্যে গাড়ি বিগড়ে গেল। রাস্তায় হাত তুলে ট্যাক্সি ধরলাম, সুটকেস তাতে তুললাম। ট্যাক্সি অনেক ভাড়া চাইল, তাইতে রাজি হলাম। চেক ইন করে টারম্যাক দিয়ে বিমানের দিকে হেঁটে চললাম। নতুন কেনা ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকাটা হাত থেকে কোথায় যেন পড়ে গেল। কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিলাম। পার্লামেন্ট থেকে বের হবার আগে দোতলার গোল বারান্দায় অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চারপাশের গাছপালা ও স্ট্যাচুগুলোকে মনে মনে গুডবাই বললাম। মনে হল এদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমি আর ফিরে আসব না।

এরোপ্লেনে আমার পাশের সিট-এ এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রবণ, ইংরেজিতে বলা যায় কিউরিয়াস জর্জ। তিনি বললেন, আপনাকে চেনা চেনা লাগছে আপনি কি সাংবাদিক? আমি ঘাড় নাড়লাম। তিনি নাছোড়বান্দা— তবে কি আপনি—? আমি এয়ারহোস্টেসের কাছে একটা ম্যাগাজিন চাইলাম। উনি একটা 'দেশ' পত্রিকা দিলেন। 'দেশ'-এর আড়ালে আমি আশ্রয় নেবার বৃথা চেষ্টা করলাম। উনি আমার জীবিকা সম্পর্কে আধ ডজন আন্দাজ করার পর আমি বললাম, দু' ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আমি পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলাম। কৌতূহল তো নিরসন হলই না বরং বেড়ে গেল। 'আপনি নিশ্চয় সি পি এম।' বললাম, না, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন হল, ওহ! তাই নাকি! আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না সোমেন মিত্র। হায় ঈশ্বর, কী করি। ঈশ্বর প্রার্থনা শুনলেন, এয়ারহোস্টেসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল— আমরা এখন কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে অবতরণ করব।

তিন

## চুপচাপ ফুলে ছাপ

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল সমাবেশ বেশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেটা ছিল ১৯৯৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর। পরবর্তীকালে অনেক বিশাল সমাবেশ দেখেছি, বক্তৃতাও করেছি। কিন্তু তৃণমূলের সেই প্রথম সভাতে সাধারণ মানুষের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছ্বাস ছিল। রাজ্য রাজনীতিতে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে এমনি মনে হয়েছিল। দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর আমি ভেবেছিলাম হয়তো আবার আমার বইপত্র লেখালেখির জগতে ফিরে যাব। কিন্তু তা হবার নয়। আমার নির্বাচনি এলাকার সকল কর্মী বাড়িতে ভিড় করতে লাগলেন। পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেস তখন ভেঙে যেতে বসেছে। কংগ্রেস কর্মীরা একটা অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। আমি আমার নির্বাচনি এলাকা দ্রুত সফর করে ফেললাম। কর্মীদের মন ও সাধারণ মানুষের মন বোঝা দরকার। আমার মনে হয়েছিল সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা চাননি কংগ্রেস ভেঙে যাক। সকলের আশা শেষ মুহূর্তে কিছু একটা পথ নিশ্চয় বার হবে। সোমেন মিত্র ও মমতার মধ্যে মনোমালিন্যের একটা নিষ্পত্তি হবে। যদি তা না হয় তা হলে কিন্তু বেশিরভাগ কর্মী তৃণমূলপন্থী। অবশ্য আমার বিশেষ অনুগত কোনও কোনও কর্মী বললেন দিদি, আপনি মনস্থির করুন। আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হল লোকে একটা বিকল্প সন্ধান করছে। কুড়ি বছরের উপর একই দলের শাসন থেকে মুক্তি চাইছে। আর লোকের মনে বিশ্বাস জন্মেছে এই বিকল্প কংগ্রেসের দ্বারা হবে না। কী করা যায় চিন্তা করে শরীর খারাপ করে ফেললাম। চোখে হঠাৎ সবই ডবল দেখতে লাগলাম। চোখের ডাক্তার ব্যাপারটা যথেষ্ট সিরিয়াস বলে মত দিলেন ও চিকিৎসা শুরু



করলেন। কর্মীরা বললে কংগ্রেস ভেঙে দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে দিদি তাই চোখে সবই ডবল দেখছে। একেবারে শেষ সময়ে সনিয়া গাঁধীর তরফ থেকে একটা মিটমাটের ফরমুলা এসেছিল। মমতা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে দিল্লিতে সনিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর সনিয়া তাকে একান্তে ডেকে বলেন, সামনের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশটা আসনের অর্ধেক অর্থাৎ একুশটি মমতার পছন্দের প্রার্থী দেওয়া হবে আর অপর একুশটি হবে সোমেনের। মমতা বলে সে দু'দিন অপেক্ষা করেছিল। হাইকম্যান্ড এই ফরমুলা মেনে নিয়ে কোনও বিবৃতি দেয় কিনা। এদিকে নির্বাচন এগিয়ে আসছে আর দেরি করলে নতুন দল রেজিস্ট্রি করা যাবে না। মমতা ইলেকশন কমিশনের কাছে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে রেজিস্ট্রি করে ফেলল। প্রতীক হল তার নিজের আঁকা দুটি ফুল। নজরুলের গান 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'-এর রেশ ছিল। চোখের ডবল দেখাটা তখনও চললেও আমি যে তৃণমূলের সঙ্গে যাব সে বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছি। কিন্তু কোনও ঘোষণা করিনি। কানে এল আমি তখনও কেন যোগ দিইনি বলে মমতা বিরূপ মন্তব্য করছে। 'কৃষ্ণাদি বিট্রে করল' এমনও বলছে। অপরদিকে সোমেন ও তার অনুগামীরা আমার সঙ্গে অত্যধিক মধুর ব্যবহার করছে। আমি কোনও মন্তব্যেই বিচলিত না হয়ে সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনামতো সিদ্ধান্তে এলাম।

আমার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের থাই রেস্তোরাঁ 'বান থাই'-তে। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ আমার জন্মদিন। সুগত আমেরিকা থেকে এসে পৌঁছেছে। সে বললে 'বান থাই' রেস্তোরাঁতে জন্মদিনের ডিনার খাওয়াবে। সুগত, সুমন্ত্র, শিশিরকুমার ও আমি গেলাম। চেয়ার-টেবিলে না-বসে যেদিকে মাটিতে বসে খাওয়া হয় সেদিকে বসলাম। একটি অল্পবয়সি মুসলিম ওয়েটার ছুটে ছুটে খাবার পরিবেশন করছিল। কী জানি কেমন করে সুগত ও সুমন্ত্রর সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠল। বর্তমান রাজ্য রাজনীতি নিয়ে সে তার মতাদি বলছিল। তার মতে পুরনো কংগ্রেসের দ্বারা আর কিছু হবে না। আর সি পি এম? সে জোর গলায় বলল, এতদিন সমর্থন করলাম, এত সুযোগ পেয়েও এরা গরিব মানুষের জন্য কিছু করতে পারেনি। তাই এবার নতুন দল তৃণমূলকে সমর্থন করব, দেখি যদি আমাদের ভাগ্য ফেরে! আমরা পরস্পর চোখে চোখে তাকালাম। সে জানেও না আমরা তখন নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করছিলাম কীভাবে আমার তৃণমূলে যোগদানের কথা ঘোষণা করা হবে।

ডিসেম্বর ২৮ আমাদের 'বসুন্ধরা' গৃহে আমি প্রেস কনফারেন্স ডাকলাম। আমাদের দোতলার বসবার ঘর মিডিয়ার লোকজনে ভরে গেল। আগের দিন অজিত পাঁজা, এম পি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। আজ আরও একজন এম পি যোগ দিতে চলেছেন মনে হয়। মিডিয়াতে প্রবল কৌতূহল। প্রেস কনফারেন্সে আমি বলেছিলাম— আমার পক্ষে কংগ্রেস ছেড়ে আসা এক অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করে ও আমার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। প্রেস থেকে অনেক প্রশ্ন হল। আমি যেন বেশ স্বচ্ছন্দভাবে তার জবাব দিলাম।

প্রেস কনফারেন্স ভাঙামাত্র মমতা এসে উপস্থিত হল। আমি আর মমতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি এমন সময়ে ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরলাম, ওপাশে সোমেন মিত্র। সোমেন বললেন, 'দিদি, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন'! কয়েক মুহূর্ত আমি নির্বাক। সোমেনের সঙ্গে ওদিকে ছিলেন তখনকার অত্যন্ত সোমেন ঘনিষ্ঠ সৌগত রায়। সে আমার ওপর খুব ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। 'আপনি এরকম করবেন জানতাম না, তা হলে আপনার সঙ্গে ইত্যাদি...' সৌগত আমার ও শিশিরকুমারের অনেকদিনের পরিচিত। বিভিন্ন সূত্রে পরিচয়, সে আমাদের স্নেহভাজন। সে যাই বলুক তার সঙ্গে রাগ করা যায় না। সোমেন অবশ্য অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সেবার পার্লামেন্টের নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে মমতার বিরুদ্ধে সৌগত দাঁড়িয়েছিল। এর বছর তিনেক বাদে সৌগত তৃণমূলের ছত্রছায়ায় ফিরে আসে। আর সেই ঘটনা ঘটেছিল একরাত্রে আমার বসুন্ধরা গৃহে মমতা ও সৌগতর কথোপকথনের ফলে। সে ছিল এক বিষাদময় রজনী, ডা. শিশিরকুমার বসু সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। বাড়িতে দলমত-নির্বিশেষে তাঁর অনুরাগীরা ভিড় করেছেন। রাজনীতিতে এরকম দলবদল বা নেতাবদল খুব স্বচ্ছন্দে হয়ে থাকে। খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়।

যা হোক, ২৮ ডিসেম্বরের কথায় ফিরে আসি। খানিক আলাপ আলোচনার পর মমতা বললে, কাল আমার বাড়িতে চলে আসবেন। একসঙ্গে শ্যামবাজার পাঁচমাথার সমাবেশে যাব।

একটা টাটা সুমোতে করে আমরা মিটিংয়ের দিকে চলেছি। মমতা ও আমি



ছাড়া আছেন রঞ্জিত পাঁজা, বিক্রম সরকার আর নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলতে বলতে চলেছে সে আজ তৃণমূল কংগ্রেসের দশজন প্রার্থীকে মঞ্চে উপস্থিত করবে। সে দেখাবে তার প্রার্থীরা কতখানি যোগ্য ও কৃতী। অপরদিকে কংগ্রেসের প্রার্থীরা ওর মতে অযোগ্য ও অনেকে দুষ্কৃতী।

আমাদের গাড়ি ভুল করে স্টেজের দিকে না থেমে উলটো দিকে থেমেছে। জনসমুদ্র পার হয়ে স্টেজে যেতে হবে। জনতার চাপে পিষ্ট হয়ে যাবার অবস্থা। মমতা আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। নয়নার ভীত ত্রস্ত কণ্ঠস্বর কানে আসছে। স্টেজের কাছে পৌঁছে দেখলাম বিভিন্ন উচ্চতার বাঁশ দিয়ে পথ আটকে জনতার চাপ সামলাবার চেষ্টা হয়েছে। আমার তো ভারী মুশকিল। সবই ডাবল দেখছি, চোখের সামনে রাশি রাশি বাঁশ। নীচ দিয়ে যাব নাকি লাফ দিতে হবে। মমতার কণ্ঠস্বর কানে এল— ওরে, কৃষ্ণাদিকে তোল— হঠাৎ শূন্যে উঠে গেলাম, তারপর যেন প্যারাসুট থেকে মঞ্চে অবতরণ। মঞ্চে তখন অজিত পাঁজা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমজাদ আলি, মণিশঙ্কর আয়ার ও আরও অনেকে। মঞ্চ থেকে দেখলাম চারিদিকে কালো মাথা যেন সমুদ্রের ঢেউ। হঠাৎ তার মাঝখানে স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো জেগে রয়েছে ঘোড়ার পিঠে নেতাজির মূর্তি। নির্মীয়মান বাড়ি, যে-কোনও উঁচু জায়গায় বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। সব মিলে তৃণমূলের জন্মলগ্নে শ্যামবাজারের এই মিটিংয়ের আবহ ছিল ইলেকট্রিফাইং।

মমতা আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে তার দশজন প্রার্থীদের সগর্বে উপস্থিত করল। কিন্তু দিন তিনেকের মধ্যে সেই তালিকায় কিছু রদবদল হল। নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় এল তার স্বামী সুদীপ। আমজাদ আলি শ্যামবাজার সমাবেশে তীব্র কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতা করে পরদিন কংগ্রেসে ফিরে গেলেন। মণিশঙ্কর আয়ার দিন তিনেক বাদে তার স্বস্থানে ফিরে গেলেন। মিটিং চলার সময়ে স্টেজের একপাশে মিডিয়ার লোকেরা ছবি তোলার জন্য ধাক্কাধাক্কি করছে। ওদিক থেকে কে যেন আমার হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিলে। চেয়ে দেখি এন ডি টিভি-র মণিদীপা। চিরকুটে লেখা 'এইমাত্র খবর পাওয়া গেল সনিয়া গাঁধী ঘোষণা করেছেন তিনি কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে প্রচারে নামবেন। তিনি ঠিক সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন না কিন্তু কংগ্রেসকে নির্বাচনে সাহায্য করবেন। এ বিষয়ে আপনার কমেন্ট?'

আমি আর কী কমেন্ট করব। পাশে-বসা মণিশঙ্করের দিকে চিরকুটটা

এগিয়ে দিলাম। আমি ঠিক জানি না আর ক'দিন আগে সনিয়া এই সিদ্ধান্ত নিলে পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের ভাঙন বন্ধ করা সম্ভব হত কিনা। নাকি মমতা তার মন আগেই স্থির করে ফেলেছে। মমতা আমাকে বলেছিল সেই রাত্রে ও সনিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল উনি সক্রিয় রাজনীতিতে আসার কথা চিন্তা করছেন কিনা। সনিয়া জবাবে বলেন, এখনও সময় হয়নি। যাহোক, এই নির্বাচনে আমি, রঞ্জিত পাঁজা, বিক্রম সরকার, সুদীপ, অজিত পাঁজা, আকবর আলি খোন্দকার ও অবশ্যই মমতা জয়লাভ করি। একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ দলের পক্ষে কম সাফল্য নয়। সব বড় বড় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন আমরা সকলেই পরাজিত হব। কংগ্রেসের ভোট দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবার ফলে সি পি এম দলের খুব সুবিধা হবে। তারা বিয়াল্লিশটি আসনেই জিতে যাবে।

নির্বাচনি কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বসুন্ধরা গৃহের পিছনের বাগানে মস্ত বড় কার্পেট পাতা হল। মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর থেকে কর্মীরা ভিড় করে আসেন। মাঠে বসে নির্বাচনের প্রচারের কৌশল নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। তখন রমজান শুরু হয়েছে। সূর্য অস্ত গেলে সুগত আমার সব মুসলিম কর্মীদের জন্য ফল মিষ্টির ব্যবস্থা করে। তারা বাগানে নমাজ করেন। আমার খুব ভাল লাগে। আমার অনেক কর্মী মুসলমান। বিষ্ণুপুর এলাকা থেকে যারা আসেন তারা অনেকে খ্রিস্টান।

অর্থচিন্তায় আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। প্রথম নির্বাচনের পরই নিঃস্ব হয়েছিলাম। দেড় বছরের মাথায় আর একটা নির্বাচন। কোথাও থেকে কোনও সহায়তার আশা নেই। একমাত্র ভরসা শিশিরকুমার ও সুগতর কষ্টার্জিত অর্থ। আরও একটা জিনিস আমাকে বিচলিত করছিল। তৃণমূল নূতন দল হওয়া সত্ত্বেও উপদলীয় কোন্দলের শেষ নেই। এ ফুটপাথে একজন নেতা তো অপর ফুটপাথে আর একজন। এর সঙ্গে কথা বললে অন্যজনের মুখ ভার। এ হল কংগ্রেসের কালচারের উত্তরাধিকার। মাঝারি মাপের নেতাদের নিয়ে মুশকিল। একেবারে তৃণমূল স্তরের কর্মীরা অনেক বেশি নিষ্ঠাবান। খুব দরিদ্র কর্মী নিজেই রং তুলি জোগাড় করে আঁকাবাঁকা অক্ষরে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে দেখলাম। একদিন বেশ রাত্রে কে যেন দরজায় বেল দিচ্ছে। খুলে দেখি তিন-চারজন অল্পবয়সি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বেহালার রাস্তায় অটো চালায়। তাদের তিনদিনের রোজগার থেকে জমিয়ে তারা



আমার জন্য একটি ব্যানার বানিয়ে এনেছে— কৃষ্ণা বসুকে এই চিহ্নে ভোট দিন। খুব সাধারণ ব্যানার কিন্তু আমাকে এত অমূল্য উপহার আগে কেউ দেয়নি। আমার চোখে জল এল।

একতলার ঘরে আমার আড়াইজন কর্মী ইলেকশন অফিস খুলে বসেছেন। আড়াইজনের দু'জন তুষার ও রঙ্কুদা— যাদের আমি টুইডেলডাম ও টুইডেলডি বলে থাকি— মাঝে মাঝেই নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছেন। 'রইল পড়ে সব' বলে একজন ওয়াক আউট করছেন। একটু পরে মাথা ঠান্ডা হলে আবার ফিরে আসছেন। আড়াইজনের আধখানা রতন চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, রঙ্কুদা তাকে নানা কাজে পাঠাচ্ছেন।

এমনি সময়ে এক সকালে খবর দিল কোনও এক উপদলীয় কোন্দল নিয়ে একজন আমার কাছে নালিশ জানাতে এসেছেন। মেজাজটা খিচড়ে গেল। উপদলীয় কোন্দল মেটাতে না-পেরে সে এলাকায় নির্বাচনি কাজকর্ম শুরু করা যাচ্ছে না। ওদিকে টেলিফোন বাজছিল। রঙ্কুদা যাদবপুরের কোনও এক এলাকায় আমাদের সবেধন নীলমণি একজনই কাউন্সিলার ছিলেন তার বাড়ি থেকে ফোন করছেন। রঙ্কুদা তার নাম করে আমাকে বললেন ও বলছে দিদি তো আমাদের জন্য তেমন কিছু করলেন না। আমার মাথায় চড়াত করে রক্ত উঠে গেল। একমাত্র কাউন্সিলার হওয়ার ফলে তাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি কোনও কাজই করতাম না। রেগে বললাম, দিন তো একবার ফোনটা ওকে। তারপর আমার স্বভাববিরুদ্ধভাবে তাকে ফোনে প্রচণ্ড বকাবকি করলাম। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

একসময়ে চোখ মেলে দেখলাম আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। নার্স জিজ্ঞাসা করল, একটু সুপ খাবেন? বললাম, ক'টা বেজেছে? শুনলাম বিকেল চারটে। মনে পড়ল আমি টেলিফোনে কথা বলছিলাম, তখন বেলা বারোটা। আমার কী হয়েছে? আমি এখানে কেন? নার্স বললে একটু পরেই ভিজিটিং আওয়ার্স, আপনাকে সবাই দেখতে আসবেন।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে একজন করে ভিজিটর একবারে আসতে পারেন। প্রথম ভিজিটর কন্যা শর্মিলা। খুব চিন্তিত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, আমার কী হয়েছে! সে রেগে উঠে বলল, এই একটা কথার আর কতবার জবাব দেব। আমি তো আশ্চর্য! কখন আবার ওর সঙ্গে কথা বললাম! দ্বিতীয় ভিজিটর পুত্র সুগত। সে খুব ধীর স্থির। একই প্রশ্নের জবাবে সে

বললে, তোমার মনে আছে ফোনে কথা বলছিলে। মনে আছে বইকী! বেশ ভালমতো বকাঝকা করতে পেরেছিলাম তো?

তুমি তো প্রচণ্ড বকাঝকা করলে, তারপরই তোমার শরীর খারাপ লাগল। আমরা তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলাম। বড় ডাক্তার দেখেছেন। এম আর আই করা হয়েছে। ডাক্তার তোমাকে নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর জিজ্ঞেস করলেন। তুমি তৎক্ষণাৎ ঠিকঠাক বলে দিলে। তারপর মুখে মুখে বড় বড় অঙ্ক জিজ্ঞাসা করাতে তুমি চটপট একদম কারেক্ট উত্তর দিয়ে ফেললে। দেখে শুনে ডাক্তার বললেন, চিন্তার কিছু নেই ঠিক হয়ে যাবে। একেবারে শর্ট টার্ম মেমরি অর্থাৎ সদ্য স্মৃতি যেখানে থাকে একটু ধাক্কা আছে, শীঘ্রই সেরে যাবে।

আমি নাকি ডাক্তারকে বললাম, আমি এখন নির্বাচনি প্রচারে ব্যস্ত আছি, অসুস্থ হয়ে পড়া চলবে না। ডাক্তার বললেন, আপনি কোন দলের প্রার্থী। আমি বললাম, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। আমার শর্ট টার্ম মেমরি বিশ্বাসঘাতকতা করল, আমি তৃণমূল কংগ্রেস ভুলে গেলাম।

তৃতীয় ভিজিটর ঘরে এলেন ডা. শিশিরকুমার বসু। বুঝতে পারলাম আমার জন্য চিন্তিত। প্রকৃতপক্ষে আমি আমার ছেলেমেয়েদের ও স্বামীকে কয়েক ঘণ্টা সংকটে ফেলেছিলাম। সুগত, শর্মিলা ও শিশিরকুমার উপস্থিত আছেন আর আমেরিকা থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করছিল সুমন্ত্র। বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সেদিনের স্মৃতি আমার কাছে অস্পষ্ট। তবু আমি ভাল আছি, একেবারে স্বাভাবিক দেখে ওরা আশ্বস্ত। এক ডাক্তার বন্ধু দেখতে এসে বললেন, মিসেস বোস, আর কখনও রাগ করবেন না। এখন রাগ নয়, অনুরাগ নয়, শুধু বিরাগ।

তিনদিন ডাক্তারদের অবজারভেশনে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে কাটাতে হল। চতুর্থ দিন ছাড়া পেলাম, সেদিন নির্বাচনে নমিনেশন দেবার শেষ দিন। নেতাজি ভবন হয়ে আলিপুরে ডি এম-এর অফিসে। সেখানে আমার কর্মীদের ভিড়। তারা আমাকে দেখে উল্লসিত। প্রবল জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে নমিনেশন পেশ করলাম। তারপরই খোলা জিপ চড়ে ড্রাইভার অঞ্জনিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে পথে। কোনও একটি বাংলা খবরের কাগজ নাকি লিখেছিল আমি মরণাপন্ন। আমার পরবর্তী দিনগুলির কাজকর্মে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।



১৯৯৮ সালে ফেব্রুয়ারিতে দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচন ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। একদিকে নির্বাচন বিশ্লেষক পণ্ডিতেরা বলে চলেছেন ভোট ভাগাভাগির ফলে তৃণমূলের প্রার্থীদের ভরাডুবি নিশ্চিত। রোজ খবরের কাগজ খুলেই দেখি আমার অবস্থা খুবই খারাপ। নেহাত গতবার দৈবক্রমে ওরকম কঠিন কমিউনিস্ট সিটে জিতে গিয়েছিলাম। এবার আর কোনও আশা নেই। অথচ নির্বাচনি প্রচারে বার হয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব ভবিষ্যদ্‌বাণী মেলাতে পারছিলাম না। যেখানে যাই মানুষের মধ্যে নূতন ধরনের উদ্দীপনা। আমাদের প্রথম কাজ ছিল মানুষের সঙ্গে নূতন প্রতীক দুটি ফুলের পরিচয় ঘটানো। অনেক প্রচারে সোনালী গুহ সঙ্গে থাকত। জিপের ওপর থেকে সোনালী ডেকে বলছে— এই যে দাদা মনে রাখবেন জোড়া ফুল। একটু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম খুব বেশি বলতে হচ্ছে না। জোড়া ফুল লোকে গ্রহণ করে ফেলেছে। মুখ ফুটে মানুষ মনের কথা খুব বলছে না। কিন্তু একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তখনকার জনপ্রিয় স্লোগান দাঁড়িয়েছিল— 'চুপচাপ ফুলে ছাপ।'

একটা সমালোচনা শোনা গিয়েছিল যেহেতু তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে মুসলমানরা সব বিপক্ষে চলে যাবে। এ আশঙ্কাও নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে অমূলক মনে হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে, মগরাহাটে দরিদ্র মুসলমান গ্রামে প্রচারে গিয়েছি দলে দলে নারীপুরুষ বার হয়ে এসেছেন। অনেক রাত্রে এক গ্রামে পৌঁছলাম। মুসলমান মেয়েরা অন্ধকারে কেরোসিনের কুপি হাতে পথে অপেক্ষা করছেন। জিপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কুপি ওপরে তুলে তারা আমার মুখ দেখবেন। পথের ওপর জিপ থামিয়ে সকলের আবদার তাদের গ্রামে একবার ঢুকতে হবে। গভীর রাত্রে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরছি, ড্রাইভার অঞ্জনি বললে, মা, আজ রাতে আর বাড়ি ফেরা হবে না।

মগরাহাটে গিয়ে দেখলাম তাদের জন্য যে খাবার জলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা অপূর্ণ আছে। আমি নলকূপের জন্য অর্থ অনেকদিন হল বরাদ্দ করেছি। কাজ করার কথা রাজ্য সরকারের, তারা কিছুই করেননি। গ্রামের দরিদ্র মুসলমান মেয়েরা কিন্তু বিশ্বাস হারাননি। তারা বললেন, মা তো দিয়েছে, নিশ্চয় পাব। একটু দেরি হচ্ছে।

যাদবপুর সেগমেন্টের চরিত্র বদল আমাকে চমকিত করল। আগেরবার আমার পথসভায় লোকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বক্তৃতা শুনত। এবার

পুরো যাদবপুর পথে নেমে এসেছে। মেয়েরা সংখ্যায় বেশি। কোথায় যেন মানুষের মনের অর্গল খুলে গেছে, ভয় আর নেই। বেশি রাতেও পথসভায় ভিড়। দিনেরবেলায় খোলা জিপে দাঁড়িয়ে চলেছি, মাথার ওপর প্রখর সূর্য। মেয়েরা ছুটে আসছেন— দিদি, জল খাবেন? এত রোদ্দুর, একটা ছাতা এনে দিই।

বেহালা পশ্চিম ও বেহালা পূর্ব এমনিতেই আমাদের শক্ত ঘাঁটি। এবার মনে হল মানুষের মনে উৎসাহ আরও বেশি। প্রচারে বেরিয়ে আমি দেখতাম অর্থের অভাবে আমাদের দেওয়াল লিখন, ব্যানার, পোস্টার বিশেষ কিছু নেই। আমার সি পি এম প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচার খুব রঙিন ও উজ্জ্বল। প্রতিটি মিনিবাসের পিছনে কাঠের বোর্ডের ওপর তিন-চার রকম রং দিয়ে সি পি এম প্রার্থীর নাম জ্বলজ্বল করছে। আমার ঝরঝরে জিপে চড়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি ম্লান মুখে দেখছি। জিপ যখন মিনিবাসের পাশাপাশি তখন বাসের চালক, পাদানিতে ঝুলে থাকা কন্ডাক্টর আমার দিকে হাত নাড়ছে আর বলছে, দিদি আমরা আছি। আমার ম্লানমুখে হাসি ফুটল।

মুসলিমপ্রধান কবিতীর্থ অঞ্চলে দেখলাম অনেক অল্পবয়সি মুসলিম ছেলে আমার জন্য কাজ করছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেলাম দলিতদের কাজ থেকে। জমাদারদের বস্তি থেকে জয়জয়রাম আমার সাহায্যে এগিয়ে এল। দরিদ্র ঘরে জন্ম কিন্তু জয়জয়রামের পড়াশুনোর প্রতি ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সে একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। কংগ্রেস সেবার তাদের বিধায়ক রামপিয়ারি রামকে আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছিল। ভোট বিষয়ে পণ্ডিতরা মত দিলেন রামপিয়ারি রাম অনেক ভোট পাবেন। আমার ভোটে তিনি ভাগ বসাবেন অতএব সি পি এম প্রার্থী মালিনীর জয় সুনিশ্চিত হবে। নির্বাচনের দু'-চারদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটা লেখা বার হল। বড় করে তার হেডলাইন হল 'মালিনী জয়ের মালা গাঁথছেন।' এর পরদিন আমি আমার খোলা জিপে কবিতীর্থে নির্বাচন প্রচারে বার হয়েছি। বারান্দায়, জানলায় লোকের ভিড়। তারা হাত নাড়ছে আর বলছে, ভয় নেই, আমরা আছি। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলেছি আর কানে আসছে, ভয় নেই। 'আমরা আছি' স্লোগান আগেও অনেক শুনেছি। অবাক হয়ে বললাম, 'ভয় নেই' বলছে কেন। তখন শুনলাম এ হল আনন্দবাজারের জবাব। আমি তখন কবিতীর্থের ষোলোআনা মসজিদের পাশ দিয়ে উর্দুভাষী এলাকার মধ্যে দিয়ে



চলেছি। কানে আসছে কবিতীর্থের নিজস্ব ধরনের স্লোগান— 'জিতেগা, জিতেগা, কৃষ্ণা বোস জিতেগা।'

সত্যিই ১৯৯৮-এর ইলেকশনে একটা আলাদা উন্মাদনা ছিল। একদিন বেহালার গলিতে জিপে করে একটি ছোট মিছিলের আগে চলেছি। পিছন ফিরে দেখলাম মিছিল ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। একশো, দুশো, পাঁচশো— বেহালার গলি মানুষের নদী হয়ে যাচ্ছে। তখন স্লোগান চলছে খুব কৌতূহলোদ্দীপক। 'সামনে কারা?' সমবেত কণ্ঠে 'তৃণমূল'। 'ডাইনে কারা?' 'তৃণমূল।' 'বাঁয়ে কারা?' 'তৃণমূল।' 'পিছনে কারা?' 'তৃণমূল।' অন্যরকমও আছে। কেউ ধ্বনি দিলেন— 'এই বেহালায় তৃণমূল' সমবেত গর্জন— 'তৃণমূল, তৃণমূল।' 'যাদবপুরে তৃণমূল— তৃণমূল, তৃণমূল।' 'এই বাংলায় তৃণমূল— তৃণমূল, তৃণমূল।'

এইরকম একদিন 'তৃণমূল, তৃণমূল' ধ্বনির মধ্যে প্রচার শেষ হল। প্রচারের শেষের দিকে একটা যান্ত্রিক ভাব এসে যায়। মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছি অথচ সত্যি করে হাসছি না। বক্তৃতা দিচ্ছি জিপে দাঁড়িয়ে, দু'পাশে জানলায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে নমস্কার করছি। কিন্তু কিছুই যেন আমি করছি না, অন্য কেউ করছে। আমার পাঁচ বছরের নাতি টিপু কবে ইলেকশন শেষ হবে দিন গুনত। এত হট্টগোল বাড়িতে ওর অপছন্দ। সে বলেছিল 'এনাফ অব দিস ইলেকশন'। শেষের দিন আমারও তাই মনে হল। প্রচার থেকে ফিরে সোজা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ততক্ষণে নীচের তলায় আমার ইলেকশন অফিস কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরদিন ভোটের জন্য বুথ কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া চলছে। গণনার দিনের ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে। তুষার ও রঙ্কুদার মধ্যে যেমন হয়ে থাকে মতবিরোধ হচ্ছে। তবে দু'জনেই এত ব্যস্ত যে বিরোধ বেশিদূর এগোতে পারছে না। তুষারের ওপর পরদিনের খাবার প্যাকেটের ব্যবস্থার ভার। আর রঙ্কুদাকে পরদিন সব বুথে ঘুরে দেখাশুনো করতে হবে। বুথে প্রবেশ করার অধিকার আছে শুধু আমার আর রঙ্কুদার, নির্বাচন প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্ট।

সকালবেলা থেকে আমি আর সুমন্ত্র বেরিয়ে পড়ি। আমাদের সবচাইতে দুর্বল জায়গা যাদবপুরই বেছে নিই। প্রত্যন্ত বুথগুলোতে আমাদের কোনও এজেন্ট নেই। অনেক জায়গায় থাকলেও ভয় দেখিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। সি পি এম দলের লোকবল অনেক বেশি। আমি বুথে ঢুকলে ক্যাডাররা

ফিসফিস করছে— এই ক্যান্ডিডেট এসেছে, সাবধান। ঢালিপাড়ার একটি স্কুলে এজেন্টদের ভয় দেখানো হচ্ছিল। আমি উপস্থিত হয়ে আমাদের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের কি ভয় করছে। একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না ভয় পাচ্ছি না কিন্তু কী ধরনের বেআইনি কাজকর্ম চলছে তা আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। দিনের শেষে খবর এল ছেলেটি বুথ থেকে বার হতে পারছে না, তাকে ক্যাডাররা শাসানি দিচ্ছে, বাইরে এলেই মারবে। রঙ্কুদা পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করলেন।

বাড়িতে সারাদিন ধরে সুগত ও শর্মিলা একটা কন্ট্রোল রুম মতো করে বসেছিল। সারাদিন ধরে নানাবিধ অভিযোগ। তারা ডি এম-এর অফিস, দিল্লি থেকে আসা অবজারভারদের অফিস সব জায়গায় খবর দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করেছে। মানুষ খুব ভোট দিতে চাইছে। ফোন করছে, দেখুন আমাদের দিতে দিচ্ছে না হ্যারাস করছে, কিছু করুন। আগের সন্ধ্যায় যাদবপুর এলাকা থেকে ফোনে অনেক অভিযোগ এসেছিল যে এলাকার বিধায়ক এবং জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় দ্বিতীয় ব্যক্তি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লাল আলো লাগানো গাড়িতে সদলবলে ঘুরছেন। এটা আইনসংগত কিনা, উনি এরকম করতে পারেন কিনা, আমরা কেন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছি না এই ধরনের অভিযোগ। ভোটের দিন বেহালা এলাকাতে 'নচে' নামে এক গুণ্ডা খুব উপদ্রব করল। সে একটা পিস্তল হাতে বুথে বুথে ঢুকে ভয় দেখাচ্ছিল। পুলিশকে জানানো হচ্ছে সে অমুক বুথে ঢুকেছে, পুলিশ পৌঁছতে পৌঁছতে সে হাওয়া। সারাদিন ধরে পুলিশ আর নচের লুকোচুরি চলল।

অবশেষে গণনার দিন। এই দিনে আমি সর্বদা খুব নিস্পৃহ বোধ করি। যাই ঘটুক না কেন আমার কোনও উদ্বেগ নেই— দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ। আমার কর্মীদের কাছে কিন্তু মরণ-বাঁচন সমস্যা। গণনার সময়েও নানারকম কারচুপি হয় তার থেকে রক্ষার উপায় বার করতে হবে। সকালবেলাতে আমি আর রঙ্কুদা দু'দিকে ভাগ হয়ে কাউন্টিং সেন্টারগুলো ঘুরে এলাম। কর্মীদের মনোবল বজায় রাখার জন্য এটা প্রয়োজন। সুগত আর সুমন্ত্র বিভিন্ন গণনাকেন্দ্রে রয়েছে। বাড়িতে শিশিরকুমার টেলিফোনের পাশে বসে আছেন, নানারকম খবর আসছে। চিরদিনের স্থিতধী মানুষটিকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখাচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে খবর এল দুই বেহালাতে খুব ভালভাবে এগিয়ে আছি। এগিয়ে আছি কবিতীর্থে। গণনা খুব ধীর গতিতে চলছে।



তখনও ভোটিং মেশিন চালু হয়নি। রাত নেমে এল। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছি। মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলে শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। টেলিফোনে কথা বলছেন। মগরাহাটে আমি পিছিয়ে পড়েছি। বিষ্ণুপুরে সমানে সমানে লড়াই হচ্ছে। বারুইপুরে অল্প এগিয়ে রয়েছি।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে আর একবার গণনাকেন্দ্রে যেতে হল। এবার যাদবপুরের গণনাকেন্দ্রে ঢুকলাম। সেটা আমাদের নিতান্ত দুর্বল জায়গা। কত পিছিয়ে আছি কে জানে! ঢুকেই সামনের টেবিলে আমাদের যে ছেলেটি বসেছিল তার সঙ্গে মুখোমুখি। দেখি তার চোখে জল। ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে। সে আমার হাত ধরে অবিশ্বাসের গলায় বললে, দিদি আমরা জিতছি। স্বাধীনতার পর থেকে যাদবপুর সেগমেন্টে কোনও অকমিউনিস্ট জিততে পারেনি। কালেভদ্রে পার্লামেন্টারি সিটে কেউ জিতেছেন— যেমন ১৯৮৪-তে মমতা, ১৯৯৬-তে আমি। কিন্তু যাদবপুর সেগমেন্টের নির্বাচনে সাধারণত হাজার হাজার ভোটে ভরাডুবি। সেদিন যাদবপুর গণনাকেন্দ্রে একটা ছোটখাটো ইতিহাস রচিত হচ্ছিল। আমাদের ছেলেরা বিহ্বল। শেষপর্যন্ত পনেরো হাজারের কিছু বেশি ভোটে যাদবপুরে এগিয়ে গেলাম।

দুপুরবেলা হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্র থেকে ফোন করে সুমন্ত্র বলল, সবমিলিয়ে তুমি এখন কত এগিয়ে আছ জানো কী? আমি জিজ্ঞাসা করলাম হাজার পঁচিশেক হবে তো? সে বললে, গণনা চলছে, এই মুহূর্তে তুমি আশি হাজার মতো ভোটে এগিয়ে রয়েছ। একটু পরে হেস্টিংসের গেটের কাছে নামলাম! আনন্দে উন্মত্ত বিশাল জনতা আমাকে ঘিরে ফেলল, জনতার চাপে কাহিল অবস্থা। সঙ্গে ছিল শর্মিলা। শুনতে পেলাম সে গেটের পুলিশকে বলছে— মাকে ভিড় থেকে বার করে আনুন। কয়েকজন মাত্র পুলিশ, আর কয়েকশত মানুষ। কে কী করবে! সেই সময়ে কে যেন আমার একটা ছবি তুলেছিল। পরনে হলুদ শাড়ি, মাথার চুল আবিরে সবুজ, হাতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ।

সে বছর তৃণমূল একটা চমক সৃষ্টি করেছিল। মাত্র দু'মাস বয়সের দল কলকাতা ও চারপাশে সাতটি সংসদ আসন জিতে নিল। কংগ্রেস একটি মাত্র জিতেছিল। মালদা থেকে গণি খান। মানুষের মনে বিরাট প্রত্যাশা। নতুন দল, অনেক নতুন মুখ। মানুষ একদলীয় দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসন থেকে একটা বদল

চাইছিল। সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল এতদিনে একটা বিকল্প পাওয়া যাবার সম্ভাবনা ঘটেছে।

দিল্লির রাজনৈতিক মহলে তৃণমূল সম্পর্কে কৌতূহল। আরও বেশি কৌতূহল তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে। কলকাতার কালীঘাটে একটি ছোট্ট ঘরে থাকে। কমদামি সুতির শাড়ি পরে। সাদা রং, একটু চেক বা ডুরে থাকতে পারে। পায়ে শস্তা প্লাস্টিকের চটি। ছেঁড়া থাকাতে অনেক সময়ে সেফটিপিন লাগানো। নিন্দুকেরা বলেন, এটা একটা 'পোজ'। বাংলায় যাকে বলে ভড়ং। মহাত্মা গাঁধীর অক্ষম অনুকরণ। কিন্তু নিন্দুকেরা যাই বলুন না কেন রাজনীতিকেরা যে ধরনের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মমতা যে তার ব্যতিক্রম একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মমতা সম্পর্কে আরও একটা ব্যাপার সকলকে বিস্মিত করেছিল। খুব সামান্য অবস্থান থেকে রাজনীতিতে তার উত্থান তার নিজেরই কৃতি। একথা বলা যাবে না যে সে কোনও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার পত্নী, প্রেমিকা, বিধবা বা কন্যা। কংগ্রেসের একজন সামান্য কর্মী হিসেবে ১৯৮৪ সালের সংসদ নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে সে সাংসদ হল। একথা সত্য সেবার ইন্দিরা গাঁধীর হত্যার পরে কংগ্রেসের দিকে একটা সমবেদনার ঢেউ ছিল। তেমনি একথাও মানতে হবে মমতা খুব খেটেছিল, যাদবপুরের মতো কঠিন জায়গায় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রার্থীকে হারানো খুব সহজ কথা নয়। পরের সংসদ নির্বাচনে ১৯৮৯ সালে যাদবপুর আবার কমিউনিস্টরা দখল করে নিল। দীর্ঘ সাত বছর পরে ১৯৯৬-তে যাদবপুর আমি কংগ্রেসের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলাম। মমতা দক্ষিণ কলকাতা থেকে দাঁড়িয়ে ১৯৯১-তে জয়ী হয়ে সংসদে যায়। তারপর আর তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন এক নূতন দলের নেত্রী হিসেবে সে যখন তার নবনির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে দিল্লি এসে পৌঁছল তখন সাংবাদিক মহলে বেশ হইচই পড়ে গেল। এমনকী বিদেশি সাংবাদিককুলেরও 'টৃণমূল' কী বস্তু জানতে বেশ ঔৎসুক্য।

আমরা যখন কংগ্রেস সাংসদ ছিলাম বিজেপি তখন আমাদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য। এখন সেই বিজেপি-র আমরা জোট সঙ্গী। একটা অস্বস্তি ছিল বইকী। আদর্শের দিক থেকে দুস্তর ফারাক। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি জোট রাজনীতির ধর্ম মেনে নিয়েছিল। তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়গুলি



সাময়িকভাবে চাপা দিয়ে রাখল। রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলিকে— যেমন তেলেগুদেশম, জয়ললিতার এ আই ডি এম-কে, মমতার তৃণমূল— যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। সব দল রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল তারা অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার গড়লে সমর্থন করবে। জয়ললিতার সমর্থনের চিঠি আসতে বেশ দেরি হল। কয়েকদিন ঘোর অনিশ্চয়তা। তারপর চিঠি যখন এল তখন দিল্লির রাজনৈতিক মহলে— 'চিঠ্‌টি আয়ি' বলে কিঞ্চিৎ হাসি, তামাশার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার জন্য বিজেপি তৃণমূলকে আমন্ত্রণ জানাল। শোনা যায় তারা একজন পূর্ণমন্ত্রী ও দু'জন রাষ্ট্রমন্ত্রী দিতে প্রস্তুত ছিল। মমতা সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে না, বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে। তেলেগুদেশম একই কথা বলল। কিন্তু চন্দ্রবাবু নাইডু স্পিকারের পদটি তার দলের জন্য আদায় করে নিলেন। এর আগে সাংমাকে দ্বিতীয়বার স্পিকার হিসেবে মেনে নেওয়া হবে এমনি কথা চলছিল। স্বভাবতই সাংমা ব্যাপারটি ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি। আমি মমতাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম স্পিকার পদটি চাইবার জন্য। কিন্তু সে কিছু করার আগে চন্দ্রবাবু নাইডু আসরে নেমে যান।

সেকেন্ড টার্ম এম পি হবার ফলে বাবা খড়্গ সিং মার্গে বেশ একটি বড়সড় ফ্ল্যাট আমার জন্য বরাদ্দ হল। আমি আমার নর্থ অ্যাভেনিউর ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে সুখেই ছিলাম। কিন্তু শুনলাম সেগুলি প্রথম টার্ম এম পি-দের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমি যে বহুতলের দোতলায় এলাম তার চারতলায় মমতার বাসস্থান। মমতার পাশের ফ্ল্যাটটি খালি ছিল। সে সময়ে মমতার একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী নয়না। সুদীপ প্রথমবারের এম পি হওয়া সত্ত্বেও মমতা তার জন্য পাশের ফ্ল্যাটটি চেয়ে নিল। আকবর আলি খোন্দকার, বিক্রম সরকার, রঞ্জিত পাঁজা তাদের জন্য নির্দিষ্ট নর্থ অ্যাভেনিউর ফ্ল্যাটে থাকতে গেলেন। অজিত পাঁজা রইলেন তার পুরনো বাড়িতে যেখানে তিনি আগে মন্ত্রী হিসেবেও থেকেছেন। অনেকের মনে হয়েছিল মমতার মন্ত্রীসভায় যোগদান না-করার সিদ্ধান্তে অজিতবাবু হতাশ হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন আবারও মন্ত্রী হবেন। বিশেষত বিজেপি-র দিক থেকে তৃণমূলকে মন্ত্রীসভায় নেবার একান্ত আগ্রহ ছিল। আমাদের কংগ্রেস সাংসদরা আমাদের কাছে তামাশা করে বলতে

লাগলেন— এ তোমরা কী করলে! টেবিলে পঞ্চব্যঞ্জন সাজানো আছে আর অজিতবাবুকে বলা হয়েছে খাদ্য স্পর্শ করবেন না! রাষ্ট্রপতি ভবনের চত্বরে বিশাল সমাবেশে আমাদের সকলের উপস্থিতিতে ১৯৯৮-এর ১৩ মার্চ অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীর পথে শপথ নিলেন।

আমার দ্বিতীয়বারের সাংসদ জীবন শুরু হল। প্রশ্নোত্তরপর্বে নানাবিধ প্রশ্ন করি, জিরো আওয়ারে গুরুতর কোনও ইস্যু থাকলে তুলতে চেষ্টা করি, বিতর্কে অংশ নিই। সব মিলিয়ে ব্যস্ত সাংসদ জীবন। পার্লামেন্টে দু' ধরনের কমিটি থাকে। আমি বিদেশমন্ত্রকের কনসালটেটিভ কমিটিতে যোগ দিলাম। অটলবিহারী বাজপেয়ী কমিটির চেয়ারম্যান। কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বিদেশমন্ত্রীও বটে। অন্য পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আমি আমার পুরনো হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে ফিরে গেলাম। সেবারও আগের মতো এস বি চ্যবন চেয়ারম্যান হয়েছেন। ওর সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবার কল্যাণের কাজ করে অনেক কিছু শিখেছি। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ন্যাশনাল মনুমেন্ট সাবকমিটি। ন্যাশনাল মনুমেন্টের ওপর কাজ করতে গিয়ে গোয়াতে যেসব প্রাচীন গির্জা আছে ঘুরে দেখছিলাম এবং তার সঠিক সংরক্ষণের জন্য রিপোর্ট পেশ করি। এখানেও দেখেছিলাম আর্কিওলজিকেল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ভালই কাজ করছে কিন্তু তাদের অর্থবল আরও বেশি হওয়া উচিত। প্রশ্নোত্তরপর্বে একবার একটা ছোট প্রশ্ন করেছিলাম। খুব ধুমধাম করে বিমানবন্দরের নামকরণ করা হয়— নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দর, ইন্দিরা গাঁধী বিমানবন্দর ইত্যাদি। কার্যকালে এসব নাম তো ব্যবহার হতে দেখি না। কলকাতা বিমানবন্দর, দিল্লিতে আই জি বিমানবন্দর— তা আই জি মানে ইন্দিরা গাঁধী কে বুঝবে। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী বললেন ব্যাপারটা দেখবেন। সপ্তাহের শেষে যখন কলকাতা ফিরছি ঘোষণা শুনলাম আমরা এখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে অবতরণ করছি।

এবার আমি মহিলাদের পার্লামেন্টে ও বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব কীভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে বিশেষভাবে মন দেব স্থির করলাম। এর আগে একাদশ লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিলের ওপর আমি আমার প্রথম জিরো আওয়ার বক্তব্য রেখেছিলাম। দলমত নির্বিশেষে মহিলা সাংসদরা এই বিলের জন্য আন্দোলন করছিলেন, তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। কিন্তু আমি প্রথমদিন থেকেই বুঝতে পারছিলাম এই তেত্রিশ পার্সেন্ট মহিলা সংরক্ষণ বিল বর্তমান



চেহারায় কোনও মতে পাশ করানো যাবে না। এর বিকল্প ভাবতে হবে। আমি আমার বিকল্প প্রস্তাবে বলতে শুরু করলাম সব রাজনৈতিক দল যখন নির্বাচনে তাদের প্রার্থী তালিকা তৈরি করবেন তখন দেখতে হবে পুরুষ বা স্ত্রী প্রার্থী কেউ যেন চল্লিশ পার্সেন্টের নীচে না থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলি স্বেচ্ছায় একাজ করবে মনে হয় না। এটি বাধ্যতামূলক করার সহজ উপায় আছে। রিপ্রেজেনটেশন অব পিপলস অ্যাক্ট বলে আমাদের যে ধারাটি আছে তাতে শুধু দুটি সংশোধনী যোগ করতে হবে। সংশোধনী এক, প্রার্থীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কেউ চল্লিশ শতাংশের নীচে হবেন না। সংশোধনী দুই, যেসব রাজনীতিক দল এ নির্দেশ অমান্য করবেন তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এটি সাধারণ মেজরিটি ভোটে পাশ হবে। সংরক্ষণ বিলটি সংবিধান সংশোধনী তাই দু'-তৃতীয়াংশ মেজরিটি প্রয়োজন। রিপ্রেজেনটেশন অব পিপলস অ্যাক্ট সংশোধনী অনেক সহজ।

মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে পেশ করার এক চেষ্টা সেবার হল। রাম জেঠমালানি পেশ করবেন। আমরা মহিলারা অনেকেই ওর কাছাকাছি গিয়ে বসলাম। আমিও কাছেই প্রথম সারিতে এগিয়ে বসলাম। স্পিকার তাকে পেশ করতে আহ্বান করলেন। উনি কাগজ হাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ উলটোদিকে মুলায়েম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি, লালুপ্রসাদের আর জে ডি ও অন্য কিছু সাংসদ ঝড়ের মতো আমাদের দিকে ধেয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে রাম জেঠমালানির হাতের কাগজ কেড়ে নিয়ে কুটি কুটি করে ছড়িয়ে তারা স্পিকারের চেয়ার ঘিরে ধরল। আমি দেখলাম আমার কাঁধের শাল উধাও। পায়ের এক পাটি চটিও নেই। শাল ও চটির খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে দেখি স্পিকারের সামনে হাউজের ওয়েল-এ ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়েছে। মমতা তার মধ্যে। সে এক সাংসদের কলার চেপে ধরেছে। আমার ভয় হল এবার মমতার ওপর আক্রমণ হবে। অদূরে দাঁড়ানো আকবরকে দেখে আমি আকবর, মমতাকে দেখো, মমতাকে দেখো বলে চিৎকার করলাম। আকবর সেদিকে ছুটল। বুদ্ধিমান রাম জেঠমালানি অন্য কাগজ হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার বিলটি তুলে ধরে 'আমি বিল ইনট্রোডিউস করলাম' ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্পিকার হাউজ মুলতবি করে উঠে গেলেন। বিরোধী পক্ষ মমতার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন আনার তোড়জোড় শুরু করল।

বাড়িতে ফিরে মমতার ফ্ল্যাটে বসে আমি তাকে বললাম আজকে পার্লামেন্টে ওর কার্যকলাপ আমি একেবারেই পছন্দ করছি না। ওইভাবে পার্লামেন্টের ভিতর আর এক সাংসদের কলার চেপে ধরা অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। আমি বললাম, তুমি একটি দলের নেত্রী, এ ধরনের কাজ করার আগে দু'বার চিন্তা করবে। মমতার ভিতরে একটা ছেলেমানুষি দিক আছে। সে বললে, কৃষ্ণাদি, বিশ্বাস করুন আমি সেভাবে কিছু করিনি। আপনি টেলিভিশন ফুটেজ দেখলে বুঝবেন। লোকটাই তো আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমি পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলাম, ভাবলাম ওর চুল ধরে উঠে পড়ব। হাত বাড়িয়ে দেখি মাথায় টাক, তাই তো কলার চেপে ধরলাম। এইরকম একটা চমকপ্রদ যুক্তি শুনবার পরও আমি ওকে সমর্থন করতে পারছি না। এমন সময়ে টেলিফোন বাজতে লাগল। পরিচিত, অপরিচিত বেশ কয়েকজন ফোনে বললেন— মমতা, আপনি বেশ করেছেন, এই লোকগুলোর সঙ্গে ওইরকম ব্যবহার করাই উচিত। এরপর আমাকে হার স্বীকার করতে হল।

দ্বাদশ লোকসভার স্পিকার হয়েছিলেন বালযোগী। তেলেগুদেশম পার্টির দাবি মেনে নিয়ে বিজেপি পদটি তাদের ছেড়ে দিয়েছিল। প্রথমদিকে বালযোগী পার্লামেন্ট কেমন সামলাতে পারবেন সংশয় ছিল। উনি প্রথমবারের এম পি, হিন্দি জানেন না, ইংরেজি দুর্বল। পার্লামেন্টে গণ্ডগোল শুরু হলে প্রথমদিকে উনি শুধু 'নট গুড, নট গুড' বলতেন। কিছুদিন পর উনি চেঁচামেচি হলে বলতে শিখলেন— নাথিং উইল গো অন রেকর্ড। প্রথমদিকের অসুবিধা বালযোগী কাটিয়ে উঠেছিলেন। তিনি মানুষ ভাল ছিলেন, যথাসাধ্য ভালভাবে অধিবেশন পরিচালনা করতেন। আমার সঙ্গে তার বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে আমি তাকে একটা কড়া চিঠি দিয়ে বিব্রত করেছিলাম। পরপর ক'দিন একটা প্রশ্ন করব বলে হাত তুলছি। স্পিকার কিছুতেই আমার দিকে আর তাকান না। যারা গলা ফাটিয়ে অধ্যক্ষজি বলে চিৎকার করেন তাদের সুযোগ দেন। কখনও অনেকগুলো হাত উঠেছে উনি মার্শালের দিকে তাকান। হাত-তুলিয়েদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কেউ থাকলে মার্শাল ওর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেন। চটে গিয়ে আমি একটা দীর্ঘ পত্রাঘাত করলাম স্পিকারকে। বললাম আমরা যারা নিয়ম মেনে চলি, হাত তুলে আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করি তারা কোনওদিন সুযোগ পাই



না। যারা নিয়ম ভাঙেন, চিৎকার করেন, আপনার অনুমতি ছাড়াই বলতে শুরু করে দেন তারা বেশ ভাল আছেন। গলার জোরে পেরে উঠি না বলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা মেয়েরা। আমার পত্রাঘাতের ফলে স্পিকার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মিটিং ডেকে ফেললেন। সব দলের নেতারা সেই মিটিংয়ে ছিলেন— মুলায়েম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমাকে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হল। সব নেতারাই বললেন মোটের উপর আমি ঠিক কথাই বলেছি। আমি আরও সওয়াল করলাম যে সবসময়ে শুধু প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয়দের অগ্রাধিকার না-দিয়ে যারা নতুন, যারা ব্যাকবেঞ্চার অর্থাৎ পিছনের বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকে তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। সব নেতারা মাথা নেড়ে ঠিক কথা, ঠিক কথা বললেন। বেশ দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। মাঝপথে একবার সোমনাথবাবু কাজ আছে, উঠি বলে উঠে পড়েছিলেন। আমি বললাম, সোমনাথবাবু, প্লিজ চলে যাবেন না, বসুন। উনি আবার বসে পড়লেন। তবে এই মিটিংয়ের ফলে অবস্থা যে খুব পালটে ছিল তা কিন্তু বলা যাবে না। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একজন আমাকে আড়ালে বলেছিলেন আপনি যে বলছেন মেয়েরা বলতে না-পেরে ক্ষতিগ্রস্ত হন কথাটা ঠিক নয়। দু'-চারজনের নাম করে উনি বললেন গলাবাজিতে এরা কম যান না।

স্পিকারের সঙ্গে একবার এক ডেলিগেশনে মরক্কো গেলাম। তখনও তাদের খ্যাতনামা রাজা হাসান জীবিত আছেন। ওদের পার্লামেন্টের অধিবেশনের প্রথম দিনে আমরা আমন্ত্রিত ছিলাম। দর্শকের আসনে বসে দেখলাম ওদের সাংসদরা— ওরা বলেন ডেপুটি— সব একধরনের সাদা লম্বা গাউন পরে আছেন। ওটা ওদের ইউনিফর্ম। আগের দিন ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি, বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিন্তু ইউনিফর্ম পরে থাকার ফলে আলাদা করে কাউকে চিনতে পারছি না। আমাদের পার্লামেন্টে এরকম ইউনিফর্ম চালু করা যায় কিনা তাই নিয়ে নিজেরা কথা বললাম। রাজা হাসান এক মিছিলের অগ্রভাগে গাড়িতে দাঁড়িয়ে পার্লামেন্টে এলেন। দু'ধারে দাঁড়ানো অনুগত জনতার দিকে তিনি চুম্বন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। আলাদা একটি ঘরে আমাদের রাজদর্শন হল। হাসান আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, সৌজন্য বিনিময় হল। হাসান শুধু রাজা নন দেশের ধর্মীয় নেতা। আমরা হোটেলে ফিরে এলে পর হোটেলের মহিলা কর্মীরা এসে আমাদের

স্পর্শ করতে লাগলেন। তোমরা ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে এসেছ আমরা তোমাদের ছুঁয়ে পুণ্য অর্জন করি।

স্পিকার বালযোগী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন আমার স্ত্রীর জন্য মরক্কো থেকে কী নিয়ে যাই বলুন তো। আমি বললাম, মরক্কোর লেদার বা চামড়া খুব বিখ্যাত। আপনার স্ত্রীর জন্য চামড়ার হাত ব্যাগ নিয়ে যান। উনি অমনি টেলিফোন তুলে স্ত্রীকে বলতে লাগলেন মাদাম বোস বলছেন তোমার জন্য হাত ব্যাগ নিয়ে যেতে। মাদাম বোসকে জানো তো? খুব অ্যাকটিভ পার্লামেন্টেরিয়ান...।

মরক্কো বড় সুন্দর দেশ। আমরা প্রথমে কাসাব্লাঙ্কা ও পরে রাবাট-এ গিয়েছিলাম। তবে ফেজ ও মারাকেশ দুটি প্রাচীন শহর আমাদের মুগ্ধ করেছিল। ফেজ-এর এবড়ো-খেবড়ো পাথর বসানো সংকীর্ণ গলিপথ, দু'দিকে পুরনো বাড়ি, দোকানঘর। তবে আমার মারাকেশ আরও সুন্দর মনে হল। অনেকদিন আগে আমি আর শিশিরকুমার জার্মানির উইসবাডেন শহর দেখে মুগ্ধ হয়ে ঠিক করেছিলাম কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর উইসবাডেনে বসবাস করব। আমি মারাকেশ থেকে শিশিরকুমারকে ফোন করে জানালাম আমি মত বদল করেছি। রিটায়ার করে মারাকেশে শেষ জীবন কাটাব। মারাকেশে এক মরোক্কান পারিবারিক বন্ধু এসে একদিন আমাকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। চুল পনিটেল করে বাঁধা বেশ বর্ণময় চেহারা। জয়ন্তী নটরাজন ও অন্যান্য সাংসদ বন্ধুরা তাকে দেখে বেশ মুগ্ধ।

মরক্কোর দিনগুলি বেশ হইচই করে কেটে গেল। শেষদিনে সন্ধ্যাবেলায় আমি রাবাট-এ হোটেলের ডাইনিং রুমে একা বসে ডিনার করছি। হল-এর একপাশে স্টেজে চারজন মিউজিশিয়ান বসে আছেন। দু'জন আমাদের সারেঙ্গির মতো দেখতে তারের যন্ত্র বাজাচ্ছে আর দু'জন তবলার মতো কী যেন বাজিয়ে সংগত করছে। সুরটি টানা, করুণ, অনেকটা আমাদের ভাটিয়ালির মতো। খাওয়া শেষে উঠে আসছি ম্যানেজার বললে— ম্যাডাম, যাবেন না। একটু বসুন, এখুনি বেলি ডান্স (belly dance) শুরু হবে। মনে হল ওরা চাইছে এক শাড়ি পরিহিতা বিদেশিনী ওদের নাচ দেখুক। বেলি ডান্স সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল ছিল না। কিন্তু সেদিন দেখলাম এর শরীর ভঙ্গিমায় কতখানি সৌষ্ঠব আছে। আর এই নাচ কত কঠিন। সেই চার সংগীতশিল্পী মন উদাস করা সুরে কী অচেনা রাগিনী বাজিয়ে চলেছেন। কবি



কিটস-এর 'ওড টু নাইটেঙ্গল' কবিতার সেই রুথ নাম্নী মেয়েটির মতো বিদেশের মাটিতে বসে আমি দেশের জন্য হোমসিক বোধ করলাম।

জেনেভা থেকে আমি কলকাতায় শিশিরকুমারকে ফোন করলাম। মরক্কো রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে আমি খবর পেয়েছিলাম আমাদের নেতাজি ভবনের বিশ্বস্ত সেবক নগসুন্দরম আর নেই। নগসুন্দরম ছিল পূর্ব এশিয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজের এক তামিল সৈনিক। যুদ্ধের শেষে অন্যান্য আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহিদের সঙ্গে শরণার্থী হিসেবে সে নেতাজি ভবনে এসেছিল। সেই থেকে সে নেতাজি ভবনে থেকে যায়। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর আর্কাইভ দেখাশুনো করা, মিউজিয়ামের দেখভাল করা সবেতেই সে শিশিরের অক্লান্ত সহযোগী ছিল। আমি জানতাম তার মৃত্যু শিশিরকুমারকে অত্যন্ত বিচলিত করবে। টেলিফোনে তার কণ্ঠস্বর শান্ত ও নিষ্কম্প শোনাল। বললেন, সুন্দরমের ছেলে এসেছে খুব কান্নাকাটি করছে। তাকে বলেছি, চোখের জল ফেলো না, তোমার পিতার জন্য গর্ববোধ করো। তখন জানতাম না আর বছর দুয়েক পরে ওই বাক্যটি আমার ছেলেদের বলতে হবে।

স্পিকারের কথা বলতে গিয়ে ডেপুটি স্পিকার পি এম সৈয়দ-এর কথা মনে পড়ছে। সৈয়দকে ডেপুটি স্পিকার করা নিয়ে বেশ নাটক হয়েছিল। বিজেপি ঠিক করেছিল তাদের মহিলা সাংসদ রীতা ভার্মাকে ডেপুটি স্পিকার করবে। কংগ্রেস জানিয়েছে তারা চায় পি এম সৈয়দকে ডেপুটি স্পিকার করা হোক। মমতা বিজেপির জোটসঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও ঠিক করলে সৈয়দকে সমর্থন করবে। বাজপেয়ী শরিক দলের নেতাদের বৈঠক ডাকলেন। সে বৈঠকে মমতা আমাকে পাঠাল প্রতিনিধিত্ব করতে। সে নিজে অথবা সাধারণত যেমন হত সুদীপ কেন গেল না আমি বুঝলাম না। আমার ওপর এই ভার কেন জিজ্ঞাসা করাতে মমতা এক অদ্ভুত যুক্তি দিল। সে বললে, আমি দেখেছি আপনি যখন কাশ্মীর, পাকিস্তান এইসব নিয়ে পার্লামেন্টে বলেন বাজপেয়ীজি আড়চোখে চেয়ে খুব মন দিয়ে শোনেন। আপনি কিছু বললে উনি শুনবেন।

সেই মিটিংয়ে নীতিশকুমার ও মানেকা গাঁধী খুব উগ্র মেজাজে দেখলাম। মমতার পি এম সৈয়দ প্রীতি ওদের পছন্দ হয়নি। ওরা রাগতভাবে আমাকে বললেন, ঠিক আছে তোমরা মুসলিম চাও তো, আমরা বিহারের আবদুর গফফুরের নাম প্রস্তাব করছি, তা হলে চলবে?

আমি খুব শান্ত ছিলাম। কিছুতেই আমাকে উত্তেজিত করা গেল না।

আমি বললাম, কথাটা হিন্দু-মুসলমানদের নয়। আমি খুব নিশ্চিতভাবে জানি রীতা ভার্মা খুব ভাল ডেপুটি স্পিকার হবেন। কিন্তু সাধারণত ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে করা হয়। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখা দরকার। কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছে সৈয়দের জন্য। সেই অনুরোধ রাখলে বিজেপির সুনাম হবে, ক্ষতি কোনও হবে না। আমি বাজপেয়ীজিকে বলেছিলাম, আমরা আপনার ওপর ভার ছেড়ে দিচ্ছি। বাইরে সাংবাদিকদের আপনি বলবেন যে কংগ্রেসের অনুরোধ আমি মেনে নিচ্ছি। উনি একটু হতাশ মুখে বললেন, হামারা উপর মত ছোড়িয়ে। যো করনা হ্যায় কর দিজিয়ে। সৈয়দ ডেপুটি স্পিকার হবেন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর আমি উঠে গিয়ে বাজপেয়ীজিকে বললাম, আই অ্যাম সরি। আমাকে যা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তা আমি করেছি। কিন্তু তার জন্য এই বর্ষীয়ান রাজনীতিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ বিতর্ক করতে হল বলে দুঃখিত বোধ করছিলাম। মাঝখানে বিজেপি-র কেউ একজন বলেছিলেন স্পিকার তো আমাদের নন তাই আমরা ডেপুটি স্পিকার পদটি চাই। আমি বললাম, স্পিকার আমাদের নন মানে? আমরা সব জোট শরিকরা তাকে নির্বাচিত করেছি। তেলেগুদেশমের প্রতিনিধিরা আমার সমর্থনে মাথা নাড়তে লাগলেন, স্পিকার তাদের দলের। আদবানিজি তাড়াতাড়ি মন্তব্য করলেন— না না স্পিকার অবশ্যই আমাদের।

সেই ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মে একদিকে ভারতবর্ষের জয় জয়কার অন্যদিকে আবার তীব্র সমালোচনা। আমরা নিউক্লিয়ার টেস্ট করেছি। সফল পরমাণু শক্তি পরীক্ষা করেছি। দেশে ও বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে জয়ের উল্লাস। আমরা যেন গন্তব্যে পৌঁছেছি, পারমাণবিক শক্তিধর হয়েছি। অবশ্য দেশে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সরকারের সমালোচনা হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হল। আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে ইকনমিক স্যাংশন অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করল। জাপান ভারতকে দেয় আর্থিক বিভিন্ন অনুদান বন্ধ করে দিল। ভারতের পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষার জবাবে পাকিস্তান পরপর কয়েকটি সফল পারমাণবিক পরীক্ষা করে জানান দিল তারাও কম যায় না। পৃথিবী জুড়ে একটা ভীতি ছড়িয়ে পড়ল ভারত-পাক যুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়। সে সময়ে দু'-একটি নূতন শব্দবন্ধের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম। একটি 'no first use'. বাজপেয়ী সমগ্র পৃথিবীকে বারবার



আশ্বস্ত করলেন যে ভারতবর্ষ কখনও এই মারণাস্ত্র প্রথম ব্যবহার করবে না। অপরটি হল 'minimum deterrent'।

বিরোধী পক্ষ এই নিউক্লিয়ার টেস্টের ওপর বিতর্ক দাবি করল। স্পিকার দাবি মেনে নিলেন। উইক এন্ডে আমি যেমন প্রতিবার যাই কলকাতা যাব। ফিরে এসে সোমবারে সংসদে ভারতের এই পরমাণুশক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার বিতর্কে অংশগ্রহণ করব। শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে বসে খবর কাগজ পড়ছিলাম। আমি পারতপক্ষে ভি আই পি লাউঞ্জে অর্থাৎ যেখানে মন্ত্রী, এম পি ইত্যাদিদের বসার কথা সেখানে বসতাম না। সাধারণ এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে বসে আছি। দেখি এক ব্যক্তি এসে ঢুকলেন ঘাড় পর্যন্ত লম্বা সাদা ধবধবে চুল। রোজই এর ছবি কাগজে তখন দেখি। পোখরানে বাজপেয়ীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি বিজ্ঞানী আবদুল কালাম।

আমি ওর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আগামী সপ্তাহে আমাকে নিউক্লিয়ার বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হবে, আমি কী বলব? উনি বললেন, একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি যদি ক্ষমতাবান হন সকলে আপনাকে খাতির করবে। যে দুর্বল তাকে কেউ মান্য করে না। এই কথাটা মনের মধ্যে রেখে তারপর আপনার যা ইচ্ছা তাই বলুন। খানিক এই আলোচনার পর অন্য কথাও হল। ডা. শিশিরকুমার বসুও যোগ দিলেন। ওর সঙ্গে কালাম ওর পিতৃব্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও অনেকক্ষণ কথা বললেন। সেদিন অবশ্য আমার কোনও ধারণা ছিল না যে কিছুদিনের মধ্যে ওকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পাব এমনকী রাষ্ট্রপতিরূপে তাকে কলকাতার নেতাজি ভবনেও স্বাগত জানাব।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দেখা হল সার্ক সামিটে ১৯৯৮ সালের জুলাইতে। নিউক্লিয়ার ঝামেলার পর প্রথম দেখা। বাজপেয়ীজি ফিরলে পর আগস্টের ৩ তারিখে আমাদের বিদেশনীতির ওপর পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার একটু অসুবিধা হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই নিউক্লিয়ার দৌড়ে অংশ নেওয়ার পক্ষপাতী নই। অথচ আমার দল তো বিজেপি-র জোটসঙ্গী। ভেবেচিন্তে বক্তৃতা করতে হল। আমি বললাম— যারা পরমাণুশক্তিধর দেশ, যাদের বলা হয় nuclear haves, তারা যাদের নেই, have nots, তাদের উপর একটা অসাম্য অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা

করেন সেটা আমরা ভাঙতে পেরেছি। এখন প্রধানমন্ত্রী যে দায়িত্ব ও সংযমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা যেন পালন করা হয়। আমরা যেন এশিয়াতে নিউক্লিয়ার রণসজ্জার বিপজ্জনক পথে না পা দিয়ে ফেলি তা দেখতে হবে। পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে আমাদের কূটনীতির পথে আলোচনা চালাতে হবে। পোখরান বিস্ফোরণের পর প্রধানমন্ত্রী একটা নতুন স্লোগান দিয়েছিলেন— 'জয় বিজ্ঞান।' আমি বক্তৃতায় বলেছিলাম, যেদিন আমরা রাজনীতি ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সুস্থ সহাবস্থান গড়ে তুলতে পারব যার ফলে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশ থেকে দারিদ্র ও ক্ষুধা দূর হবে সেদিনই প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া স্লোগান সত্যিকারের অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এই জোট সরকার খুব ঐক্যবদ্ধভাবে চলছে না এমনি একটা কথা বছরের শেষের দিক থেকে শোনা যেতে লাগল। অন্তত একজন জোটসঙ্গী এ আই ডি এম কে-র নেত্রী জয়ললিতার সঙ্গে সমস্যা চলছিল। বিজেপি সর্বদাই জয়ললিতার মন রেখে চলার চেষ্টা করত। একবার জয়ললিতা দিল্লি এলে বিজেপি-র সাংসদ বিজয় গোয়েল তাকে বিরাট ডিনার দিলেন। সেখানে ওর সঙ্গে বেশ আলাপ হল। আমাকে কিঞ্চিৎ অবাক করে দিয়ে উনি বললেন আমার কথা অনেক শুনেছেন, পার্লামেন্টে আমি যা বলি উনি লক্ষ রাখেন, কাগজে পড়েন। ধরে নিলাম ভদ্রতাবশত উনি এসব কথা বলছেন।

জনতা পার্টির সুব্রাহ্মণ্যম স্বামীর সঙ্গে জয়ললিতার সে সময়ে একটা আঁতাত হয়েছিল। শুনেছিলাম স্বামীর জনতা পার্টি এক সদস্য বিশিষ্ট দল, উনি একাই সদস্য। বহুদিন উনি পার্লামেন্টের বাইরে ছিলেন। দ্বাদশ লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। ওর সঙ্গে দেখা হলে অন্য সাংসদরা জিজ্ঞাসা করতেন, এখন তুমি কার সর্বনাশ করবে ভাবছ? কারণ উনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন, এমনি ধারণা ছিল।

শোনা গেল উনি জয়ললিতাকে পরামর্শ দিয়েছেন বাজপেয়ী সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে। এরপর সব বিরোধীদলের সমর্থনে সনিয়া গাঁধী জোট সরকার গড়বেন। তার মন্ত্রীসভায় জয়ললিতা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব পাবেন। বলা যায় না প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যেতে পারেন। স্বামী নাকি অর্থমন্ত্রী পদের দাবিদার। এইসব গুজব সত্ত্বেও কেউ ঠিক ভাবতে পারেনি যে সরকার সত্যি পড়ে যাবে। অনেকে বলছিল সরকার বদল হতে পারে কিন্তু পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হবে না।



জয়ললিতা দিল্লি এসে নামলেন শোনা গেল সঙ্গে অনেক ট্রাঙ্ক এনেছেন শাড়ি ভরতি। শপথ গ্রহণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে দরকার হবে। সনিয়া ও জয়ললিতা-র একটা বিখ্যাত টি-পার্টি হল সে সময়ে। দু'জনের হাসিমুখ ছবি দেখলাম খবর কাগজে। সবাই বললে ভারতের ভাগ্য এখন এই দুই মহিলার হাতে। বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। কারণ তখন আরও একজন ক্ষমতাশালী মহিলা রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি বহুজন সমাজ পার্টির মায়াবতী। তার যে অল্প ক'জন সাংসদ তাদের সমর্থনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

জয়ললিতা সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন। রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে আস্থাভোট নিতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বললেন রাষ্ট্রপতির এ নির্দেশ দেওয়া সঠিক হয়নি। আস্থা ভোটের উপর জোর বিতর্ক হল। মায়াবতী বিতর্কে বললেন তিনি ও তার দল মনে করেন বিজেপির জোট ও অপরদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীদের জোট দুটোই সমান খারাপ তাই তারা কাউকে ভোট দেবেন না, ভোটদানে বিরত থাকবেন। শাসকদল এ খবরে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। ওরা ভোটদানে বিরত থাকলে সরকার পড়বে না। আর মায়াবতী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যখন ঘোষণা করেছেন তখন তা নিশ্চয় মেনে চলবেন।

পরদিন ছবিটা পালটে গেল। অধিবেশন কক্ষের দরজার কাছে প্রাক্তন স্পিকার সাংমা আমাকে বললেন, শুনেছেন তো দিদি? মায়াবতী বিরোধীদলের সঙ্গে ভোট দিচ্ছে। আজই পার্লামেন্ট শেষ। আমার মতো অনেকের কাছেই খবরটা অবিশ্বাস্য মনে হল। মমতা বললে, মিছিমিছি প্যানিক ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। আজ সকালেও অটলজির সঙ্গে মায়াবতীর কথা হয়েছে।

মায়াবতী যেমন শোনা গিয়েছিল অন্যদিকে ভোট দিলেও পার্লামেন্টের পতন ডেকে আনল অন্য একটি ভোট। একভোটে সরকার পরাজিত হয়েছিল। ভোটদান শুরুর আগে কক্ষে প্রবল উত্তেজনা। কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে বসে আছেন— উড়িষ্যার নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। ইনি সাংসদ ছিলেন। দলের ইচ্ছায় অল্পদিন আগে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হয়েছেন। শপথও গ্রহণ করেছেন। একদিকে বলা যায় উনি ছ'মাস সাংসদ থাকতে পারেন। অন্যদিকে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর উনি সেই রাজ্যের

বিধানসভার অংশ বিবেচিত হবেন। তার ভোট দেওয়া দূরস্থান সংসদ কক্ষে প্রবেশ করাই কি উচিত।

স্পিকার বালযোগী নানান বইপত্র ঘাঁটতে বসলেন। দেখা গেল একবার সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবার পর সংসদকক্ষে প্রবেশ করলে তদানীন্তন স্পিকার তাকে তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে চলে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু বালযোগী রুলিং দিলেন এক্ষেত্রে সংসদ সদস্য তার বিবেক যা বলে সেইরকম কাজ করবেন। স্পিকার কী আশা করেছিলেন জানি না। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর বিবেক তাকে সংসদ কক্ষে বসে থাকার নির্দেশ দিল। ভোট গণনায় দেখা গেল অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার এক ভোটে পরাজিত হয়েছে। মাত্র তেরো মাসের মাথায় পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে। সকলেরই মনখারাপ। সনিয়া বললেন তাঁর হাতে যথেষ্ট সাংসদ আছে তিনি মন্ত্রীসভা গড়তে পারবেন। তাকেও আস্থা ভোট নিতে হবে। তিনি কয়েকদিন সময় চাইলেন। রাষ্ট্রপতি নারায়ণন তাকে বেশ কয়েকদিন সময় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সনিয়া জানালেন তিনি যথেষ্ট সমর্থন জোগাড় করতে পারেননি। বিশেষ করে মুলায়েম সিং যাদব ও তার দল সনিয়ার বিদেশিনী পরিচয়ের কথা তুলে তাকে সমর্থন করবেন না বললেন। পার্লামেন্ট ভেঙে যেতে বসেছে দেখে দলমত নির্বিশেষে অনেকেই বলতে লাগলেন এবার থেকে যে দলই আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাব আনবেন তারা যেন আগেই বিকল্প সরকার গড়তে পারবেন কিনা বুঝে নেন। এইভাবে বারবার অল্পদিনের মাথায় পার্লামেন্ট ভেঙে যাওয়া দেশের পক্ষে ভাল নয়। স্পিকার দ্বাদশ লোকসভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

আর একবার পার্লামেন্টের চারপাশের গাছপালা, বিশাল স্ট্যাচুদের বিদায় জানালাম। এপ্রিল মাস, চারিদিকে ফুল ফুটেছে, লাল কৃষ্ণচূড়া, বেগুনি জারুল। দিল্লি বেশ সুন্দর সেজেছে। আমি যে আবার তিনবার এখানে ফিরে আসব তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।



চার

## শতাব্দীর সূর্যাস্ত

আবার একটা ইলেকশন! সকলের মনে একটা যাকে বলে 'ইলেকশন ফেটিগ' বা নির্বাচনি ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতা দু'তরফেই একধরনের অনীহা। তার উপর জানা গেল সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে নির্বাচন হবে। সামনের পাঁচমাস মনে হল ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হবে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য তা হল না। ভাল-মন্দ মিলিয়ে পরের কয়েক মাস ঘটনাবহুল হয়েছিল।

এপ্রিলের শেষে আমি ও শিশিরকুমার একটি বেসরকারি ডেলিগেশনে পাকিস্তান গেলাম। যাবার তোড়জোড় চলছিল। হঠাৎ পার্লামেন্ট পড়ে যাওয়াতে আমার যাবার কাগজপত্রের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখা গিয়েছিল। সেসব সামলে আমি দলবলসহ লাহোরে পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন ভারতীয় হাইকমিশনার পার্থসারথী। পাকিস্তানে এর আগেও আমি একাধিকবার এসেছি। ওদেশে যেতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। তার কারণ ঐতিহাসিক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সিঙ্গাপুরে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী বা আই এন এ গড়ে তোলেন তার বেশিরভাগ অফিসার ছিলেন পঞ্জাবের মুসলমান পরিবারের। দেশ ভাগ হওয়ার ফলে তারা পড়ে যান পাকিস্তানে। পরিবর্তিত সময়ে তারা তাদের নতুন দেশকে অনেক দায়িত্বশীল পদে থেকে সেবা করেছেন। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাদের ভালবাসা ও আনুগত্য রয়ে গেছে প্রশ্নাতীত। সেইসব পরিবারের সদস্যরা আমাদের খুবই আপনজন। আমরা গেলে তাদের সঙ্গে থাকি। তারা আমাদের পরমাত্মীয়ের মতো গ্রহণ করেন। লাহোরে আছে আই এন এ-র ফার্স্ট ডিভিশনের কম্যানডার মহম্মদ

জমান কিয়ানির মেয়ে-জামাই। মিসেস কিয়ানি আছেন রাওলপিণ্ডিতে। লাহোরে আরও আছেন রাজা মহম্মদ আরশাদ। কর্নেল দারার ছেলেমেয়েরা ইসলামাবাদে কেউ, কেউ বা লাহোরে। হবিবুর রহমানের ফ্যামিলি ইসলামাবাদে। করাচিতে, পেশোয়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন অনেকে। আমি গেলে সব ঠাঁই মোর ঘর আছে। এবার অবশ্য ডেলিগেশনে এসেছি। সকলে একসঙ্গে থাকা। অনেক বন্ধুরা এসে দেখা করে গেলেন। একদিন চলে গেলাম হিউম্যান রাইটস কমিশনে। সেখানে আছেন আসমা জাহাঙ্গির, আই এ রহমান, মুবাশির হাসান। শিশিরকুমারের সঙ্গে লাহোরের আর একটা বন্ধন আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কুখ্যাত লাহোর ফোর্ট কারাগারে নিঃসঙ্গ সেলে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন তিনি। ১৯৯৪ সালে যখন লাহোর এসেছিলাম পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে লাহোর ফোর্ট কারাবাসের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করেছিলেন শিশিরকুমার।

আমরা ডেলিগেশন নিয়ে যখন লাহোরে পৌঁছলাম তখন ভারত-পাক সম্পর্কে একটু সুসময় চলছে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তার বিখ্যাত বাসযাত্রা করে পাকিস্তান ঘুরে গেছেন। নওয়াজ শরিফ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন। আমাদের ডেলিগেশনের সঙ্গেও অনেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফেরও সাক্ষাৎকার স্থির হয়ে আছে। লাহোরে আমি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থেকে বাদ পড়ে যাই। তবে যা ঘটে তা হয়তো ভালর জন্যই হয়। আমরা দেশে ফিরে আসা মাত্র কার্গিল যুদ্ধ বেঁধে গেল। বন্ধুরা আমাদের পরিহাস করে বলতে লাগল— কী ব্যাপার বলো তো? তোমরাও গেলে আর ভারত-পাক যুদ্ধ বাধিয়ে চলে এলে?

অটলবিহারী বাজপেয়ীর পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বিরোধীপক্ষের সমালোচনার সামনে পড়তে হল। নিজের দলের কট্টরপন্থীরাও তাকে বিদ্রূপ করে বললেন— যখন উনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তখন পাকিস্তান পিছন থেকে কার্গিল যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে। এই নিয়ে কম জল ঘোলা হল না। নওয়াজ শরিফ বলেছিলেন পারভেজ মুশারফের ষড়যন্ত্রের খবর তিনি জানতেন না। অবশ্য এতসব সত্ত্বেও অটলবিহারী বাজপেয়ী মুশারফকে আগ্রায় আলোচনার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন।



ইলেকশনের দেরি আছে, পার্লামেন্টও নেই, হাতে অনেক সময়। আমি ও শিশিরকুমার জুন মাসের গোড়ায় হপ্তাখানেকের জন্য মুম্বাই যাব ঠিক করলাম। আমাদের পারিবারিক ক্যালেনডারে আমাদের দৌহিত্র টিপুর জন্মদিন ছিল এক বিশিষ্ট তারিখ। লন্ডন, বস্টন, কলকাতা, মুম্বাই যেখানেই তার জন্মদিন হোক আমরা সপরিবার হাজির। সেবার আমি ও শিশিরকুমার কলকাতা থেকে মুম্বাই এলাম। সুগত এল সুদূর আমেরিকা থেকে। সুমন্ত্র তুরস্কে কাজে আটকে যাওয়াতে আসতে পারল না। জন্মদিন তো বেশ আনন্দে কাটল। কিন্তু তার পরদিন শিশিরকুমার হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন। অসুস্থতা এমন পর্যায়ে গেল যে তৎক্ষণাৎ ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করতে হল। আমাদের পাঁচদিনের ছুটি কাটাতে আসা তিন সপ্তাহে গড়িয়ে গেল। সুগত আর আমি ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের অস্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হলাম। আমি করিডরের জানলার ধারে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা আরব সমুদ্রে ঢেউয়ের ওঠা-পড়া আর রং বদলানো দেখি। অনুমতি পেলে মাঝে মাঝে ইনটেনসিভ কেয়ারে ঢুকে শিশিরকুমারকে দেখি। আমাদের সঙ্গ দেন ডাক্তার বন্ধু এরিন ব্রোচা। ব্রিচ ক্যান্ডির বড় ডাক্তার ডা. উডবাদিয়া সুগত ও আমাকে ডেকে যা বললেন তাতে বুঝতে পারি ভরসা বিশেষ নেই।

এইসময়ে রোজ সকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ফোন পাই। অনেক সময়ে সুধীন্দ্র কুলকার্নি ফোন করেন। প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইছেন উনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন। আমার কী প্রয়োজন। আমি বলি, আমি যেমন করে হোক ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। সেই সময়ে যদি কোনও দরকার হয় নিশ্চয় জানাবো। আমি স্ট্রেচারে করে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। ডাক্তারদের অনুমতি নেই। ইনটেনসিভ কেয়ারে বেশ কিছুদিন কাটাবার পর সাধারণ কেবিনে আনা হল। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর কলকাতা যাবার অনুমতি মিলল।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশ পেয়ে মহারাষ্ট্র সরকার যাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি জানালাম আমার একটি ভাল অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া আর কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির হলেন মহারাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। সঙ্গে পুলিশের উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার। রুগির কেবিনের সামনে পুলিশের ভিড় দেখে শিশিরকুমার দুর্বলভাবে হাসলেন। বললেন, 'অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ছে।'

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ছাত্রনেতা হিসেবে গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। সেখানে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তখন ইংরেজ সরকার বন্দি হিসেবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে রুগির কেবিনের সামনে এমনি বন্দুকধারী পুলিশের ভিড় থাকত।

অ্যাম্বুলেন্সের আগে হুটার লাগানো পুলিশের জিপ ছিল, জ্যাম থেকে রক্ষা পাবার জন্য। আমি সেটা বাতিল করলাম। হাসপাতাল থেকে বিমানবন্দর, তারপর এরোপ্লেনে তুলে দেওয়া মহারাষ্ট্র সরকার যেমন সুবন্দোবস্ত করেছিলেন কলকাতার নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দরে নেমে তেমনি অব্যবস্থায় পড়লাম। হুইলচেয়ার পাওয়া যায় না। বাইরে এসে দেখি এক ঝরঝরে এ-সি-বিহীন অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। রুগিকে হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল স্থানান্তরিত করার কথা। জ্যাম থেকে বাঁচতে যশোর রোড ঘুরিয়ে যখন নার্সিংহোমে পৌঁছনো গেল তখন শিশিরকুমারের অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি হয়েছে। কলকাতায় ডাক্তার বন্ধুরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারা আসার খবর পাননি। তা হলে এমন অব্যবস্থা হতে দিতেন না।

এদিকে কলকাতা ফেরা মাত্র আমার রাজনীতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে দলে দলে লোকের আনাগোনা। আমিও আজ বেহালা, কাল বারুইপুর, পরশু কবিতীর্থ ছুটোছুটি শুরু করলাম। আমার নীচের তলায় অফিস সরগরম হয়ে উঠল। আমি যাদের টুইডেলডাম ও টুইডেলডি নাম দিয়েছি সেই রঙ্কুদা ও তুষার অফিসে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে শিশিরকুমার নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরলেন। ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ও নেতাজি ভবনে কাজকর্ম শুরু করলেন। চেম্বারে রুগির সংখ্যা ডাক্তারের নির্দেশে খুবই কমিয়ে দিতে হল। তখন ডাক্তার হিসেবে ওঁর নামডাক এমন যে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। ওঁর চেহারা দেখে বোঝা যেত না একটা সংকটজনক অসুস্থতা থেকে সবে সেরে উঠেছেন। এমনিতে বয়সের তুলনায় ওঁকে সবসময় তরুণ দেখাত। অল্পদিন আগে পাকিস্তান থেকে ফিরে দিল্লিতে বিমানবন্দরে নেমেছি। ইমিগ্রেশনের অফিসার পাসপোর্টে ওর জন্মতারিখ ও তারপর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতনা উমর মে এতনা আচ্ছা সকল্'। পিছনে কিউতে দাঁড়ানো মহিলা বলে উঠলেন, 'ক্যায়া আপ নজর লাগাতে হ্যায়।'



প্রতিবার নির্বাচনের সময়ে যেমন হয়। আমার সংসার লণ্ডভণ্ড। আমি জিপে চড়ে বেরিয়ে পড়ি সাতসকালে, ফিরে আসি মাঝরাত্রে। সেই সময়ে প্রথম আমার হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিপে দাঁড়িয়ে থাকায় ব্যথা বেড়েই চলল। এইসময়ে সংসারের ভার অনেকখানি লাঘব করেছিল আমার বহুদিনের সেবিকা অমলা। সে একদিকে শিশিরকুমারের পরিচর্যা ও অন্যদিকে আমার ছয় বছর ও তিন বছরের দুই দৌহিত্রের দেখাশুনো করা দক্ষ হাতে চালিয়ে গেল। তাদের মা সেইসময়ে লন্ডনে ও বাবা মুম্বাইতে।

সে বছরে সেপ্টেম্বর মাসে প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হল। রোজই নির্বাচনি প্রচার শেষে ভিজে বাড়ি ফিরি। রাজ্য জুড়ে বন্যা দেখা দিল। কলকাতাও ভাসছে। আমাদের কর্মীরা নির্বাচনি কাজ ছেড়ে বস্তি ও দুর্গত এলাকা থেকে মানুষজনকে উদ্ধার করে এনে ইস্কুল বাড়ি, অন্যান্য আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার কাজে ব্যস্ত। আমার নিতান্ত অল্প নির্বাচনি বাজেট থেকে চাল ডাল কিনে খিচুড়ির ব্যবস্থা হল। সেবার সি পি এম আমার বিরুদ্ধে কান্তি গাঙ্গুলীকে দাঁড় করিয়েছিল। তিনি বেশ জবরদস্ত প্রার্থী। আমাদের কর্মীরা চিন্তিত। দিদি কী করে এর সঙ্গে পারবে। জানা গেল বৃষ্টিতে জলে ডোবা এলাকায় উনি তোয়ালে জড়িয়ে নেমে পড়েছেন ত্রাণ কাজে। রাস্তায় প্রচারে বেরিয়ে যাকে পাচ্ছেন জড়িয়ে ধরছেন। বলছেন, আমার নাম কান্তি গাঙ্গুলী, আমার কথা মনে রাখবেন। হঠাৎ করে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে আগুন লেগে গেল। পরদিন কাগজে ছবি জলের বালতি হাতে আগুন নেভাতে নেমে পড়েছেন। কান্তি গাঙ্গুলী প্রথম থেকেই একটা যেন জিতেই গেছেন এইরকম মনোভাব নিয়ে চলছিলেন। আমাদের ছেলেদের উপর বেশ একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ ছিল। সেবার যাদবপুর এলাকাতে কিছু নির্বাচনি মারদাঙ্গাও হয়েছিল। গণনার দিনেও যখন আমি এগিয়ে যাচ্ছি তখনও অপর পক্ষ জয়ের অপেক্ষায় বাজি পটকা ফাটিয়ে চলেছে।

কান্তি গাঙ্গুলীকে আগে আমি কোনওদিন চাক্ষুষ দেখিনি। নির্বাচনি প্রচারেও কোনওদিন মুখোমুখি দেখা হয়নি। নির্বাচনে জয়ের পর আমি এক দুর্গাপূজার মণ্ডপে গিয়েছি সেখানে একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, দিদি আমি আপনার ছোট ভাই, আপনার কাছে হেরে গিয়েছি। আমার নাম কান্তি গাঙ্গুলী। আমি হেসে

বললাম, ছোট ভাই জিতলে দিদি খুশিই হত। পুজোমণ্ডপে ফটোগ্রাফারদের মধ্যে ছবি তোলার জন্য একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

সেবার অনেক রাত্রে আমাদের নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল। কলকাতার অন্য নির্বাচন কেন্দ্রগুলোকে ইলেকট্রনিক ভোটের মেশিন দেওয়া হলেও আমার যাদবপুর সংসদ কেন্দ্রে দেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিবারের মতোই সারাদিন গড়িয়ে রাত্রি হল গণনা আর শেষ হয় না। রাত দুটোর পর আলিপুর গণনাকেন্দ্রে ডাক পড়ল। সেবার আমি যা ভোট পড়েছিল তার ঊনপঞ্চাশ শতাংশ পেয়েছিলাম, সি পি এম প্রার্থীর ছিল তেতাল্লিশ শতাংশ ভোট। সেই গভীর রাত্রে শিশিরকুমার বললেন তিনি আমার সঙ্গে যাবেন।

অত রাত্রেও আলিপুর গণনাকেন্দ্রের সামনে উৎসাহী জনতার বিশাল ভিড়। ভিতরে কর্মীরা আনন্দে আত্মহারা। আমি আর সুগত ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে কথা বলছি। শিশিরকুমার তার ক্যামেরায় ছবি তুলে চলেছেন। ছেলেরা আমার সঙ্গে ছবি তুলবে বলে ঘিরে ধরছে।

মমতা এবার সিদ্ধান্ত নিল সে মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভায় মমতা রেলমন্ত্রী হল। আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনের চত্বরে দাঁড়িয়ে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখলাম। রেলমন্ত্রক খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। সারা ভারতকে রেললাইন এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। সমস্যাও আছে। বহুদিনের পুরনো রেললাইন সর্বক্ষণ মেরামতির প্রয়োজন পড়ে। সারা দেশের অনেক রেলসেতুর অবস্থা বেশ খারাপ, যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে। যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন খুব গুরুতর। সাধারণত রেলবাজেটে খরচাপাতির কথা ভেবে অনেক সময়ে যাত্রী ভাড়া, মালের ভাড়া বাড়াতে হয়। এই ভাড়া বাড়ানো সাধারণ মানুষ পছন্দ করেন না। মমতা এ ব্যাপারে কী ভাবনা চিন্তা করবে জানতে সবাই উৎসুক।

মমতা রেলবাজেট তৈরি শুরু করার সময়ে কিছু শিল্পপতি আমার সঙ্গে দেখা করে মমতাকে তারা পলিসি তৈরিতে সাহায্য করতে চান এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কথাটা আমি মমতার কাছে তুলেছিলাম কিন্তু খুব একটা সাড়া পাইনি। প্রকৃতপক্ষে এর আগের লোকসভায়— মমতা সেবার মন্ত্রীও নয়— কলকাতার কোনও কোনও শিল্পপতি আমার সঙ্গে দেখা করে মমতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-এর কিছু পেটোয়া শিল্পপতি আছেন। এরা সে দলে পড়েন না। ওরা মমতার সঙ্গে



সরাসরি কথা বলতে সে সময়ে ইতস্তত করছিলেন। নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সে সময়ে আমরা সাতজন সদ্য নির্বাচিত হয়েছি। মমতার সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণা ছিল না। আমাকেও যে চিনতেন তা নয়। তবে রাজনীতিতে আসার আগেই এদের কারওর সঙ্গে আমার সাধারণ সামাজিক পরিচিতি ছিল। কেউ কেউ আমাকে ডা. শিশিরকুমার বসুর পত্নী হিসেবে চিনতেন। সেবারও আমি মমতাকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। হয়তো দোষ আমার, জোর দিয়ে বলা হয়নি। তবু আমার মনে পড়ে আমি বলেছিলাম রাজ্য থেকে শাসকদলকে দূর করতে হবে শুধু এই কথা বললে তো হবে না। আমরা মানুষকে কী দেব সেকথা মানুষ জানতে চাইবে। আমাদের নতুন দল, লোককে বলতে হবে আমাদের শিল্পনীতি কী, আমাদের কৃষিনীতিই বা কী। সংবাদপত্রে বলে ফেলেছিলাম আমাদের ইনসিয়োরেন্স ওপেন করে দেওয়া উচিত। পরদিনই দেখলাম আমারই দলের কোনও সাংসদ মন্তব্য করেছেন, উনি আবার ইনসিয়োরেন্সে ইন্টারেস্টেড হলেন কবে থেকে। অমনি আমি মুখে কুলুপ আঁটলাম। মমতার নিজের পছন্দ কোনও তাৎক্ষণিক জনপ্রিয় নীতি বা আন্দোলন।

রেলমন্ত্রকের বাড়িটি বিশাল, নাম রেলভবন। তার সামনে সাজানো আছে ছোট্ট একটি রেলের ইঞ্জিন। মমতা সেখানে বসতে শুরু করলে আমরা সদলবলে তাকে দেখতে গেলাম। মমতা আমাদের জন্য চা, কফি বা স্যুপ অর্ডার করল। সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে পয়সা বার করল। মমতা নিজে এক কাপ চা খেলেও তৎক্ষণাৎ পয়সা দিয়ে দিত। মমতার সততা লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। বিশেষ যখন চারপাশে বহু রাজনীতিকই দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। মমতা একটা ছোট গাড়ি করে রেলমন্ত্রকে যেত। একদিন কী যেন গাড়ি বিভ্রাট হল। মমতা নীচে নেমে ছুটোছুটি করছে। আমি আমার গাড়িতে করে এসে নামলাম। আমার তখন একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ঝরঝরে গাড়ি। কিন্তু দেখতে বেশ বড়, রংটাও সুন্দর। এক নজর দেখে মমতা বলল, না এত ভাল দেখতে গাড়িতে আমি উঠব না। রাস্তা থেকে একটা অটো ধরা হল। অটোতে চড়ে রেলমন্ত্রী দপ্তরে চলে গেলেন। মমতার এই সহজ সরল জীবন যাপন সকলের প্রশংসা পেত। কিন্তু আড়ালে একটা গুঞ্জন ছিল যে ওর চারপাশে যারা আছেন তাদের সকলের সততা প্রশ্নাতীত নয়। এ ধরনের কথা নিন্দুকেরা বলছেন না কোনও ভিত্তি আছে তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

মমতা রেলভাড়া বাড়াবে না। তবে রেলমন্ত্রকের আয় হবে কেমন করে। ওর মাথায় নানারকম আইডিয়া। রেলমন্ত্রকের অনেক জমি জায়গা পড়ে আছে, লিজ দিলে কিছু আয় হতে পারে। আমাদের দেশে লোকে বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ করে, টিকিট পরীক্ষায় কড়াকড়ি করলেও আয় বৃদ্ধি হবে। এই সময়ে আমি একদিন ওকে বললাম— আমার বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করতে আসে সে আমাকে বলেছে তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। সে বলেছে, 'আগে তো বিনা টিকিটে আসতাম এখন মমতাদি মন্ত্রী হয়ে টিকিট চেক হচ্ছে। টিকিট কাটতে হয় বলে আমার খরচ বেড়ে গেছে।' একথা ঠিক যে রোজ গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে মেয়েরা ট্রেনে চড়ে ভোরবেলা শহরে কাজে আসে। সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি ফিরে যায়। মমতা যে আমার কাহিনি মনে করে রেখে দিয়েছে তা আমি বুঝিনি। কিন্তু বাজেট পেশ হলে পর দেখা গেল সে একটা তিন মাসের মান্থলি পাস প্রবর্তন করেছে। অল্প টাকার সেই পাস নিয়ে যেসব মেয়েরা কলকাতায় কাজ করতে আসেন তারা, যারা তরিতরকারি বাজারে বিক্রি করতে আসেন তারা ও বাড়ি তৈরিতে মিস্ত্রির কাজ করতে আসেন যারা তারাও কলকাতায় আসা যাওয়া করতে পারবেন। কোনও এম পি বা এম এল এ সুপারিশ করে দেবেন যে তাদের আয় যথার্থই কম।

মমতা যেদিন রেলবাজেট পেশ করল সেদিন ওপরে বিশিষ্ট অতিথিদের গ্যালারিতে বসে দেখছিলেন শিশিরকুমার, তার সঙ্গে ছিল আমার ননদ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কন্যা অনিতা। মমতার রেলবাজেট মোটের উপর সকলকে খুশি করেছিল। রেলবাজেটে সকল রাজ্যকে খুশি করা প্রায় অসম্ভব।

ফেব্রুয়ারির গোড়াতে অনিতার কলকাতায় আমাদের কাছে আসার কথা ছিল। ফেব্রুয়ারির দুই তারিখে ছিল শিশিরকুমার বসুর আশি বছরের জন্মদিন। সেই সময়ে পারিবারিক উৎসবে অনিতার যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু ও ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারেনি। ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুদের নিয়ে আমরা বসুন্ধরা গৃহে উৎসব পালন করেছিলাম। পিছনের ছোট বাগানে রঙিন সামিয়ানা, গাছে ছোট ছোট টুনি বাল্‌বের আলো। একে একে বন্ধুরা এসে পৌঁছচ্ছেন। চোখে ভাসছে ফুলের গুচ্ছ হাতে ঢুকছেন বসন্ত চৌধুরী। বলছেন, কী শিশির নাকি আশি হয়েছে! অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর সেই বোধহয় শেষ কোনও অনুষ্ঠানে আসা। এরপরই উনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুগত, সুমন্ত্র ও শর্মিলা খুব সুন্দর কেক তৈরি করিয়েছিল। নেতাজি ভবনের আকৃতির বিশাল চকোলেট



কেক। সাধারণত আমাদের বাড়ির যে-কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান হয়। সেদিন হয়নি। ঠিক হল পরে শর্মিলা একটি একক অনুষ্ঠানে শিশিরকুমারের প্রিয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনাবে। এর কয়েকদিন আগেই প্রথম শিশিরকুমার বক্তৃতা চালু হয়েছিল। অধ্যাপক লেনার্ড গর্ডন শিশিরের উপস্থিতিতে সেই ভাষণ দিয়েছিলেন। অনিতা এসব কিছু থেকে বাদ পড়েছিল। ফেব্রুয়ারির শেষে রেলবাজেটের কাছাকাছি সময়ে সে আমাদের সঙ্গে দিল্লিতে এসে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাল।

নির্বাচিত হয়ে আসার পরই আমি ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে একটা নতুন দায়িত্ব পেলাম। বিদেশ দপ্তরের পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন-এর পদে নিযুক্ত হলাম। এই দায়িত্ব আমি ২০০৪ সালের ত্রয়োদশ লোকসভা পড়ে যাওয়া পর্যন্ত পালন করেছিলাম। এই কাজে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম আর অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। অবশ্য প্রথম খবরটা শোনার পর যখন জানতে পারলাম আমার পূর্বসূরি এই পদে ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং তারপর ইন্দ্রকুমার গুজরাল তখন যেমন গর্ব হল তেমনি চিন্তাও হয়েছিল। মমতা নিজে রেলমন্ত্রী হয়েছিল আর অজিত পাঁজা হয়েছিলেন বিদেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মমতা চিফ হুইপ করল। মমতা মাঝে মাঝেই বলছিল আমাকে চেয়ারম্যানদের প্যানেলে ঢোকাবে। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার যখন উপস্থিত থাকেন না তখন চেয়ারম্যানদের প্যানেল থেকে কেউ অল্পক্ষণ লোকসভা পরিচালনা করেন। ঘুরে ফিরে সকলেরই ডিউটি পড়ে। এদিকে আমি আবার একেবারেই চেয়ারম্যানের প্যানেলে যেতে চাই না। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হলে একটা আলাদা চ্যালেঞ্জ আছে অন্য সময়ে চেয়ারম্যান হয়ে বসে থাকাটা আমার কিঞ্চিৎ বোরিং মনে হত। মমতা উঠে পড়ে লেগেছিল আমাকে অন্যতম চেয়ারম্যান করবেই। এমন সময়ে খবর এল বিদেশমন্ত্রকের কমিটির চেয়ারম্যান পদটি আমাকে দেওয়া হয়েছে।

কমিটি পরিচালনা করতে গিয়ে আমি দেখলাম আমার কমিটিতে রাজ্যসভা ও লোকসভার অনেক বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ানরা রয়েছেন। রাজ্যসভা থেকে আছেন করণ সিং, এল এম সিংভি, টি এন চতুর্বেদি, রঙ্গনাথ মিশ্র এবং আরও অনেকে। লোকসভা থেকে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন সুশীল সিন্ধে, আর এল ভাটিয়া। বিভিন্ন সময়ে বিদেশ দপ্তর কমিটিতে আমি পেয়েছি

কুলদীপ নায়ার, ফলি নরিম্যান, অরুণ জেটলি, মানেকা গাঁধী, জয়া প্রদা, জনা কৃষ্ণমূর্তি, ভেঙ্কাইয়া নাইডু, সুরেশ প্রভু, নটবর সিং আরও অনেকজনকে। আমার সৌভাগ্য আমি এদের সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা পেয়েছি। আমি তিনজন বিদেশ সচিবের সঙ্গে কাজ করেছি— ললিত মান সিং, চোকিলা আইয়ার, কানওয়াল সিবাল। এরা সকলে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। প্রথমদিকে ছিলেন ললিত মান সিং; তার সঙ্গে আমার দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হয়ে যায়। পরে যখনই আমি ডেলিগেশন নিয়ে ওয়াশিংটন গিয়েছি ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে। প্রথমে যশোবন্ত সিংহ পরে যশোবন্ত সিন্‌হা আমাদের বিদেশমন্ত্রী হয়েছিলেন। আমার কাছে অনেক বিদেশি কূটনীতিক ও বিদেশি ডেলিগেশন আসতেন। তাদের কাছে দুই যশোবন্তকে আলাদা করে চেনানো বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। বেশ কিছুদিন বিদেশমন্ত্রকের স্পোকসপার্সন ছিলেন নিরুপমা রাও। তিনিও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন।

বিদেশ দপ্তর পার্লামেন্টারি কমিটির একটা প্রধান কাজ ছিল বিদেশমন্ত্রকের বাজেট পর্যালোচনা করা অর্থাৎ অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো কমানো নিয়ে মতামত দেওয়া। আমার মনে পড়ে অন্তত একাধিকবার আমি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে পেরেছিলাম। সে সময়ে কালচারাল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন হিমাচল সোম। এরা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কাজ করেন। আমার মনে হয়েছিল এদের অর্থানুকূল্য করা উচিত। ওয়াশিংটনে একটি ভারতীয় কালচারাল সেন্টার গড়ে তোলার কথা বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। কিন্তু এই কাজটা আমি চেষ্টা করেও এগোতে পারিনি। দূতাবাস একটি ভাল বাড়ি দেখে কিনবার জন্য মন্ত্রককে সুপারিশ করেন, তখন দিল্লিতে ফাইল নড়া-চড়া শুরু হয়। ফাইল-এর এই ধীর গতির মধ্যে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। আমি নিজে ওয়াশিংটনে থাকার সময়ে রাষ্ট্রদূত ললিত মান সিংকে সঙ্গে নিয়ে দুটি অত্যন্ত সুন্দর বাড়ি ওয়াশিংটনের কেন্দ্রস্থলে দেখেছিলাম। একটি ছিল পুরনো ধাঁচের বিশাল গির্জা। বিদেশমন্ত্রক ও অর্থমন্ত্রকের গড়িমসিতে দুটোই হাতছাড়া হয়ে যায়।

কমিটির আর একটি বড় কাজ ছিল দিল্লিতে যে অসংখ্য বিদেশি ডেলিগেশন আসেন তাদের স্বাগত জানানো, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। অনেক সময়ে পুরো কমিটির সঙ্গে তাদের বৈঠক হত, কখনও তারা



চেয়ারপার্সন হিসেবে আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বা কল অন করতেন। এই বিদেশিদের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, ভারতবর্ষের বিদেশনীতি তাদের বোঝানো, দু'দেশের মধ্যে কোনও সমস্যা থাকলে তা নিরসনের চেষ্টা, এসবই ছিল আমার কাজ। এই কাজে আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। আমার কর্তব্য আমি যথাসাধ্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছি।

প্রথমেই একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ডেলিগেশন এসে পৌঁছল ২০০০ সালের গোড়াতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এলেন, সঙ্গে তার সেনেটের কংগ্রেসের অনেক সদস্যদের নিয়ে বিশাল ডেলিগেশন। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও দেখাশুনো করা আমাদের কমিটির উপর পড়ল। বিল ক্লিনটন সেন্ট্রাল হল-এ লোকসভা ও রাজ্যসভার যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিলেন। তার ভাষণ শুনে অথবা বলা ভাল তার মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বে দলমত নির্বিশেষে সব পার্লামেন্টেরিয়ানরা একেবারে কুপোকাত। ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কট্টর আমেরিকা বিরোধীরাও দেখা গেল বিগলিত। কেউ কেউ পরিহাস করে বললেন, এখন যদি বিল ক্লিনটন সি টি বি টি হোক বা যে-কোনও চুক্তি সই করতে বলতেন পার্লামেন্টের সব সদস্য বিনা দ্বিধায় সই করে দিতেন। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বিল ক্লিনটনের ভারত সফর থেকেই ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক এক নতুন মোড় নিল। অনেকদিনের শীতল সম্পর্কের পর দুই দেশের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্কের সূচনা হল। সেন্ট্রাল হল-এ আমি ঘুরে ঘুরে ডেলিগেশনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। পরদিন কোনও কাগজে দুষ্টুমি করে লিখল— সব এম পি-রা যখন ক্লিনটনের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য ছুটোছুটি করছেন আর কংগ্রেসের কোনও কোনও মহিলা সদস্য নিজেদের সনিয়া গাঁধীর চোখে পড়াবার চেষ্টা করছেন তখন দেখা গেল এম পি কৃষ্ণা বসু আমেরিকার ডেলিগেশনের অন্য সদস্যদের নিষ্ঠার সঙ্গে তদারক করছেন।

এই ডেলিগেশনের সঙ্গে আমাদের কমিটির বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল। ওদের দিকে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন গ্যারি অ্যাকারম্যান, জ্যান সেকোওস্‌কি, শীলা জ্যাকসন লি, জিম ম্যাকডরমট, আরও অন্যান্যরা। নানা বিষয়ে কথা হয়েছিল। ইরাকে তখন স্যাংশন বা নানা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা যাকে বা যাদের

শাস্তি দেবার জন্য করা হয় তাদের কিছু হয় না কিন্তু দুঃখকষ্টে পড়ে যান সাধারণ মানুষ ও শিশু। ওরা সেকথা স্বীকার করেছিলেন। ইরাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শিশুরা। যাইহোক, ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিল ক্লিনটন-এর ভারত সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমাদের দেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরই আমরা একটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিলাম। তখন পৃথিবীতে দুটি শক্তির কেন্দ্র। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া অন্যদিকে আমেরিকা। তাদের মধ্যে 'কোল্ড ওয়ার' চলছে। আমরা এই দুটি শক্তিকেন্দ্রের কারও সঙ্গে যুক্ত হব না সিদ্ধান্ত করলাম। নিজস্ব, নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে চলব। কোনও কোনও দেশের আমাদের এই আদর্শ ভাল লাগল। তারা আমাদের সঙ্গে এলেন। এইভাবে নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্টের জন্ম হল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ভারতবর্ষ। অন্যান্য দেশ আমাদের সম্মানের চোখে দেখত। একথা স্বীকার করতে হবে যে আমাদের নীতি কিঞ্চিৎ সোভিয়েট ঘেঁষা ছিল। আমাদের সংকটের মুহূর্তে সোভিয়েট রাশিয়াও আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল জটিল। আমরা তাদের পাকিস্তান প্রীতি সন্দেহের চোখে দেখতাম।

সোভিয়েট রাশিয়া ভেঙে যাবার পর পৃথিবীতে একটিই শক্তির কেন্দ্র রইল। আমেরিকা হয়ে পড়ল একমাত্র সুপার পাওয়ার। ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটা প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। ক্লিনটনের সফর দু'দেশকে বেশ একটু কাছাকাছি এনে দিল। এরপর তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ স্ট্রোব টলবটের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী মন্ত্রণা শুরু করলেন। এদের দু'জনের এই 'হানিমুন'-এর বেশ সুফল হয়েছিল। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রকের পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন থাকার সুবাদে ভারত ও আমেরিকার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

বিদেশমন্ত্রক কমিটিতে কাজ করার সময়ে আমি একজন ব্যতিক্রমী চেয়ারপার্সন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলাম। আমি এমন সব কাজকর্ম করে ফেলতাম যে আমলাতন্ত্র আমাকে নিয়ে ঠিক কী করবে প্রথমদিকে বুঝে উঠতে পারত না। পরে অবশ্য তারা আমার কার্যকলাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল এবং খুব সুষ্ঠভাবে আমাদের কাজকর্ম চলতে লাগল। কমিটির বৈঠকের শুরুতে আমার



হাতে একটি লিখিত স্বাগত ভাষণ ধরিয়ে দেওয়া হত। এরকম শুষ্ক, নীরস স্বাগত ভাষণ দেওয়ার চাইতে না-দেওয়া ভাল। আমি লিখিত ভাষণ সরিয়ে রেখে মন থেকে বলা শুরু করলাম। ব্যাপারটা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত হল।

আমেরিকার সেনেটের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির মতো তো আমরা ক্ষমতাবান নই। তবু আমি চেষ্টা করতাম ভারতের বিদেশনীতির ব্যাপারে আমাদের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন এবং যথাযথ পরামর্শ দেবেন। আফগানিস্থানে যুদ্ধের সময়ে বা ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনের পর আমি কমিটির কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক করতে পেরেছিলাম।

আমি কার্যভার নেবার পরপরই দিল্লিতে আফ্রিকার দেশগুলির যত হাইকমিশনার আছেন তারা সকলে একযোগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। অমনি বিদেশমন্ত্রকের অফিসারদের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সকলে একসঙ্গে আসার দরকার কী! দেখা যদি করতেই হয় একজন দু'জন করে এলেই পারেন। কী মুশকিল! আমি তো দিনক্ষণ ঠিক করে কমিটি রুম বুক করে মিটিং ডেকে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম যে আফ্রিকান হাইকমিশনারদের সঙ্গে আমাদের সদস্যরা একটি খোলামেলা চা-চক্রে মিলিত হবেন। এই টি-পার্টির দোহাই দিয়ে লাল ফিতের ফাঁস কাটানো গেল। যথা সময়ে তারা সকলে এলেন। অনেকের পরনে তাদের জাতীয় পোশাক। মহিলা হাইকমিশনারও ছিলেন, তাদের মাথার টুপিতে, গাউনে আরও উজ্জ্বল রং। আমরা চা, কফি ও স্ন্যাকস খেতে খেতে জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে আলোচনা করলাম। কিছু স্থানীয় সমস্যাও ছিল। ওরা বললেন, কোনও কোনও হাইকমিশনে স্থানের অকুলান হচ্ছে। দিল্লির কেন্দ্রীয় কূটনীতিক আবাসভূমি চাণক্যপুরীতে আর কোনও জায়গা নেই। আর একটি নতুন ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ গড়ে তোলার কথা চলছে। সেনেগালের হাইকমিশনার সেই সময়ে সকলের চেয়ে সিনিয়র। তাই দিল্লির সকল কূটনীতিক সম্প্রদায়ের তিনি 'ডিন' বা প্রধান ছিলেন। তার সঙ্গে ও অন্যান্য আফ্রিকান হাইকমিশনারদের সঙ্গে সেই চা-পার্টির আলোচনার পর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বেশ অনেকদিন পর সেনেগালের হাইকমিশনার আমার পুত্রকে বলেছিলেন— 'তোমার মা-র সঙ্গে প্রথমদিন আলাপ হবার পর আমরা বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল তিনি সাধারণের চাইতে অন্যরকম। নিজেরা বলাবলি করেছিলাম কে এই মহিলা। ইনি এলেন কোথা থেকে!' আমি জানি না ওরা ঠিক কী দেখবেন

প্রত্যাশা করে এসেছিলেন। কেনই বা তাদের মনে বিস্ময় ও সমীহের উদ্রেক হয়েছিল।

এরপর আরবদের পালা। তারাও সদলবলে আসতে চান। আবার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নানা ওজর আপত্তি। দল বেঁধে আসা ওদের পছন্দ নয়। আবার আমি সিরিয়াস মিটিং নয় ইনফরম্যাল চা-পার্টির আশ্রয় নিলাম। ওদের সঙ্গে আলোচনা বেশ সিরিয়াসই হল। সে সময়ে ভারতের বিদেশনীতিতে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছিল। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের একটু আদান-প্রদান চলছে। আরব রাষ্ট্রদূতেরা আমাকে জানালেন তাদের মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে ভারত ইজরায়েলের কাছাকাছি এলে আরব দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের যে সুদীর্ঘ সম্পর্ক তাতে সংকট দেখা দেবে। আমি এবং কমিটির সকল সদস্য তাদের আন্তরিকভাবে আশ্বস্ত করলাম যে ভারত কোনও নতুন বন্ধু করলেও কোনওমতে পুরনো বন্ধুকে পরিত্যাগ করবে না। এই বৈঠকের সময়ে রমজান চলছিল তাই আরব কূটনীতিকরা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। ঠিক হল পরে আর একদিন ভালভাবে চা-বৈঠক করা হবে।

লোকসভার স্পিকার বালযোগীর সঙ্গে একটি ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের ডেলিগেশনে আমি জর্ডান গেলাম। রয়্যাল জর্ডানিয়ান বিমানে আমরা আম্মান পৌঁছলাম। নাজমা হেপতুল্লা সে সময়ে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভানেত্রী ছিলেন। আমাদের ডেলিগেশনে মার্গারেট আলভাও ছিলেন। আম্মানের আলোচনায় আমিও অংশগ্রহণ করলাম। তবে যখন বক্তব্য রাখব তখন আমাদের অফিসিয়াল বক্তব্য রাখতে হত, নিজের মতো বলার সুযোগ হত না। কিন্তু কোনও আলোচনা চলার সময়ে মাঝখানে কোনও প্রশ্ন তোলা যেত। আমার সামনে টেবিলে 'ইন্ডিয়া' লেখা যে কাষ্ঠখণ্ড থাকত সেটি তুলে ধরে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত। এইভাবে বলার সুযোগ পেলে আমি খুশি হতাম। কারণ নিজের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা যায়।

অধিবেশন চলার সময়ে একদিন মার্গারেট ও আমি লক্ষ করলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ মহিলা কমিটিতে একটি সদস্যপদ খালি রয়েছে, এশিয়ার কোনও দেশ থেকে সেই পদে কেউ নির্বাচিত হবেন। সাধারণত এসব ব্যাপার আগে থাকতে পর্দার আড়ালে ঠিক করতে হত। কিন্তু দেখা গেল ভারত থেকে কোনও তৎপরতা দেখানো হয়নি। মার্গারেটের বেশ ইচ্ছা যে এই কমিটিতে



যাবে। আমি বললাম, খুব ভাল প্রস্তাব, চেষ্টা করা যাক। আমি আলাপ-আলোচনায় নেমে পড়লাম এবং নেপাল ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে রাজি করিয়ে ফেললাম। মার্গারেট সেই কমিটিতে নির্বাচিত হয়ে গেল। পরদিন দেখা গেল পশ্চিম এশিয়া শান্তি প্রযুক্তি কমিটিতে আরও একটি পদ এশিয়ার কোনও সদস্য পাবেন। এবার মার্গারেট আমার হয়ে কথাবার্তা বলল এবং অন্য এশীয় দেশ সবাই এই সিটটি ভারতকে দিতে রাজি হল। এমন সময়ে হঠাৎ নাজমা হেপতুল্লার কাছ থেকে বার্তা এল আমরা যেন এই কমিটিতে না যাই। একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। কী ব্যাপার! নাজমা পরে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করল যে ও নিজে পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভানেত্রী। লোকে কী মনে করবে যদি ভারত সব কমিটিতে যায়। মাঝখান থেকে সদস্যপদ খালি রয়ে গেল কারণ সেটা ভারতকে দেওয়া হবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। ডেলিগেশনের অন্য সদস্যরা নাজমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন না। তারা অনেকে মনে করলেন মার্গারেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে ঢুকে যাওয়া নাজমার পছন্দ হয়নি।

আমাদের কনফারেন্সের উদ্‌বোধন করলেন জর্ডানের রাজা আবদুল্লা। ভাল উদ্‌বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। বয়সে তরুণ, চটপটে, কথাবার্তা ভাল বলেন। পিতা রাজা হুসেনের মৃত্যুর পর অল্পদিন হল রাজা হয়েছেন। উদ্‌বোধনের পর তরুণ রাজার সঙ্গে আমাদের ভারতীয় দলের একটি সাক্ষাৎকার হল। সন্ধ্যায় রাজা যে অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন সেখানে তার প্যালেস্টেনিয়ান স্ত্রী রানিয়া উপস্থিত ছিলেন। তার রূপের খ্যাতি শুনেছিলাম, চাক্ষুষ দেখলাম। এই কনফারেন্সের জার্মান দল আমাদের ভারতীয়দের একদিন লাঞ্চ খাওয়ালেন। জার্মান সদস্যদের অনেককে আমি চিনতাম কারণ তারা আগে এবং পরেও অনেকবার আমার কমিটিতে এসেছেন। অনেকে আবার আমার ননদ অনিতার স্বামী মার্টিনকে ভাল চেনেন। মার্টিন তখন জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য। দেখা হল জার্মান মহিলা এম পি অ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে। সেও আমার বন্ধু। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। এমন কী রবীন্দ্রসংগীতও গাইতে পারে।

একদিন সমুদ্রের (ডেড সি) ধারে বেলাভূমিতে আমাদের জন্য রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হল। দেশ-বিদেশের সমাগত অতিথিরা সমুদ্রতটে বিশাল তাঁবুর নীচে মিলিত হলেন। অসংখ্য ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা।

দীর্ঘ টেবিল জুড়ে স্তূপাকৃত খাদ্যদ্রব্য। সবাই খাবার নিয়ে টেবিলে বসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাচ্ছে। আমার টেবিলে অ্যাঞ্জেলিকা ছিল। ডেড সি-র ওপারে জেরুজালেম। সমুদ্রের ওপরে ধীরে সূর্যাস্ত হচ্ছে, আঁধার নেমে আসছে। অ্যাঞ্জেলিকাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কী রবীন্দ্রসংগীত জানো? সে গুনগুন করে গান ধরল, 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে—।' হঠাৎ দুম করে আওয়াজে চমকে উঠলাম। আতসবাজি শুরু হয়েছে। একটা জোর পটকার আওয়াজ হচ্ছে, পিছনের বালির পাহাড় যেন দুলে উঠল। তারপরই ডেড সি-র উপর আকাশে রঙিন আতসবাজির উৎসব। সে যে কী অপূর্ব! ভারতবর্ষ দীপাবলির দেশ থেকে আমি এসেছি। কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইলাম।

আমাদের মধ্যে কারও ইচ্ছা হল জেরুজালেম ঘুরে আসব। আমাদের আম্মান থেকে দুবাই যাবার কথা। আম্মানের ভারতীয় দূতাবাস বললে পাসপোর্টে যদি ইজরায়েলের ছাপ পড়ে যায় তা হলে কিন্তু দুবাইতে প্রবেশ করতে দেবে না। কী করা যায়! রাতারাতি ভারতীয় দূতাবাস বিশেষ পাসপোর্ট করে দিল, ইজরায়েল ছাড়া আর কোথাও চলবে না। গাড়ি করে আমাদের নিয়ে সীমান্তে ছেড়ে দেওয়া হল। নো ম্যানস ল্যান্ডে খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর জেরুজালেমের দিক থেকে আর একটি গাড়ি এসে আমাদের তুলে নিল। জেরুজালেম আমার খুব সুন্দর শহর মনে হল। আর এত সবুজ। মরুভূমির মাঝখানে শহরে পথের দু'ধারে ফুলের বাহার, চারিদিকে সবুজ। জেরুজালেমে 'হলোকস্ট মিউজিয়াম' দেখা হল। তারপর চলে গেলাম 'ওয়েইলিং ওয়াল'-এ, কী বলব আর্তির প্রাচীর। যাহোক, সেই প্রাচীরে দাঁড়িয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও প্রার্থনা করলাম। প্রাচীরের ওপাশেই সোনালি গম্বুজ গোল্ডেন মসজিদ। এবার হেঁটে আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে চলেছি। এ পথে যিশু গিয়েছিলেন ক্রস কাঁধে নিয়ে। পাহাড়ের ওপর গির্জা। আমাদের দেখানো হল কোথায় তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, কোথায় তার দেহ নামানো হয়েছিল। আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে ফিরবার পথে দু'পাশের দোকানে দাঁড়ালাম। একটি দোকান থেকে ছোট কাঠের ক্রস কিনলাম। আমার ঠাকুরের আসনে কালী ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেটিকে রাখা আছে। এরপর গাড়ি করে আমরা বেথলেহেম চলে গেলাম। যিশুর জন্মস্থান দেখা হল। জেরুজালেম, বেথলেহেম আপাতভাবে এমন শান্ত যে তার চারপাশে যে ঘোর অশান্তি



চলেছে তা মনে হয় না। আম্মানের সম্মেলনে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। ভারতের তরফে সন্ত্রাসবাদকে প্রধান আলোচ্য করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ দেশ উদ্বাস্তু নিয়ে আলোচনা চাইছিল। আমি তো সম্মেলনের কাজের ফাঁকে জাবাল-এর উদ্বাস্তু শিবিরের ওপর একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম। গাড়িতে করে উদ্বাস্তু পল্লির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মানুষজনের উদাস দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আমরা তাদের নিয়ে আলোচনা করছি তাতে তাদের কী-ই বা যায় আসে।

জেরুজালেম থেকে ফিরে এসে আম্মানে আমার আর একটা কাজ বাকি ছিল। শায়েস্তা সুরাবর্দির কন্যা সার্ভাথ এল হাসান-এর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। জর্ডানের রাজা হুসেনের ছোট ভাই হলেন হাসান। প্রয়াত রাজার অসুস্থতার সময়ে অনেকে ভেবেছিল তিনি হাসানকে রাজা মনোনীত করে যাবেন। হাসান তার বিশ্বস্ত এবং রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ। কিন্তু মৃত্যুর আগে রাজা তার পুত্র আবদুল্লাকে মনোনীত করে যান। যদিও হাসান যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত এই জমানায় রয়েছেন। তারই পত্নী সার্ভাথ এল হাসান। ইনি পাকিস্তানের মেয়ে। করাচিতে ও পরে লন্ডনে সুরাবর্দির ভগিনী শায়েস্তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। করাচিতে আমাকে ও শিশিরকে দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা। একটি হিউম্যান রাইটস কনফারেন্সে দেখা। জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুরাবর্দির ছবি সাজানো। তাদের কলকাতার বাড়ির সামনের ছবি। কলকাতার সব খবর বারবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি একবার ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারত ও পাকিস্তানে এত দারিদ্র, এত শিক্ষার অভাব, এত দুঃখকষ্ট কেন? উনি জবাবে একটা শায়েরি শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন যারা স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব দিয়েছিল তাদের হাতে ক্ষমতা এল না। "মনজিল উনকো মিলে যো শরিকে সফর না থে।" তারা জিতল যারা এই দৌড়ে শামিলই ছিল না। কলকাতায় ওর অনেক সুখস্মৃতি আছে তবু উনি আর ফিরতে চাননি। বললেন, 'তোমাদের দেখে আমার আর একবার কলকাতা যাওয়ার বাসনা হচ্ছে।' আমরা ওকে আনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য আসা হয়ে ওঠেনি। উনি প্রায়ই বলতেন যদি কখনও আম্মান যাও আমার মেয়ে সার্ভাথের সঙ্গে দেখা কোরো। আম্মানের রাজপ্রাসাদে প্রিন্সেস সার্ভাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। আমার সঙ্গে এলেন জর্ডানে

ভারতের রাষ্ট্রদূত। সার্ভাথের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে আলাপ হল, তার মায়ের কথা তো হলই।

দেশে ফিরে এসে দেখি শিশিরকুমার দিল্লিতে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আম্মান সফর আমার খুব ভাল লেগেছিল। অমনি উত্তেজিত হয়ে সব গল্প ওকে বলতে লাগলাম। মাত্র কয়েকদিন কাটাতে এসেছেন, তার মধ্যে সব বলতে হবে। আম্মান থেকে আমরা একদিন শহরের বাইরে পুরনো রোমান শহর জারোশ গিয়েছিলাম। চারিদিকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। সেই স্থাপত্যের মধ্যে বসে The Ruins of Jarosh নামে একটা কবিতাই লিখে ফেলেছিলাম। সেটাও ওকে ধরে পড়ে শোনালাম। কিন্তু একা ওকে বললে চলবে না, প্রবাসী ছেলেমেয়েদের আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে দীর্ঘ টেলিফোন করতে লাগলাম।

আমার বরাবরের অভ্যাস যা কিছু চারপাশে ঘটে, মহৎ হোক, ক্ষুদ্র হোক, যতক্ষণ না শিশির ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারছি শান্তি নেই। আমার তিন ছেলেমেয়েই অল্প বয়সে বিদেশে পড়তে চলে যায়। যখন সুগত কেমব্রিজ ইংল্যান্ডে আর শর্মিলা ব্রিনমোর কলেজ আমেরিকাতে আমি প্রতি সপ্তাহে দুটি করে দীর্ঘ চিঠি লিখতাম। এখন ভাবি কী করে পারতাম! সেইসব চিঠিতে দেশের রাজনীতির কথা যেমন থাকত, তেমনি থাকত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও তারা যেন আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না বোধ করে। বলতে হবে তাদের দিক থেকেও নিয়মিত সাড়া পাওয়া যেত। কনিষ্ঠ পুত্র সুমন্ত্র যখন বিদেশে গেল ততদিনে টেলিফোন যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে আর চল হয়েছে ই-মেল। এককালে পত্রসাহিত্য রচিত হত, ই-মেল কি তার বিকল্প হতে পারে! অবশ্য আমরা মাঝে মাঝে নিজেরা বলাবলি করতাম আজকাল তো গবেষকরা চিঠিপত্রের উপর রিসার্চ করেন। কিন্তু আমার চিঠিপত্রর পাঠ উদ্ধার করা বেশ কঠিন হবে। এমন সব বাক্যবন্ধ আছে যা নিতান্ত পারিবারিক। বাইরের লোকের বোধগম্য হবে না। "কাগেয়া পটিতে ঢিল পড়েছে, কাকেরা কা কা করছে" অথবা "হারাধনের হারিয়ে যাওয়া ছেলেরা বাঘের পেট থেকে বেরিয়ে পড়েছে" এসব ধাঁধার কে সমাধান করবে। যা হোক, আমার আম্মান কাহিনি টেলিফোন যোগে বলার সূত্রে এসব কথা মনে পড়ল।

কলকাতা ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে দিল্লিতে ডাক পড়ল। রাষ্ট্রসংঘে



মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে জুন ২০০০ সালে অধিবেশন বসছে তাতে যোগ দিতে হবে। বেজিং-এ ১৯৯৫-তে যে মেয়েদের এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে সম্মেলন হয়েছিল তারপর কতখানি অগ্রসর হওয়া গিয়েছে তাই হল আলোচ্য।

ভারতীয় পার্লামেন্টে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে আমি আমার লোকসভার সাংসদ পদে নির্বাচিত হবার পর থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি। ত্রয়োদশ লোকসভাতেও আমি এ ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলাম। ১৯৯৬-তে প্রথমবার নির্বাচিত হবার পর মহিলা সংরক্ষণ বিলের স্বপক্ষে বক্তব্য ছিল আমার প্রথম জিরো আওয়ার। কিন্তু খুব শিগগিরই আমি বুঝে যাই মহিলা সংরক্ষণ বিল এই আকারে কোনওদিনই লোকসভায় পাশ করানো যাবে না। আমি বিকল্প খুঁজতে থাকি। ১৯৯৮ সাল থেকেই আমি বিভিন্ন কাগজপত্রে আমার বিকল্প প্রস্তাব পেশ করি। আমি দেখলাম একটা বেশ সহজ উপায় আছে যাতে দ্রুত অনেক মহিলাকে সংসদে এবং বিধানসভাতে নিয়ে আসা যায়। আমাদের যে Representation of People Act বা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন আছে তাতে দু' লাইনের একটি সংশোধনী পাশ করলেই চলবে। পাশ করানো খুব সহজ কারণ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেই হবে। মহিলা সংরক্ষণ বিল সংবিধান সংশোধনী তার জন্য দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিতি প্রয়োজন। আমি বলেছিলাম রাজনৈতিক দলগুলি যখন প্রার্থী বাছাই করবেন তখনই তাদের দেখতে হবে লোকসভা ও বিধানসভায় যেন উপযুক্ত সংখ্যায় মহিলা প্রার্থী দেওয়া হয়। আমি পরবর্তী সময়ে যে প্রাইভেট মেম্বার বিল এনেছিলাম তাতে বলেছিলাম পুরুষ বা নারী কেউ যেন চল্লিশ শতাংশের নীচে না হন। জনপ্রতিনিধিত্ব বিল সংশোধনী পাশ হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিপক্ষে বলার মতো বেশ কিছু যুক্তি ছিল। এক, এতে মহিলাদের একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সর্বদাই মেয়েদের আর একজন মেয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। কোটা প্রথার মধ্য দিয়ে না গিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করে তারা সংসদে বা বিধানসভায় আসবেন এটা অনেক বেশি সম্মানের। দুই, সংরক্ষণ বিলে যে রোটেশন বা নিয়মিত সংরক্ষিত সিট বদল হবার কথা আছে তাতে অনেকের আপত্তি। অর্থাৎ এবার যে সিট মেয়েদের

জন্য সংরক্ষিত পরের নির্বাচনে সেটি মুক্ত অর্থাৎ ছেলেদের বা সকলের হয়ে যাবে। নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি বা এলাকার সঙ্গে সাংসদদের একটা বন্ধন গড়ে ওঠে, সেটা ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আমার বিকল্প প্রস্তাবে রোটেশন-এর হাত থেকে মুক্তি। তিন, কোনও কোনও রাজনৈতিক দল যেমন মুলায়েম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি আবার সংরক্ষণের মধ্যে সংরক্ষণ দাবি করছিলেন। অর্থাৎ দলিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের মধ্যে কয়েক শতাংশ সংরক্ষণ চাই। তাদের ভয় হল সব সিট শিক্ষিত, আধুনিক বা উচ্চবর্ণের মহিলারা দখল করবেন। আমি মুলায়েম সিংকে বলেছিলাম আমার প্রস্তাবে কে প্রার্থী হবে তা রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা। আপনি তো আপনার দেয় চল্লিশ শতাংশই দলিত ও পিছিয়ে-পড়া মহিলাদের দিতে পারেন। উনি বললেন, ম্যায় আপকো সাথ সহমত হুঁ, লেকিন আপ বহুত জাদা চাহতে। আমার চল্লিশ শতাংশে ওর ঘোর আপত্তি। জনতা দলের একজন প্রবীণ সদস্য বলে ফেলেছিলেন ছোট চুল অর্থাৎ 'বব-কাটি' মহিলা তার না-পসন্দ। আমি বললাম তিনি তার সকল সিটই তো দীর্ঘ কেশ মহিলাদের দিতে পারেন।

এ বিষয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় আমার একটি লেখা অনেকের নজরে পড়েছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়া থেকেও আমার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাংবাদিক করণ থাপার আমাকে আম্মানে ফোন করে ধরেন। আম্মান থেকে ফিরে আসামাত্র আমার ও মার্গারেটের সঙ্গে করণ থাপারের একটি টিভি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল। এদিকে রাজদীপ সরদেশাই আমাকে তখনকার স্টার টিভির নিউজ আওয়ারে বলতে ডাকলেন। সনিয়া ভার্মা ও রাজদীপ আমাকে ১৯৯৯-এর ২০ ডিসেম্বর ইন্টারভিউ করেন। সেদিন আমি অপ্রত্যাশিতভাবে একজন বিশিষ্ট সমর্থক পেয়ে যাই। নির্বাচন কমিশনার এম এস গিল এই ইন্টারভিউটি দেখে টিভি চ্যানেলে ফোন করেন। ওরা পরদিন নিউজ আওয়ারে নির্বাচন কমিশনার গিলকে আহ্বান করলে তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করেন। পরদিন ২২ ডিসেম্বর আবার আমি ব্রেকফাস্ট নিউজে আমার বক্তব্য রাখতে ডাক পেলাম। সংবাদ জগতের প্রতিনিধিদের অনেকে এবং বুদ্ধিজীবী মহলেরও একাংশ আমাকে বেশ জোরালোভাবে সমর্থন করেন। নির্বাচন কমিশনার আমাকে ডেকে পাঠালে তার সঙ্গেও দীর্ঘ আলোচনা হয়। নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দলকে ডেকে পাঠিয়ে একটি বৈঠক করেন। দুর্ভাগ্যবশত আমার নিজের দলসহ অন্য দলও



বেশিরভাগ সম্মত হলেন না। শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিনে নমঃ নমঃ করে সংরক্ষণ বিলটি একবার পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বাম দলগুলি ত্রিশ শতাংশ সংরক্ষণ বিল পাশ করতেই হবে বলে জেদ ধরে বসে রইলেন। নির্বাচন কমিশনার গিল আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন— আমরা হলাম একটি দুই সদস্যবিশিষ্ট পার্টি। নেতারা আমাদের কথা শুনলে এতদিনে কত মহিলা এক ধাক্কায় সংসদ ও বিধানসভা ভরিয়ে ফেলতেন।

শেষপর্যন্ত ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি আমার প্রাইভেট মেম্বার বিলটি পার্লামেন্টে পেশ করি। ধ্বনি ভোটে সেটি পেশ হয়ে যায়। জনপ্রতিনিধি আইন সংশোধন বিল, নম্বর ৬২, ২০০০ সাল নামে এর পরিচয়। RP Act -এর সেকশন ২৯ এ-তে আমি সাবসেকশন ৫এ যোগ করি। তাতে বলি সব রাজনৈতিক দলকে দেখতে হবে যে তাদের নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষ অথবা নারী কেউ চল্লিশ শতাংশের নীচে হবেন না। ধারা ২৯এ-র পরে আমি ধারা ২৯ বি যোগ করি যদি কোনও পার্টি ২৯এ-র সাব-সেকশন ৫ অমান্য করেন তবে সেই দলের রেজিস্ট্রেশন নির্বাচন কমিশন খারিজ করে দেবেন। অন্য অনেকে অনেকরকম বিকল্পর কথা বলেছিলেন। শিবরাজ পাতিল আসন সংখ্যা বাড়াবার কথা বলেন, সেই আসনে মহিলারা আসবেন। বেশিরভাগ প্রস্তাবই খুব অবাস্তব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার প্রস্তাবটি সবচাইতে বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য। ভবিষ্যতের কোনও পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবই গৃহীত হবে।

রাষ্ট্রসংঘের মহিলা অধিবেশনে যোগ দেবার দিন দেখতে দেখতে এসে পড়ল। আমি সে সময়ে বিদেশমন্ত্রক কমিটির কাজে খুবই জড়িত ছিলাম। সেই সঙ্গে উইমেনস এমপাওয়ারমেন্ট কমিটির সঙ্গেও যুক্ত। তাই দু'দিক মিলে আমার এই রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে যোগদান খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। আমরা ঠিক করলাম আমি যখন নিউইয়র্কে কাজে ব্যস্ত থাকব শিশিরকুমার তখন লন্ডনে সুমন্ত্রর সঙ্গে দিন কাটাবেন। স্বাস্থ্যের কারণে ওর পক্ষে দীর্ঘ বিমানযাত্রার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমাদের পারিবারিক ক্যালেনডারের বিশেষ দিনটি এসে পড়েছে, ২ জুন টিপুর জন্মদিন। সে তখন লন্ডনে। সুগত বস্টন থেকে উড়ে এল জন্মদিনে যোগ দিতে। বেশ ধুমধাম করে শিশিরের উপস্থিতিতে তার জন্মদিন পালিত হল। আমি অবশ্য রইলাম সুদূর নিউইয়র্কে।

আমরা একদল ভারতের পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য কলকোলাহল করতে করতে নিউইয়র্ক রওনা হয়েছিলাম। পথে প্যারিসে থামা হল। অনেক সদস্য আগে প্যারিস আসেননি, শহর দেখতে বেরনো হল। আমি আগে প্যারিস এসেছি তবুও হইচই করতে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গী বিহারের এক সদস্যা কখনও এসকালেটর চড়েনি। একদিন বোধহয় কোনও রেস্তোরাঁতে এসকালেটর থেকে নেমে দেখি সে সিঁড়ির মাথায় কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে। এক সুপুরুষ ফরাসি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে এসকালেটারে নামিয়ে আনলেন। অমনি বাকি সদস্যরা তার পিছনে লাগলেন— দাঁড়াও এখনই তোমার স্বামীকে খবর দিচ্ছি, প্যারিসে এসে ফরাসি যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব! সে অবশ্য খুব শিগগির এসকালেটর-এ চড়া রপ্ত করে ফেলল। প্যারিসে আমাদের রাষ্ট্রদূত কানওয়াল সিবাল আমাদের জন্য অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই আমার কানওয়াল সিবালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পরে অবশ্য উনি যখন বিদেশ সচিব পদে এলেন তখন একসঙ্গে কাজ করেছি।

নিউইয়র্কের ইউ এন প্লাজা হোটেল— যা মিলেনিয়াম হোটেল নামেও পরিচিত— পৌঁছে সবে সুটকেস থেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছি দরজায় কে নক করল। খুলে দেখি কমলেশ শর্মা, ইউ এন-এ আমাদের প্রতিনিধি, পার্মানেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ। তিনি প্রথা মতো 'কল অন' করতে অর্থাৎ সৌজন্য সাক্ষাৎকার করতে এসেছেন। তার সঙ্গে আগামী অধিবেশন নিয়ে কথাবার্তা হল। লন্ডন ফেরত সুগত সেখানে উইক এন্ড কাটাতে উপস্থিত। সকলে মিলে খানিক গল্প হল। ইউ এন-এর অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গেও এই সফরে আলাপ হল। বিশেষ করে মনে পড়ছে সতীশ মেটা ও তার স্ত্রী প্রীতির কথা। আর একজনের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হল তিনি সত্য পাল, অত্যন্ত দক্ষ কূটনীতিক। ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ নিউইয়র্কের ফর্টি ফোর্থ স্ট্রিটের ওপর। রাষ্ট্রসংঘের দিকে হেঁটে চলেছি, একজন এগিয়ে এসে বাংলায় কথা বললেন। পারিবারিক পরিচয়ে সত্য পাল জাস্টিস রাধাবিনোদ পালের নাতি।

আমাদের মহিলা ডেলিগেশনে অনেকে ছিলেন— নাজমা হেপতুল্লা, মায়াবতী, সুমিত্রা মহাজন, মার্গারেট আলভা, গিরিজা ব্যাস, ভাবনা চিকলিয়া, আভা মাহাতো, ভারতী রায়, শারদা, প্রফুল্ল মোহন্তর স্ত্রী জয়শ্রী মোহন্ত। কিন্তু সকল সদস্যর মধ্যে সবচাইতে সাড়া পড়ে গেল ফুলনদেবীকে নিয়ে। ডাকাতরানি ফুলনদেবী এসেছে শুনে নিউইয়র্কের সংবাদ জগতে প্রচুর



কৌতূহল। অনেকে ফুলনদেবীর জীবন নিয়ে তৈরি ফিল্মটি দেখেছেন। একটি গরিব দলিত ঘরের মেয়ে তার জীবনে অপমানের বদলা নিয়েছিল ডাকাত দলের রানি হয়ে আর উচ্চবর্ণের পুরুষ মানুষের প্রাণ নিয়ে। অনেকদিন জেল খাটার পর ফুলন পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে আসে। সে লিখতে পড়তে জানে না। পার্লামেন্টে শপথ নেবার সময়ে পাশে দাঁড়ানো অফিসার শপথ বাক্য পাঠ করে দিচ্ছিলেন। প্রথমদিন সে হিন্দিতে বক্তৃতা দেবার পর আমি তার কাছে উঠে গিয়ে বললাম, খুব ভাল বলেছ। সে লাজুক হেসে বলেছিল, 'বহুৎ ডর লাগতা থা।' যে ডাকাত রানির ভয়ে সবাই কাঁপত বক্তৃতা করতে তার 'ডর' লেগেছিল জেনে কৌতুক বোধ করলাম।

রাষ্ট্রসংঘে মহিলাদের সমস্যা নিয়ে সাতকাহন আলোচনা হল। একদিন রাষ্ট্রসংঘের কফি-কর্নারে বসে আমরা কয়েকজন আলাপ আলোচনা করছি কে যেন বলল, ফুলন, তুমি কিছু বলছ না কেন? তোমার কী মত? ফুলন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল— এসব বড় বড় কথা এখানে আলোচনা করে কী লাভ। দেশে মেয়েদের অবস্থা তো আমি জানি। মুখ বুজে মার খেতে হয়। সে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল— 'পিটাই করতা, পিটাই করতা।' সবাই চুপ। আমরা এতক্ষণ ভদ্র ভাষায় যাকে বলে 'ক্লিশে' বলছিলাম। ফুলন হঠাৎ কঠিন সত্য উদ্‌ঘাটন করে দিল। কিছুকাল পরে পার্লামেন্টের অদূরে সে যখন নিজের বাড়ির দরজার কাছে খুন হয়ে গেল খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম।

রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে আমি লন্ডনে চলে এলাম। মিলেনিয়াম হোটেলের ঘরটি আমার খুব পছন্দ ছিল। দু'দিকে বড় বড় কাচের জানলা। একদিকে ইস্ট রিভারের উপর লম্বা লম্বা সেতু অন্য জানলা দিয়ে দূরে দেখা যায় টুইন টাওয়ার। ঐতিহাসিক ৯/১১-র পর মাঝে মাঝে আমার সেই জানলার স্মৃতি মনে পড়ত। সারাদিন রাষ্ট্রসংঘে কাজে ও অকাজে কাটাবার পর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখতাম টেলিফোনে লাল আলো দপ দপ করছে অর্থাৎ মেসেজ আছে। লন্ডন থেকে শিশির ও সুমন্ত্র, বস্টন থেকে সুগত, নিউইয়র্ক থেকে লেনি গর্ডন বা অমিতাভ ঘোষ। একদিন অমিতাভের ব্রুকলিনের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম।

লন্ডনে সুমন্ত্রর বাড়ির বসবার ঘরটি খোলামেলা। আবহাওয়া ভাল থাকলে ঘরে রোদ্দুর এসে লুটিয়ে পড়ে। একদিকের একটি আলমারি ভরতি ইংরেজি

সাহিত্যের বই, নাটক, কবিতা। হঠাৎ আমার নস্টালজিয়া হল। আমার নিজের বিষয় ইংরেজি সাহিত্য থেকে গত কয়েক বছরে রাজনীতি আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যে ক'দিন ছিলাম অনেক বইয়ের পাতা ওলটালাম। অনেকদিন পর ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'ইমমর্টেলিটি ওড' পড়ে মনে একধরনের তৃপ্তি এল—

Our birth is but a sleep and a forgetting
The Soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting...

প্রথমদিন ঘরে ঢুকেই বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছি এমন সময়ে হাসিমুখে দু' কাপ চা হাতে রান্নাঘর থেকে শিশিরকুমারের আবির্ভাব। আমি বিস্ময়ে হতবাক। 'তুমি আবার রান্নাঘরে চা তৈরি করা শুরু করলে কবে থেকে?' এই ভূমিকায় সংসারজীবনের প্রথম দিকে আমাদের বস্টন শহরের গৃহে ওকে মাঝে মধ্যে দেখা যেত। লন্ডনে কয়েকদিন বড় আনন্দে কাটল। সুগত আমেরিকা থেকে এসে পড়ল ও আমাদের দু'জনকে নিয়ে দেশের পথে রওনা হয়ে পড়ল। বিমানে বসুন্ধরা রাজের সঙ্গে দেখা। আরও রয়েছেন অমর্ত্য সেনের মা শ্রদ্ধেয়া অমিতাদি, নন্দনাও ছিল।

বিদেশ থেকে ফিরেই দু'জনে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শিশিরের নেতাজি ভবনের ও ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এর কাজ সঙ্গে একটু সীমাবদ্ধভাবে রুগি দেখা। আমার রোজই যাদবপুর, বেহালা, কবিতীর্থ বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিতে ছুটোছুটি। এরই মধ্যে Monsoon Session, বর্ষাকালীন অধিবেশনের সময় হয়ে আসছে। বাড়িতে চাঁদের হাট, আমার তিন বালক দৌহিত্র কলকাতায় আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি যে আমাদের অনাবিল আনন্দের দিন শেষ হয়ে আসছে। শতাব্দীর সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে আমার ব্যক্তি জীবনেও আঁধার নেমে আসছে।

জুলাই-আগস্ট মাস বর্ষাকালীন অধিবেশন চলার সময়ে শিশিরকুমার মাঝে মাঝেই দিল্লিতে আমার সঙ্গে কাটালেন। পার্লামেন্ট থেকে ফিরে দিল্লির বাড়ির পুবের বারান্দায় বেতের চেয়ার টেবিল পেতে চা খেতে খেতে গল্প হত। সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলে পাশের ঝাঁকড়া মতো গাছে পাখিরা নীড়ে ফিরে এসে এমন কিচিরমিচির শুরু করত যে আর কথা বলা যেত না।



সেই আগস্ট মাসে দিল্লির বাড়িতে শিশিরকুমার এমন দু'-একটি মন্তব্য করেছিলেন যা এখন পিছন ফিরে দেখলে অর্থবহ মনে হয়। তখন কিন্তু বুঝতে পারিনি। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী করবে?' তার মানে! আমি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম। খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি শুধু তোমার জন্য বেঁচে আছি।' কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারলাম। ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি কী করব সেকথা ভেবে উনি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছেন না। আমার চোখে জল এসে গেল। সামলে নিলাম, বিচলিত হলে চলবে না। বললাম, 'সেই পৃথিবী কেমন হবে আমি ধারণা করতে পারছি না তাই তোমাকে বলতে পারব না।' তারপর আবহাওয়া একটু লঘু করে দেবার জন্য মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি সতী হব।' চিতায় ঝাঁপ দেবার কথা ভাবিনি মনে করেছিলাম, খুব দেরি হবে না। পিছন পিছন পৌঁছে যাব। সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি।

শিশিরকুমারের জীবনে অবশ্য কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তার রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি এবং সেই মহৎ জীবনের কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করে যাবার দায়। সেই কাজে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং যথেষ্ট কৃতকার্য হয়েছিলেন। এর জন্য মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা যেমন পেয়েছিলেন তেমনি কোথাও থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত ও লাঞ্ছনাও জুটেছিল। সেই কথা প্রসঙ্গে আমি একদিন বলেছিলাম যদি তিনি এই কাজে জড়িয়ে না পড়তেন জীবন হয়তো আর একটু শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ হত। উনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, আবার যদি জন্মগ্রহণ করি আবার এই কাজই করব।

সে বছর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস আমরা কলকাতায় কাটালাম। এর আগের কয়েক বছর দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুষ্ঠানে গিয়েছি। এবার কলকাতার রাজভবন। অনেকদিন পর বেশ কিছু পরিচিত বন্ধু, চেনা-জানা মানুষের সঙ্গে দেখা হল। সকলেই মন্তব্য করতে লাগলেন শিশিরকে চমৎকার ও তরুণ চেহারা দেখাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে এসে আমি হঠাৎ বললাম, দাঁড়াও পাঞ্জাবিটা খুলো না একটি ছবি তুলে রাখি। সোফায় দু'জনে পাশাপাশি বসেছি, অমনি তিন দৌহিত্র ছুটে এসে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই তিন বালক পরিবেষ্টিত আমরা দু'জন ফ্রেমে বন্দি হয়ে গেলাম।

সেপ্টেম্বর মাস এসে পড়ল। পুজো সেবার খুব তাড়াতাড়ি, অক্টোবরের

গোড়ায়। পুজোর সময়ে লোকজনদের দেবার জন্য কিছু কেনাকাটা করতেই হয়। শিশিরকুমার সংসারবিষয়ে উদাসীন। এ কাজ আমিই করে থাকি। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সঙ্গে একটু যাবে? তোমার খুব শার্ট কেনা দরকার। সঙ্গে এলে ভাল হয়। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর দোকানে ঢুকে একটি সাদা ও একটি হালকা হলুদ শার্ট নিলাম। দোকান থেকে বের হয়ে উনি বললেন, তোমার জন্য একটা শাড়ি নেওয়া যাক। আমি ভয়ানক বিস্মিত হলাম। উনি নিজে থেকে মনে করে বিশেষ কোনও উপলক্ষে আমার জন্য কিছু কিনবেন এরকম কখনও ঘটেনি। মানুষ হিসেবে উনি অন্যরকম, সংসার বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। আমি তাইতে অভ্যস্ত এবং সুখী ছিলাম। অবশ্য আমি নিজে যদি দোকানসুদ্ধ কিনে আনি তাতেও ওর আপত্তি ছিল না। আমি মাঝে মাঝে জোর করে ওকে শাড়ির দোকানে নিয়ে গিয়েছি সে আমার কন্যার জন্য। কন্যা বিদেশে পড়ত আমরা তার বিরহে কাতর থাকতাম। সে কলকাতায় উপস্থিত নেই তবু জন্মদিনে হোক বা পয়লা বৈশাখে তার জন্য নতুন শাড়ি কিনে রাখতাম। তারপর কে আমেরিকা যাচ্ছে খুঁজে পেতে তার হাতে দেওয়া, নয়তো তুলে রাখা, ছুটিতে এলে পরবে। এবারের ব্যাপার বিচিত্র ও স্বতন্ত্র। উনি ডানদিকে একটা দোকানে ঢুকে পড়লেন, বাঁদিকের দোকানটা আমার চিরদিনের পরিচিত। সেদিকে গেলেন না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটি শাড়ি নিজে পছন্দ করে তুলে নিলেন। তখন বুঝতে পারিনি ওটা আমাকে ওঁর শেষ উপহার। না, শেষ উপহার বলা যাবে না। উনি চলে যাবার কয়েকদিন পর ভবানীপুর আর্ট ফ্রেমিং থেকে একটি প্যাকেট এল। আমার বাঁধানো ছবি, বিদেশে কোন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছি। আর্ট ফ্রেমিং জানাচ্ছে দিন কয়েক আগে ডা. বসু এটি বাঁধাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। ছবিতে আমার সামনে 'India' লেখা ফলক রয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহটি আমার মনে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে সব দৃশ্য তালগোল পাকিয়ে সালভাডোর ডালির আঁকা ছবি হয়ে যাচ্ছে। দিল্লি থেকে খবর এল রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে হবে তার জন্য এখুনি যেন দিল্লি চলে আসি। তারপরই খবর এল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন দিল্লি আসছেন তার জন্য প্রথমে দিল্লিতে আসতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে অক্টোবরে যোগ দিতে হবে। পরের সপ্তাহে দিল্লিতে আমার কমিটির একটি বৈঠক ডেকেছিলাম। এই বৈঠক যথাসময়ে



আমার অনুপস্থিতিতে হয়েছিল। তবে অন্য কাজ হয়নি শিশিরকুমারের স্মরণ সভায় পরিণত হয়েছিল। অনেক সদস্যরা ওর সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। বিশেষ করে বিদেশ সচিব ললিত মান সিং সুন্দর স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তিনি যখন কাবুলে বিদেশমন্ত্রকের তরুণ অফিসার তখন তিনি সুভাষচন্দ্র যে সরাইতে ছিলেন সেটি দেখতে যান। দেখে এসে উনি শিশিরকুমার বসুকে কলকাতায় চিঠি লেখেন। সেই তার ডা. শিশির বসুর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত।

সেই নির্মম সপ্তাহের কোনও এক রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি শিশিরকুমার বিছানায় নেই। কোথায় আর যাবেন! আমার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে টিপু। ওপাশে শূন্য। খানিকবাদে চোখ খুলে দেখলাম তখনও নেই। পাখা ঘুরছে, টিপুর গায়ে চাদরটা টেনে দিয়ে আবার চোখ বুজলাম। কতক্ষণ পরে জানি না চেয়ে দেখি খাটের একপাশে বসে আছেন, হাতে এক গ্লাস কোকোকোলা। চমকে উঠে বসলাম। কাছে গিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, শরীর খারাপ লাগছে? আমাকে ডাকলে না কেন? একা বাথরুমে গেলে? উনি বললেন শরীর তো খারাপ লাগেনি। ভালই ছিলাম। বাথরুমে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কোনওমতে হাত ধোবার বেসিন ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মৃদু গলায় বললেন— আমি ভয় পেয়েছিলাম। এই বাক্যটি আমি জীবনে কখনও ওঁর মুখে শুনিনি। সে রাত্রে মৃত্যু যে আমার গৃহে ড্রেস রিহার্সাল দিয়েছিল তা উপলব্ধি করিনি।

পরদিন সকালে হাসপাতালে কাজে চলে গেলেন। বেশ ভাল আছি বললেন। পরে শুনেছিলাম ডাক্তারদের সঙ্গে অনেক গল্প করেছেন। রাতে শরীর খারাপ হয়েছিল বলেছেন। সকলের সঙ্গে আনন্দ করে আইসক্রিম খেয়েছেন।

শুক্রবার দিনও স্বাভাবিক ভাবে কাটল। শর্মিলাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ফলে লাঞ্চ খেতে বেশ দেরি হয়ে গেল। সন্ধ্যায় বেঙ্গল ক্লাবে আমাদের একটা বড় ডিনারে নেমন্তন্ন ছিল। ক্লাবের তখনকার প্রেসিডেন্ট হেমেন বড়ুয়ার নিমন্ত্রণ। কালো সুটের সঙ্গে নতুন কেনা সাদা শার্ট পরলেন সঙ্গে সুগতর দেওয়া একটা নতুন টাই। অসম্ভব উজ্জ্বল ও তারুণ্যে ভরা চেহারা। অনেকে তাই নিয়ে মন্তব্য করলেন। আমারও মনে হল যেন পঞ্চাশের দশকের চেহারা ফিরে এসেছে। একেই কি বলে নিভে যাবার আগে প্রদীপ জ্বলে ওঠা?

সেপ্টেম্বরের ত্রিশ তারিখে শনিবারের সকাল যে-কোনও দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। পরিবারের সকলে যে যার কাজে আছি। সুগত অবশ্য বিদেশে। আগস্ট মাসে সে দিল্লিতে বাবার কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। মাঝরাত্রে বিমানযাত্রা, দরজায় দাঁড়িয়ে সুগতর পিঠে হাত রেখে গুডবাই বলেছিলেন। হাসপাতালের কাজ সেরে শিশিরকুমার নেতাজি ভবনে এলেন। সেদিন ভবনের একজন কর্মী ওঁর সঙ্গে দুর্বিনীত ভাবে কথা বলেছিল। উনি বিরক্ত ও দুঃখিত হয়েছিলেন। ওর দরিদ্র অবস্থার কথা শুনে সহানুভূতি হওয়াতে উনি লোকটিকে চাকরিতে বহাল করেছিলেন। পরবর্তীকালে কাজে অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে চাননি। ভবনের অন্য কর্মীরা বলেন উনি সেদিন আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করেছিলেন। চিরদিন একটু দূরের মানুষ ডাক্তার সাহেবকে ওরা সমীহ করতেন। কিন্তু সেদিন যেন বন্ধুর মতো গল্প করলেন। পুরনো দিনের কর্মী নগসুন্দরম, মানসিং এদের কথা, নেতাজি ভবনের নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে এদের অটুট আনুগত্যর কথা। জরুরি চিঠিপত্র দেখলেন, অনেক কাগজপত্রে সই করলেন। সুমন্ত্র ও টিপু ওকে আনতে গেল তখনও কাজ করে চলেছেন। টিপু ওর টেবিলের একধারে চেয়ারে বসে রইল অনেকক্ষণ। শেষ কাগজটি সই করে উনি উঠে দাঁড়ালেন। বহুদিন আগে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র শিশিরকে ডেকে বলেছিলেন—আমার একটা কাজ করতে পারবে? জীবনের শেষদিন ২০০০ সালের ত্রিশ সেপ্টেম্বর অবধি সেই কাজ তিনি করে গেছেন।

সেদিন বিকেলে বসুন্ধরা গৃহের দোতলার ছোট বারান্দায় দাড়িয়ে আমি আর শিশির হাত নাড়ছিলাম। কন্যা শর্মিলা তার ছোট ছোট তিন পুত্র নিয়ে মুম্বাই যাবার জন্য বিমানবন্দরে রওনা হয়ে গেল। সুমন্ত্র তাকে ছাড়তে গেল। বারান্দা থেকে বসবার ঘরে ঢুকে আমরা পাশাপাশি সোফায় বসেছিলাম। শিশিরকুমার বললেন, 'চলো আমরা দু'জনে একটা উইক এন্ড টলি ক্লাবে কাটিয়ে আসি। আমারও রুগি দেখার হাত থেকে অব্যাহতি হয় আর তোমারও এলাকার লোকজনের সমস্যা, দলীয় কর্মীদের নানান দাবি ও আবদার থেকে একটু ছুটি হবে।' এর আগেও দু'-একবার উনি টলি ক্লাবে একটা উইক এন্ড ছুটির কথা বলেছেন। টলি ক্লাবের নির্জনতা ও সবুজ আমাদের দু'জনকেই টানত। আমরা আমাদের কুকুর বাস্কোকে নিয়ে সকালে



টলি ক্লাবে চলে যেতাম। গাছতলায় টেবিল চেয়ারে বসে খুব খারাপ কফি খেতে খেতে দু'জনে লেখা লিখতাম। শিশিরের "বসুবাড়ি"-র অনেকখানি ও আমার "চরণ রেখা তব"-র বেশ কয়েকটি অধ্যায় টলি ক্লাবে বসে লেখা। টলি ক্লাবে সবাই যায় গল্‌ফ, টেনিস বা স্কোয়াশ খেলতে অথবা ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে। আমরা ছাড়া টলি ক্লাবে বসে আর কেউ বই লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। টলি ক্লাবে উইক এন্ড কাটানোর ইচ্ছাটি ওঁর অবশ্য পূর্ণ হয়নি।

সেদিন খবর কাগজের প্রধান খবর ছিল কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল, ডিজেল আর কেরোসিনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন হয়ে থাকে এদিক ওদিক থেকে প্রতিবাদ হচ্ছে। দু'-একদিন প্রতিবাদ হবে তারপর লোকে ভুলেও যাবে। চেম্বারে নেমে শিশিরকুমার তার বরাদ্দ রুগি দেখলেন। ডাক্তারের নিষেধে বেশি রুগি দেখা বারণ।

কোনও এক সময়ে দেখলাম শিশিরকুমার সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলেন। খানিক পরে দেখি হাসি হাসি মুখে টিভি-র ঘর থেকে বার হলেন। সন্ধ্যা সাতটার খবরটা উনি শুনতেন। যদিও মুখে হাসি আমার মনে হল চেহারাটা ভাল দেখাচ্ছে না, রংটা বিবর্ণ। কী হয়েছে, শরীর খারাপ? জিজ্ঞাসা করতে যাব উনি এমন একটা খবর দিলেন যে হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। উনি বললেন— মমতা আবার বাজপেয়ী সরকারকে মুশকিলে ফেলে দিয়েছে। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনের দাম না-কমালে সে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবে জানিয়েছে। সে কী! আমি অবাক।

সুমন্ত্র এক গাদা বই হাতে কোথায় যেন যাচ্ছে। ও কখন বিমানবন্দর থেকে ফিরল, খেয়াল করিনি। ডেকে বললাম, শুনেছ বাবা কী বলছেন টিভি-র নিউজে বলেছে—। সুমন্ত্র দাঁড়িয়ে পড়ে শুনল, তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তোমাকে এখুনি টিভি থেকে ধরল বলে! সত্যি, ও দরজার বাইরে গিয়েছে কি যায়নি টেলিফোন বাজতে শুরু করল। দিল্লি থেকে বরখা দত্ত মমতার পদত্যাগের হুমকি সম্পর্কে কথা বলতে চাইছে। আমি ইনটারভিউ দেওয়া এড়িয়ে গেলাম। এই মাত্র শুনেছি খবর, বললাম। মমতাকে ফোনে ধরলাম ও খুব উত্তেজিত হয়ে বলল— হ্যাঁ, বলেছি। গরিবের কথা কেউ ভাবে না। কেরোসিন গরিব লোকে ব্যবহার করে। আর সাধারণ ঘরের বউ-ঝিরা ব্যবহার করে রান্নার গ্যাস। এই দুটোর দাম কমাতেই হবে। মমতার

ফোনটা রাখতেই আবার ঝনঝন। এবার কলকাতা থেকে মণিদীপা, একবার স্টুডিয়োতে আসুন। আমি দ্বিতীয়বার এড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই আবার টেলিফোন। এবার দিল্লি থেকে বিক্রমচন্দ্র। 'গাড়ি পাঠাতে বলছি, একবার কলকাতার স্টুডিয়োতে আসুন।' এবার হতাশ ভাবে ঠিক আছে বললাম। আমার অন্য হাতে আর একটা টেলিফোন ধরে আছি কেন? ওটা নাকি নেতাজি ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

আমাদের অনেকদিনের সেবিকা অমলা এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, মা একবার এদিকে এসো তো। বাথরুমে শাওয়ারের আওয়াজ পাচ্ছি খানিকক্ষণ তো হল, সাহেব এখনও বার হলেন না। আমার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। কী ঘটেছে কেমন যেন বুঝে গেলাম। বাথরুম থেকে বার করে ওকে বিছানায় শোয়ানো হল।

আমি শুধু ভাবছি চারটে টেলিফোন ধরেছি। নিশ্চয় পনেরো মিনিট হবে। অমূল্য সময় নষ্ট হয়েছে। হয়তো কিছু করা যেত। সেই রাত্রের মতো কি হাত ধোবার বেসিন ধরে সামলে নেবার চেষ্টা করেছিলেন? কে বলে দেবে? এখনও কি আশা আছে? মনে হয় না। কোনওমতে ডাক্তারকে ফোন করলাম। তিনি দশ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত। বললেন আপনার ধারণা ঠিক নয়। আগে জানলেও কিছু করতে পারতেন না।

আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কোনওমতে ফোন তুলে বস্টনে সুগতকে ধরলাম। শর্মিলা তখন বিমানে আকাশপথে। সুমন্ত্র কই? কে যেন বললে তাকে খবর দেওয়া গেছে। এইরকম একটা আকস্মিক দুর্যোগের ভয় অনেকদিন ধরে আমার মনের মধ্যে ছিল। একদিন শিশিরকে বলেও ফেলেছিলাম। 'আমার বড় ভয় করে। আমার তিন ছেলেমেয়ে বাইরে। তোমার যদি হঠাৎ কিছু হয় কী হবে। আমি একমাত্র সন্তান, নিজের ভাইবোন বলতে কেউ নেই।'

আমাদের শ্বেতপাথরের টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। খাওয়া থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার জন্য ভাবছ! তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। দেশের মানুষ, সাধারণ মানুষ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

কোন টিভি-তে যেন খবর প্রচার হয়ে গিয়েছিল। পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে বাড়ি লোকে লোকারণ্য। সাংবাদিক ও টিভি ক্যামেরার ভিড়। আমি



অনুরোধ করলাম দেহের ছবি তুলবেন না, যেমন ছিলেন তেমন মনে রাখতে দিন। তৎক্ষণাৎ সকলেই ক্যামেরা বন্ধ করলেন। সুমন্ত্র একাই অনেক কিছু সামলাচ্ছে মনে হল।

মমতা এসে পৌঁছেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সব ভার নিজের হাতে তুলে নিল। সেনাপতির মতো সকলকে পরিচালনা করতে লাগল। একসময়ে আমাকে এসে বললে, কৃষ্ণাদি, ছবি তুলবার অনুমতি দিন, সারা দেশের লোক দেখতে চাইবে। আমি রাজি হলাম। সব কিছু আমার হাতে নেই। শিশিরকুমার একদিকে যেমন জনসেবক বা পাবলিক সারভেন্ট ছিলেন অন্যদিকে ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অত্যন্ত প্রাইভেট পার্সন। তার মৃত্যুতে বাড়িতে এত ভিড়। কিন্তু আমার মনে পড়ছে ওর কথা, বলেছিলেন মানুষ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তাই যেন সত্য হচ্ছে।

সুগত বারবার ফোন করছে। তার জার্মানি যাবার কথা ছিল, পাসপোর্ট জমা দেওয়া আছে জার্মান দূতাবাসে। সেই ছুটির দিনেও তারা অফিস খুলিয়ে পাসপোর্ট দেবার চেষ্টা করছে। শেষপর্যন্ত দিতে পারল কিন্তু ততক্ষণে ফ্লাইট মিস হয়ে গেছে। তার পৌঁছতে দেরি হবে। তার জন্য অপেক্ষা না-করে মুম্বাই থেকে শর্মিলা সপরিবার পৌঁছলে আমরা শেষ কাজ সম্পন্ন করব। সুগতকে আমি বলেছিলাম, তুমি শান্ত হয়ে থেকো, বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

সেদিনের সন্ধ্যা আমার চোখের সামনে ঝাপসা ভাবে ভাসছে। সুব্রত ও মমতা কথা বলছে। সুব্রত মুখার্জি তখন মেয়র। সুব্রত বললে, কৃষ্ণাদি, শিশিরদাকে টাউন হল-এ নিয়ে যাই, এখানে এত ভিড় সামলানো যাবে না। আমি বললাম, না, উনি শুধু নেতাজি ভবনে যাবেন, আর কোথাও নয়। বেশ তাই হবে। সকালে ওর দেহ নেতাজি ভবনে শায়িত থাকবে। রাত্রের মতো একতলায় বসুন্ধরাতেই ব্যবস্থা হল। চারিদিকে অনেক চেনা মুখ। ঘরের মাঝখানে দীর্ঘদেহ মানুদা দাঁড়িয়ে আছেন। সৌগত আর ডলিকে দেখতে পাচ্ছি। ডলি একটা বালিশ হাতে আমাকে সোফায় আরামে বসাবার চেষ্টা করছে। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে নয়না চোখের জল মুছছে। ঘরে ঢুকে এলেন জর্জ ফার্নানডেজ, তখন উনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তার পিছনে প্রধানমন্ত্রীর দূত সুধীন্দ্র কুলকার্নি।

মমতা এসে বললে, কৃষ্ণাদি আপনি নীচে নামবেন না, খুব ভিড়। উপরে বসুন। যারা দেখা করতে চায় উপরে এসে দেখা করে যাক। মমতার হাতে আমার জন্য এক কাপ কফি।

আমি বললাম, না আমি নীচে তোমার শিশিরদার কাছেই থাকব। পঁয়তাল্লিশ বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি এই তো শেষবার। সুব্রতকে একটাই অনুরোধ করলাম শ্মশান যেন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশে থাকে। বিদেশে দেখেছি কত শান্ত সমাহিত ভাবে শেষ কাজ হয়। আমাদের এখানে তা হয় না।

একতলায় সুন্দর কারুকাজ করা খাটে শিশিরকুমার শায়িত, আমি পাশে বসলাম। অমলা আমাকে একা ছেড়ে যাবে না। খাটের মাথার কাছে কারুকাজ করা দুটি অক্ষর এস বি। শিশিরকুমারের পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর নামের আদ্যক্ষর। একটি পুরনো ছবি আছে এই খাটে মান্দালয় জেল ফেরত সুভাষচন্দ্র শুয়ে আছেন, খাটের পাশে দাঁড়ানো বালক শিশির। মণি এসে ঘরে ঢুকল। মণি হল প্রমিতা মল্লিক। মণির কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের পূজা ও প্রেমের গান ঘরের পরিবেশ অন্যরকম করে দিল। রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধু গান নয়, অন্তরের বিশ্বাস ও উপলব্ধি। সাদা ফুলে ঢাকা শিশিরকুমারের দিকে চেয়ে আমি এক সময়ে বললাম এত সাদা কেন, আমার ভাল লাগছে না। কথাটা মমতার কানে গেল। একটু পরেই এক সুদীর্ঘ লাল গোলাপফুলের মালা শুভ্র ফুলের উপর শোভা পাচ্ছে দেখলাম। আমি নিজেকে কেবলি মনে মনে বলতে লাগলাম কিছুতেই চোখের জল ফেলব না। কেনই বা শোক করব। আজ কৃতজ্ঞতা জানাবার দিন। ঈশ্বর দু'হাত ভরে দিয়েছেন। জীবনের সুদীর্ঘ পথ একসঙ্গে হেঁটেছি। ক্ষুদ্র দুঃখ, জীবন সংগ্রাম নিশ্চয় ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে পথ ছিল আনন্দময়।

এ ঘরে যখন ফুল, মালা, গান ও শোক পাশের ঘরে তখন একটা রাজনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বৈঠক চলছে। মন্ত্রিসভা থেকে মমতার পদত্যাগের সম্ভাবনার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারে একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। গভীর রাত্রে জর্জ ফার্নানডেজ, সুধীন্দ্র কুলকার্নি, তৃণমূলের কোনও কোনও এম পি ও নেতৃবৃন্দ মিটিং করছেন কীভাবে জট খোলা যায়। মমতা বলছে তার এখন এসব কথা ভাবার সময় নেই। কাল সকালের ব্যবস্থাপনায় সে ব্যস্ত। সেই গভীর শোকের রাত্রে আরো একটি ছোট রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল। সেকথা আমি পরে জেনেছিলাম। সৌগত সেই রাত্রে মমতার অন্দরে পুনঃপ্রবেশের অনুমতি পায়। তৃণমূলের জন্মের পর ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে সৌগত কংগ্রেসের হয়ে মমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সেই তিক্ত সম্পর্কের সে রাত্রে অবসান ঘটে।



আমার সে রাত শিশিরকুমারের অন্তিম শয়নে বসে কেটে গেল। সকালে সূর্য যেমন ওঠে তেমনি উঠল। পৃথিবীর সকল সংসারে স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম শুরু হল। বেলাতে বাড়ি আবার লোকারণ্য। ইনস্টিটিউট অব চাইলড হেলথ থেকে ডাক্তাররা এসেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বামীজিরা এসেছেন। তারা শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণদেবের নাম করে স্তোত্র গাইছেন। সুমন্ত্র একাই যথাসাধ্য লোকজন দেখাশুনো করছে। উপরে দোতলায় আমার কাছে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের অনেক আত্মীয়রা উপস্থিত। দিদি অর্থাৎ শিশিরের বড় ভগিনী ছোট ভাইয়ের আগে চলে যাওয়ায় শোকাহত। মণি আর তপন শর্মিলা, অ্যালান ও বাচ্চাদের বিমানবন্দর থেকে নিয়ে এল।

সুগত বিদেশে, তার অভাব বোধ করছি। মনে ভাবলাম শিশিরকুমারও তার পিতার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। শরৎচন্দ্র বসুর আকস্মিক মৃত্যুর সময়ে শিশির ইংল্যান্ডে ডাক্তারি পাঠরত। সুগত উপস্থিত নেই, কী আর করা যাবে। বসুন্ধরা গৃহ থেকে শিশিরকুমারের অন্তিম বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল। তখনও বহু মানুষজন আসছেন। ফুলের গুচ্ছ হাতে প্রণব মুখোপাধ্যায়। একপাশে বসুবাড়ির তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ দাঁড়ানো। তারা বললে, আমরা কাঁধ দেব। তারা বহন করে নিয়ে চলল শকটের দিকে। শর্মিলা গান গাইছে— ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে....। আমি মনে মনে আমার প্রিয় আইরিশ প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম— May God hold you in the palm of his hand till we meet again.

নেতাজি ভবনে শায়িত থাকার সময়ে অজস্র মানুষ ধীরপদে এসে ফুল দিয়ে যাচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে মণি-তপন-শর্মিলা গান গেয়ে চলেছে। অনেক অজানা অচেনা মানুষ ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। এক সময়ে ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ির যে পথ দিয়ে শিশিরকুমার রাঙাকাকাবাবুকে মহানিষ্ক্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই একই পথে তিনি নিজে মহাপ্রস্থানের পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

## পাঁচ

## কাজ, কাজ আর কাজ

শুধু কাজ, কাজ আর কাজ, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। প্রিয়জনের অভাব ভুলে থাকার একমাত্র উপায়। বসুবাড়ির সদস্যরা সাধারণভাবে রক্ষণশীল। মৃত্যুর পর নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলায় বিশ্বাসী। শিশিরকুমার প্রথা বিরোধী ছিলেন। ছেলেমেয়েরা স্থির করল কোনও আচার নয় তারা পালন করবে শিশিরকুমারের জীবনের উৎসব। শিশিরকুমারের বর্ণময় জীবন নিয়ে সুগত একটি মালটিমিডিয়া প্রেজেনটেশন ছবিতে, কবিতায়, গানে, কথায় সাজিয়ে নিল। গানের দিক শর্মিলার, সুমন্ত্র বাবার লেখা কবিতার ইংরেজি, বাংলা অনুবাদ নিয়ে বসল। উৎসবে সে উপস্থিত থাকতে পারবে না, তার কণ্ঠস্বর কবিতায় ধরে রাখা হল।

নেতাজি ভবনের পিছনের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। মাঠ ছাপিয়ে প্রধান ফটক অবধি মানুষের ভিড়। আমি প্রধান ফটকে এসে নামলাম। এত মানুষের ভিড়েও অকস্মাৎ একাকী বোধ করলাম। এই প্রথম আমি একা নেতাজি ভবনে প্রবেশ করলাম। ক'দিন আগেও যখন এসেছিলাম সঙ্গে ছিলেন কাচের গাড়িতে শয়ান শিশিরকুমার। আমার সাত বছরের দৌহিত্র টিপু এসে আমার হাত ধরে জনসমাবেশের মধ্যে নিয়ে চলল। পরদায় তখন ফুটে উঠছে শিশিরকুমারের জীবন— শৈশব, কৈশোর, স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবক, আমাদের বিবাহের কিছু আনন্দময় মুহূর্ত, ব্যস্ত চিকিৎসক, রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্রের কর্ম ও জীবনের স্মৃতিরক্ষায় নেতাজি ভবনে একাগ্রচিত্তে কর্মরত শিশিরকুমার। কখনও কানে আসছে সুগতর উদাত্ত গলায়— 'কারার এই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট', সুমন্ত্রর রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর— 'উত্তরাধিকার' কবিতা। অনেকে বললেন, শিশিরকুমারের জীবনের বিভিন্ন



দিক নিয়ে। সভার শেষে শর্মিলার মধুর কণ্ঠে 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু এ প্রাণ', বিষাদ গম্ভীর পরিবেশ।

শিশিরকুমার ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের প্রতি তার একটা দুর্বলতা ছিল। নেতাজি তার মহানিষ্ক্রমণের আগে শিশির ও ইলাকে দক্ষিণেশ্বরে পূজা দিতে পাঠিয়েছিলেন। পূজা দিয়ে সেই ফুল তারা রাঙাকাকাবাবুকে এনে দিয়েছিলেন। এইসব কথা মনে রেখে আমি আর ছেলেমেয়েরা একদিন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে এলাম। আরও একদিন আমাদের বসুন্ধরা গৃহে নিকট আত্মীয় ও বন্ধুজন নিয়ে আমাদের নিজস্ব মতে উপাসনা হল। এই প্রার্থনা সভার ভার নিয়েছিল আমার একান্ত আপনজন সলিল ও মনিয়া।

মনে করা হয়েছিল কলকাতা ছেড়ে বস্টন চলে গেলে শোক ভুলে থাকা যাবে। তা ছাড়া একবার রাষ্ট্রসংঘের কাজে ডুবে গেলে মন খারাপ করার সময় পাওয়া যাবে না। যেমন ভাবা যায় তেমন কি সব সময়ে হয়। বস্টনে আমি ও শিশিরকুমার প্রথম সংসার পেতেছিলাম। চোখে ভাসে এক তরুণ দম্পতির প্রবাসজীবনের ছবি। বাইরে যতই শান্ত হয়ে থাকি অন্তরে ততই দীর্ণ হয়ে যাই। একদিন একেবারে ভেঙে পড়লাম। মনে হল কলকাতার বাড়িতে স্মৃতিভার নিয়ে বসে থাকা ভাল ছিল। এখানে কেন এলাম! রাষ্ট্রসংঘের চেনা-অচেনা অজস্র মানুষের ভিড়ে আমি কী করে দাঁড়াব। আর কাজের শেষে নিউইয়র্কের কোনও হোটেল সুইটে একাকী শোকগ্রস্ত বসে থাকা ভেবে ভয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার এই মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে সুগত দৃঢ়হাতে হাল ধরল। সে আমার সঙ্গে নিউইয়র্কে এল এবং তারপর থেকে প্রতিদিন সকালে শাটল ফ্লাইট ধরে সে ফিরে গিয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও অন্য কাজকর্ম সেরে বিকেলের শাটল-এ নিউইয়র্ক ফিরে আসে। তার এই ডেলি প্যাসেঞ্জারের জীবন চলল বেশ কিছুদিন।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের পার্মানেন্ট মিশন-এর সব অফিসাররা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে বুঝতে না দিয়ে নীরবে দেখাশুনো করে যেতেন। কমলেশ শর্মা, সত্য পাল, সতীশ মেটা ও তার স্ত্রী প্রীতি আর বিজয়া ঠাকুর। এদের কথা ভুলতে পারি না। সেবার সিকিউরিটি কাউন্সিল অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য রেখেছিলাম। বিষয় ছিল নিরাপত্তা ও শান্তি: নারীর ভূমিকা। রাষ্ট্রসংঘের উলটো দিকে একটি চিনে রেস্তোরাঁতে বসে আমি ও সত্য পাল কী

বলা হবে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। আমার ঠিক আগে বলতে উঠলেন পাকিস্তানে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি। পুরনো অভ্যাস মতো বিষয় যাই হোক না কেন কাশ্মীর টেনে এনে ভারতকে অনেক গালমন্দ করলেন। পিছন থেকে আমাদের অফিসাররা আমাকে লিখে পাঠালেন, আপনি কি এর জবাব দিতে চান? এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আমি লিখে দিলাম— না, আমি ওকে পাত্তা দিতে চাই না— আই উড ইগনোর হিম।

পরে জেনেছিলাম আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। পাকিস্তান খুব হতাশ হয়েছিল। ওদের একটা ঝগড়া বাধাবার খুবই ইচ্ছা ছিল। আমাদের আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সে সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে নন-পার্মানেন্ট মেম্বার বা অস্থায়ী সদস্য। আমি বক্তৃতা শেষ করে বসলাম। আর তখনি ওদের দিক থেকে একটি চিরকুট আমার হাতে কে দিয়ে গেল। খুলে দেখলাম বাংলায় লেখা রয়েছে 'বাঙালি হিসেবে আপনার জন্য আমরা গর্বিত।'

এবারই ডা. চিত্তরঞ্জন রানাওয়াট নিউইয়র্কের লেনক্স হিল হাসপাতালে আমার হাঁটুর ব্যথার জন্য দেখলেন। ডা. রানাওয়াট কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর একটি হাঁটুতে অপারেশন করেছেন এবং শিগগিরই দ্বিতীয় হাঁটুর অপারেশন করতে ভারতবর্ষে যাবেন। আমার অপারেশন করানো জরুরি বলে রায় দিলেন। এবং যখন দেশে যাবেন করে দেবেন কথা হল।

ডা. রানাওয়াটের ক্লিনিকে জুনিয়র আমেরিকান ডাক্তার আমার নাম-ধাম পরিচয় লিখে নিতে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে— নেম? অ্যাড্রেস? এইজ? লিখতে লিখতে জিজ্ঞাসা করলেন— ম্যারেড? এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত থাকার পর শুনতে পেলাম বলছি— উইডো। তখনও যেন নিজের নবলব্ধ পরিচয় নিজের কাছেই অচেনা।

রাষ্ট্রসংঘে কাজের ফাঁকে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার দিয়েছিলাম। বিষয় ছিল রাজনীতিতে আমার অভিজ্ঞতা। কেমন করে দীর্ঘ অ্যাকাডেমিক জীবনের পর জটিল রাজনীতির জগতে অনুপ্রবেশ করলাম। শ্রোতাদের মধ্যে অধ্যাপক লেনার্ড গর্ডন, গায়ত্রী স্পিভাক, অধ্যাপক রণজিৎ গুহর স্ত্রী মেখটিলড, আরও কারা সব উপস্থিত ছিলেন।

সেবার বস্টন থেকে লন্ডন হয়ে কলকাতা ফেরার পথে বিমানে বসে শিশির ও আমার জীবনের কথা যেমন মনে হল লিখে চললাম। লেখাটা যেন চোখের জলের মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। বিমানের স্টুয়ার্ড জিজ্ঞাসা করছিল,



তুমি সারাপথ এত কী লিখছিলে! আমাদের জীবনের সেই খণ্ডচিত্র পরে 'যে তরণীখানি' নামে বই হয়ে প্রকাশ হয়েছিল।

জানুয়ারির ২৬ তারিখ ২০০১ সাল আমাদের রিপাবলিক দিবসের ছুটি। কিন্তু আমাকে দিল্লিতে বিদেশ দপ্তর কমিটির অফিস খুলে রাখতে বলা হল। খবর এল সেদিন ক্রিস প্যাটেন, তখন ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়নের কমিশনার, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। ক্রিস প্যাটেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমি দিল্লিতে যদি আমাদের কমিটির সদস্য আর কেউ থাকেন খবর দিতে বললাম। ছুটির দিনে বিশেষ কেউ ছিলেন না। তবুও দু'-চারজন এলেন। ক্রিস প্যাটেনের সঙ্গে এই দীর্ঘ বৈঠক খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রতি প্যাটেনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হল। আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পরে পার্লামেন্ট হাউসের অ্যানেক্স-এ প্রাইভেট ডাইনিং রুমে কফি ও জলযোগের ব্যবস্থা রেখেছিলাম। সেখানেও কফি খেতে খেতে দীর্ঘ আলোচনা চলল। আমি আমাদের বিদেশমন্ত্রককে বার বার বলেও ঠিক বোঝাতে পারিনি যে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলা জরুরি। এখন পৃথিবী যাকে বলে 'ইউনিপোলার', একমাত্র শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা। এই সময়ে ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ভাল বোঝাপড়া থাকলে আমাদের লাভ হবে। প্যাটেনও দু'তরফে আরও আদান-প্রদান চাইছিলেন। আমাকে অনেকবার ওরা ব্রাসেলস-এ আমন্ত্রণ করেছিলেন ওদের বিদেশ দপ্তর কমিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। এই সুযোগগুলি নেওয়া দরকার ছিল। আমি স্পিকারকে বলে পাঠিয়েছিলাম আমার যেতে হবে তেমন কোনও কথা নেই উনি যদি একটা ডেলিগেশন নিয়ে যান তবে খুব ভাল হয়। এলমার ব্রক আমাকে বেশ কয়েকবার চিঠি লিখেছিলেন। বিদেশমন্ত্রক আমাকে এক দীর্ঘ চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল যে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সখ্য দৃঢ়তর করা সম্পর্কে তারা আমার সঙ্গে একমত। চিঠি লিখেছিলেন তদানীন্তন ইয়োরোপের ভারপ্রাপ্ত সচিব। কিন্তু কাজের কাজ খুব হয়নি। পরের বছর ইয়োরোপিয়ান পার্লামেন্ট থেকে আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি এসেছিলেন। তিনি ফিলিপ মরিও (Philip Morillon)। জেনারেল সতীশ নাম্বিয়ার আমাকে জানালেন যে ফিলিপ মরিও আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি আবারও দিল্লিবাসী সদস্যদের খবর দেবার চেষ্টা করেছিলাম। ফিলিপ মরিওর সঙ্গে সেই বৈঠকে আমার সঙ্গে যোগ

দিয়েছিলেন এল এম সিংভি এবং নটবর সিং। এরপর ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে যে ডেলিগেশন এল তারা আমাকে বলেছিল, আমরা এতবার তোমাদের আমন্ত্রণ জানালাম, তোমরা তা গ্রহণ করলে না। আমি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত। আমাদের দেশের বিভিন্ন লালফিতের ফাঁস ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না।

ক্রিস প্যাটেনের সঙ্গে যেদিন আমি বৈঠক করছি ২৬ জানুয়ারি, ২০০১, মনে মনে অন্য কারণে একটু চিন্তিত ছিলাম। সকালে কাজে বার হবার আগে টিভিতে দেখেছি গুজরাটে ভূমিকম্প হয়েছে। দিল্লিতেও সামান্য ভূকম্পন অনুভব করা গিয়েছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর আসতে লাগল এ ভূমিকম্প ভয়াবহ ধ্বংসলীলা নিয়ে এসেছে। টেলিভিশনের কল্যাণে পরদায় তার ভয়াবহতা ফুটে উঠল। সেদিন ঘটনাচক্রে আমার কন্যা ছিল আমেদাবাদে। বৈঠক শেষে বাড়ি ফিরেই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলাম। সুগত এর মধ্যেই রেলমন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রক মারফত খোঁজখবর শুরু করেছিল। কিন্তু আমেদাবাদ বরোদা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কোনও খবর পাবার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত রাত বারোটা নাগাদ তার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল। সকল শহরবাসীর সঙ্গে সে ও পথে পথে ঘুরছিল। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের পরে গুজরাটবাসী ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তারা ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় পুনর্গঠনের কাজ শুরু করলেন। গুজরাটের মানুষের সাহস ও ধৈর্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। পরের বছর গুজরাটের ওপর আবার আঘাত নেমে এল। এবার প্রকৃতির তাণ্ডব নয়, মানুষের অত্যাচার। দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাট সারা দেশের লজ্জার কারণ হল।

সারা বছর ধরেই নানান বিদেশি ডেলিগেশনের সঙ্গে আমাদের কমিটির আলাপ আলোচনা চলতে থাকল। জানুয়ারির গোড়াতেই এসেছিলেন চিন দেশ থেকে লি পেঙ। তিনি চিনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সঙ্গে বিরাট চিনা ডেলিগেশন। তাকে আমরা স্বাগত জানালাম। তবে আমাদের মনের মধ্যে ছিল তিয়ানামেন স্কোয়ারের হত্যালীলার কথা। লি পেঙ-এর নাম তার সঙ্গে জড়িত।

এর অল্পদিন পরেই এল জার্মান পার্লামেন্টের একটি দল। দলের নেতৃত্ব দিয়েছিল অ্যাঞ্জেলিকা কসটার লোসাক। অ্যাঞ্জেলিকা আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল। ভারতবর্ষ ও বাংলা ভাষার প্রতি তার একটা টান ছিল। বেশ কয়েকটি



বড় বড় জার্মান ডেলিগেশন-এর সঙ্গে আমার কমিটির মতামত আদান প্রদান হয়েছিল। ফলে অনেক জার্মান নেতৃবৃন্দ ও কূটনীতিকের সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় হয়ে যায়। জার্মান রাষ্ট্রদূত রিখ্‌টার ছিলেন বিশেষ বন্ধু। জার্মান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট উলফগ্যাঙ থিয়েরস (Thierse) এসেছিলেন একটি ডেলিগেশন নিয়ে। আর এক দল নিয়ে এলেন গেরনট এরলার (Erler) তিনি জার্মান পার্লামেন্টের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান। অবশ্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ জার্মান অতিথি এলেন চ্যানসেলর শ্রোয়েডার (Schroeder)। তার সঙ্গে সাতজন বিশিষ্ট জার্মান পার্লামেন্টেরিয়ান। সেটা ছিল নভেম্বর ২০০১। চ্যান্সেলর শ্রোয়েডারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যামবাসাডর রিখ্‌টার। চ্যান্সেলর বললেন তিনি খবর পেয়ে গেছেন যে সকালবেলায় আমাদের কমিটির সঙ্গে জার্মান ডেলিগেশন-এর খুব চমৎকার মিটিং হয়ে গেছে। পরের বছর জার্মানির বাভেরিয়া রাজ্য থেকে একটি মস্ত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দল এসেছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন যেমন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল ভারত-জার্মান সম্পর্কও গভীরতর ও অন্তরঙ্গ চেহারা নিয়েছিল।

তবে শুধু ইয়োরোপ, আমেরিকা নয় আফ্রিকার অনেক প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। উগান্ডার স্পিকার ফ্র্যানসিস জে আউমে (Ayme) এক ডেলিগেশন নিয়ে এসেছিলেন। তানজানিয়ার স্পিকার পিউস মাসেকা (Msekwa) এলেন তার দেশের প্রতিনিধি দল সঙ্গে নিয়ে। নাইজেরিয়া ডেলিগেশন-এর নেতৃত্বে ছিলেন ওদের সেনেটের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মানটু (Mantu)। মরক্কো থেকে এক দল নিয়ে এলেন সেনেটর মুসতাফা ওগাচা (Ogacha)।

বিভিন্ন দেশের অনেক বিদেশমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার সুযোগ হয়েছিল ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ওমান, ভুটান, আরও অনেক উচ্চপদস্থ বিদেশি অভ্যাগত। নেদারল্যান্ডস-এর অ্যামবাসাডর পিটার কোচ (Koch) মাঝে মাঝে তার গৃহে নৈশভোজে ডেকেছেন। যে বাড়িতে উনি থাকতেন সে বাড়িটি বেশ ঐতিহাসিক। সেই কারণেও এই নৈশভোজগুলি মনে আছে। দিল্লিতে এই বাড়িটিতে জিন্না এক সময়ে থাকতেন। জিন্না হাউস নামে পরিচিত এই গৃহের স্থাপত্যও বেশ কৌতূহলজনক। ডাইনিং রুমের সিলিংটি খুব উঁচু হওয়াতে ঘরটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। নেদারল্যান্ডস-এর বিদেশমন্ত্রী

জোয়াজিয়াম ভ্যাল আর্টসেন (Aartsen)-এর সঙ্গে বৈঠক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছিল। ভুটানের বিদেশমন্ত্রী আবার ভুটানের রাষ্ট্রদূতের আত্মীয় ছিলেন। ভুটানের রাষ্ট্রদূত লিওনপো ভাগো শেরিং দিল্লিতে বহুদিন আছেন, পরিচিত মুখ। আমার তার সঙ্গে বেশ সখ্য হয়ে গিয়েছিল। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে মাঝে মাঝেই ভুটানের চমৎকার সবুজ আপেলের স্বাদ পাওয়া যেত। ভারত-ভুটান সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু নেপালে অশনি সংকেত তখনই দেখা দিয়েছিল। আমি বিদেশ দপ্তর কমিটিতে নেপালের অ্যামবাসাডর ভেখ বাহাদুর থাপাকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। তিনি নেপালের তখনকার অবস্থা ও ভারতের ভূমিকা কী হওয়া উচিত চমৎকার বলেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই নেপালের ভয়াবহ রাজকীয় হত্যালীলা ঘটে যায়।

অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা সবসময়ে চালিয়ে রাখতে হত। বাঙালি হওয়ার ফলে বাংলাদেশের দূতাবাসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যথেষ্ট গাঢ় ছিল। একবার বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি দলের কাছে বক্তব্য রাখতে সি আই আই বা কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ আহ্বান করেছিলেন। সেই বৈঠকে অন্যদের অনুমতি নিয়ে আমি প্রথমে বাংলাতে তাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছিলাম। তারা খুবই পুলকিত হয়েছিলেন।

মায়নামার এক প্রতিবেশী রাজ্য। সেখানে আমার কিঞ্চিৎ সমস্যা হত। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সকল সহানুভূতি সু চি-র দিকে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ছিল। কিন্তু সরকারিভাবে ভারত সরকার ও মায়নামারের সামরিক সরকারের যথেষ্ট সুসম্পর্ক। দেশের স্বার্থে কখনও এরকম সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এদিকে মাঝে মাঝেই মায়নামারের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী আমার দিল্লির ফ্ল্যাটে হাজির হত। তাদের নানান আর্জি। বিদেশ মন্ত্রক পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়ার ফলে আমি তাদের সরাসরি কোনও সাহায্য করতে পারতাম না। তবে অনেক সময়ে অন্যান্য এম পি-দের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। তারা হয়তো ওদের হয়ে পার্লামেন্টে কোনও প্রশ্ন করতে পারেন অথবা তাদের কোনও মেমোরেনডাম বা দাবিপত্রে সই দিতে পারেন। আমি জানি জর্জ ফার্নানডেজ এদের খুব সাহায্য করতেন। কিন্তু সে সময়ে মন্ত্রী থাকার ফলে তাঁরও হাত-পা বাঁধা।

বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে ফ্রান্সের হিউবার্ট ভেড্রিন (Vedrine)-এর কথা



বিশেষভাবে মনে আছে। তার সঙ্গে আমাদের কমিটির বৈঠক খুবই ইতিবাচক হয়েছিল। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে তখন খুবই সুসম্পর্ক। ভারতের রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে আসনের দাবি ফ্রান্স প্রথম থেকে সমর্থন করেছিল। হিউবার্ট ভেড্রিন-এর এই বৈঠকের সঙ্গে একটি কৌতুকজনক কাহিনি জড়িয়ে আছে। বৈঠকের ঠিক আগে আমি কনফারেন্স রুমে ঢুকে দেখলাম একজন নিরাপত্তাকর্মী টেবিল থেকে সব মিনেরাল ওয়াটারের বোতলগুলি সরিয়ে নিচ্ছেন। আশ্চর্য হয়ে কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে বলল নিরাপত্তার নিয়মকানুন অনুসারে শুধু চেয়ারপার্সনের জন্য এক বোতল জল থাকবে, আর কারও জন্য নয়। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, আমার অতিথি যদি জল না পান আমাকে দেবার দরকার কী! শুনে সে মহা আনন্দে আমার জন্য রাখা বোতলটাও তুলে নিল। তাকে প্রচণ্ড বকুনি দিতে যাব তখন আমার সেক্রেটারি পুষ্প দৌড়ে এসে খবর দিল ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী সদলবলে পৌঁছে গেছেন। প্রোটোকল অনুসারে আমাকে বাইরে করিডরে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

আগেই বলেছি ভাল বৈঠক হল। বেশ দীর্ঘস্থায়ী। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর ভেড্রিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তার বক্তব্য রাখলেন। বক্তৃতার শেষে বসে পড়ে উনি আমার দিকে ফিরে বললেন, মে আই হ্যাভ এ গ্লাস অব ওয়াটার? আমি তো অপ্রস্তুত, ঘরে একফোঁটা জল নেই। পাশের ঘরে অবশ্য চা ও জলযোগের এলাহি ব্যবস্থা। তাড়াতাড়ি সে ঘরে অতিথিকে নিয়ে এলাম। সন্ধ্যাবেলা খবর কাগজ থেকে আমি বেশ কয়েকটা ফোন পেলাম, আজকের বৈঠক কেমন হল? বললাম, ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক দৃঢ়তর হল, খুব ভাল বৈঠক। পরদিন একটি ইংরেজি কাগজে প্রথম পাতায় বড় করে খবর— ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রীকে কোথায় ওয়াইন দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো উচিত তার জন্য খাবার জল পর্যন্ত ছিল না! পার্লামেন্টের নিরাপত্তাকর্মীদের প্রধান আমার বাড়িতে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কোনও এক নির্বোধ কর্মীর জন্য এই ঘটনা ঘটে যাওয়াতে তিনি মার্জনা প্রার্থী। এরপর থেকে আমাদের সব মিটিং-এ এত বেশি মিনারেল ওয়াটার দেওয়া শুরু হল যে আমাদের ডুবে যাবার অবস্থা।

আমার কাজের সূত্রে আমাকে অনেক ডিপ্লোম্যাটিক লাঞ্চ ও ডিনারে যোগ দিতে হত। কূটনীতিতে এসব খুব কাজে লাগে। আমি লক্ষ করতাম এই সব

কূটনীতিক খাওয়া-দাওয়ার একটা বাঁধাধরা ছক আছে। যদি কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান আসেন তাকে আপ্যায়ন করবেন আমাদের রাষ্ট্রপতি। ভোজসভা হবে রাষ্ট্রপতি ভবনে। আমরা সব আমন্ত্রিতরা সার বেঁধে দাঁড়াব। রাষ্ট্রপতি তার সঙ্গে অতিথি রাষ্ট্রপ্রধান (এবং তার পত্নী)-কে নিয়ে প্রবেশ করে একটি বিশেষ জায়গায় দাঁড়াবেন। প্রোটোকল অফিসার তার হাতে ধরা তালিকা থেকে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল অতিথির রোল কল করার মতো নাম ধরে ডেকে যাবেন। সবাই একে একে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করে দু'-চারকথা বিনিময় করবেন। তারপর শুরু হবে সিট-ডাউন ডিনার বা লাঞ্চ। টেবিলে চারদিকে যে যার নামাঙ্কিত চেয়ারে বসবেন। টেবিলে সুদৃশ্য ছাপানো মেনু। সঙ্গে আরও একটি কার্ড, খাবার সময়ে কী গান বা বাজনা বাজবে তার তালিকা। শুরুতে অথবা শেষে দুই রাষ্ট্রপ্রধান উঠে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো বক্তৃতা দেবেন। দু'তরফ থেকে টোস্ট প্রপোজ করা হবে। সাধারণত ওয়াইন দিয়ে টোস্ট প্রপোজ করা রীতি। আমাদের দেশে ফলের রস সহ করা হয়।

যখন অন্য কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী আসবেন তখন আপ্যায়ন করবেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। এই আপ্যায়ন হবে হায়দ্রাবাদ হাউজ নামে সুন্দর বাড়িটিতে। হায়দ্রাবাদ হাউজ গৃহটির স্থাপত্য চমৎকার। আমার মনের গোপন বাসনা ছিল কোনও একদিন হায়দ্রাবাদ হাউজে বসবাস করব। এ বাড়িতে অবশ্য কেউ থাকে না। সরকারি অনুষ্ঠান, কূটনীতিক বৈঠক, ভোজসভা এই গৃহে হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডিনার হলেও আমরা আমন্ত্রিতরা লাইন দিয়ে দাঁড়াই। তবে এবার রাষ্ট্রীয় অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিকে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে করতে চলেন। আমরা তাঁদের দিকে যাই না। প্রোটোকলের কোনও রহস্যময় কারণে সিট-ডাউন ডিনারে আমার সিট বেশ ভাল জায়গায় থাকে। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশি অতিথি দু'জনকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করি। প্রথা মতো আমার দু'দিকে যারা বসেছেন তাদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপচারিতা চালিয়ে যাই। কখনও এমন হয়েছে পাশের অতিথি তত ভাল ইংরেজি জানেন না। তা হলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর জন্য থাকেন অনুবাদ করার জন্য ইন্টারপ্রেটার। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজিকে লক্ষ করতে আমার বেশ ভাল লাগত। কোনও একটি কোর্স পরিবেশিত হলে উনি মনোযোগ সহকারে খেয়ে চলেছেন। ভোজন রসিক হিসেবে সুপরিচিত। আমার হয়তো একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছে— আরে পাশে



বসা রাষ্ট্রপ্রধানের পত্নীর সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করবেন তো! না, আমার চিন্তার কারণ নেই। কোর্স শেষ হতেই উনি হাসিমুখে পাশ ফিরে কথাবার্তা বললেন। ইতিমধ্যে পরবর্তী কোর্স পরিবেশন করা হল। বাজপেয়ীজি আবার সব ভুলে খাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন।

অন্য দেশের বিদেশমন্ত্রী এলে আমাদের বিদেশমন্ত্রী ভোজসভার আয়োজন করবেন। হায়দ্রাবাদ হাউজেই তা হবে। তবে কখনও ছোটখাটো লাঞ্চ বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ মৌর্য শেরাটনেও দিয়েছেন। দেশবিদেশ থেকে বড় বড় ডেলিগেশন এলে লোকসভার স্পিকার অশোক হোটেলের বড় কনভেনশন হল-এ ডিনার দিতেন। একবার স্পিকার বালযোগী আমাকে একটি ইজরায়েল প্রতিনিধি দলের ডিনারের ভার নিতে বলেন। দলের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যামনন রুবিনস্টাইন। আমি পার্লামেন্ট হাউজের অ্যানেক্স-এর ডাইনিং হল-এ ডিনারের আয়োজন করেছিলাম। বক্তৃতা দেওয়া টোস্ট প্রপোজ করা সবই ছিল। অবশ্যই কমলালেবুর রস দিয়ে টোস্ট প্রপোজ করা হয়েছিল। ইজরায়েল সদস্যদের আপ্যায়ন করার দু'দিন পরেই প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধির নিমন্ত্রণে তাদের একটা রিসেপশন-এ যোগ দিতে গেলাম। কূটনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই জরুরি। আর কিছুদিনের মধ্যে বুঝে গেলাম বিদেশমন্ত্রকের কাজকর্মের মধ্যে ডিনার ডিপ্লোম্যাসিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে জরুরি আলাপ আলোচনা খাবার টেবিলে বসেও করা হয়। এমনকী ডিনারের মেনুও বার্তাবহ হতে পারে। টোনি ব্লেয়ার তখন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। ২০০২-এর জানুয়ারিতে ভারতবর্ষে এলেন। তার সম্মানে ডিনার শেষ হবার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি লক্ষ করেছেন আজকে সুপ থেকে শুরু করে ডেজার্ট অর্থাৎ মিষ্টান্ন পর্যন্ত সবপদই কাশ্মীরি রান্না? উনি বললেন, হ্যাঁ, এমনকী শেষে যে চা এল সেটাও কাশ্মীরি তাও দেখেছি।

ডিপ্লোম্যাটিক খাওয়া-দাওয়ার কথা বলতে গেলে একটি ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নভোজের কথা মনে পড়ে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ-এর জন্য আয়োজিত ব্যাংকোয়েট। জুলাই ২০০১ সালের কথা। আগ্রা বৈঠকের আগে দিল্লিতে তাজ প্যালেস হোটেলে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজি প্রেসিডেন্ট মুশারফের সম্মানে ব্যাংকোয়েট দিচ্ছেন। এর মাত্র অল্পদিন আগে আমার ও বাজপেয়ীজি দু'জনের হাঁটুতে অপারেশন হয়েছে।

তাজ প্যালেসের ডাইনিং হল-এ যেতে বেশ কিছু সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে হয়। আমি পৌঁছে দেখলাম সব অভ্যাগতরা সিঁড়ি ভেঙে ডাইনিং হল-এ চলেছেন। কিন্তু দু'জন অতিথির জন্য কনভেনশন হল-এর ফটক দিয়ে ঢোকার বিশেষ ব্যবস্থা। সেখানে সিঁড়ি নেই। একজন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী স্বয়ং অপরজন এই অধম। পি এম ও অফিস ও সিকিউরিটির লোকজন আমার এই অপারেশন-এর খবর জানাতে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন। ডাইনিং হল-এ প্রবেশ করেই দেখলাম প্রথম টেবিলটির নাম 'গঙ্গা'। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ, হোম মিনিস্টার আদবানি এরা প্রধান অতিথি মুশারফকে নিয়ে বসবেন। এমন ব্যবস্থা যাতে বাজপেয়ীজিকে হল-এ অনেক হাঁটতে না হয়। তার পাশের টেবিলটি 'যমুনা', সেখানে আমার বসবার আসন নির্দিষ্ট রয়েছে। পার্লামেন্টে একটা পরিহাস চলত যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাদের একসঙ্গে অপারেশন হয়েছে তাদের নিয়ে একটি বিশিষ্ট ক্লাব গঠিত হয়ে গেছে— exclusive knee club. যা হোক, 'যমুনা'-তে বসার ফলে মুশারফকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল, এমনকী দু'-চারটি বাক্যালাপও হল।

'যমুনা' টেবিলে আমরা সবাই বেশ গল্পগুজব করে খেলাম। অন্যদের মধ্যে ছিলেন সনিয়া গাঁধী, পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট জেনারেল, বর্ষীয়ান পাকিস্তানি সাংবাদিক আদের্শির কাওয়াসজি। কাওয়াসজি সারাক্ষণই মজার কথা বলে আমাদের হাসাচ্ছিলেন। সনিয়া গাঁধীর দিকে চেয়ে উনি বললেন, 'শুনেছি, আপনি খুব গম্ভীর, একেবারে হাসেন না।' জবাবে সনিয়া মৃদু হাসলেন। অমনি কাওয়াসজি বলে উঠলেন, 'কী কাণ্ড! হাসলে তো আপনাকে খুব সুন্দর দেখায়! আরে না না— আবার গম্ভীর হয়ে যাবেন না।' মেন কোর্স শেষ হলে আর ডেজার্ট পরিবেশনের আগে আমি উঠে 'গঙ্গা' টেবিলে গিয়ে মুশারফের সঙ্গে করমর্দন ও কয়েকমিনিট বাক্যালাপ সেরে এলাম। উনি খুবই শিভলরাস ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। আমাকে পাকিস্তানে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বললাম আমি অনেকবারই ওদের দেশে গিয়েছি। ইতিহাস যে আমাদের দু'দেশকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে সেকথা অল্প বিস্তর হল। আমার মনে হল ইনি একজন সৈনিক, ঠিক অ্যাকাডেমিক বা ইনটেলেকচুয়াল মানসিকতার ব্যক্তিত্ব নন। সে সময়ে আমরা আগ্রা সামিট সফল হলেও হতে পারে আশাবাদী ছিলাম। অবশ্য শিগগিরই আমাদের নিরাশ হতে হয়েছিল।



প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজি কিন্তু মনে প্রাণে চেয়েছিলেন আগ্রার শীর্ষবৈঠক সফল হোক। একথা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। মাত্রই অল্পদিন আগে জুন মাসে আমি এবং অটলজি মুম্বাইতে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে একই সময়ে ছিলাম। নিউইয়র্ক থেকে ডা. রানাওয়াট এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে। আমার জীবনে প্রথম কোনও অপারেশন হতে চলেছে। খুব ভয়ে আছি। আমার একদিন আগে অটলজির হয়ে গেল। আমাকে যখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছে ওর ফোন এল— ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, গো এহেড— 'ভয় পাবে না, এগিয়ে পড়ো। আমাকে দেখতে ওর পালিতা কন্যা নমিতা ও নাতনি নেহা এল। সুধীন্দ্র কুলকার্নিও আসতেন। সুগত আমার হাসপাতালে সঙ্গী ছিল। ওরা সুগতর খুব খোঁজখবর করতেন। নমিতা বলেছিল আমার যখন অপারেশন চলবে তখন যেন সুগত একলা না থেকে ওদের সঙ্গে সময় কাটায়, ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে নেয়। সুগত অবশ্য রাজি হয়নি সে অপারেশন থিয়েটারের বাইরে ঠায় বসে ছিল। অটলজি খেতে ভালবাসেন তাই ওদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা তাজ হোটেলের সঙ্গে করা হয়েছিল। নমিতা সেসব সুখাদ্যের ভাগ আমার ঘরেও পাঠিয়ে দিত।

আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগের দিন ডাক্তার আমাকে বললেন, অটলজি ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাকে হুইলচেয়ারে করে ওর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আমি হুইলচেয়ারে বসা, প্রধানমন্ত্রী রোগশয্যায় শয়ান। অনেক জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি এমনি অভিনব সাক্ষাৎকার কখনও হয়নি। সেই সময়ে কাশ্মীর নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হল। মুশারফের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আমি দেখলাম উনি আগ্রা শীর্ষবৈঠকের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ভাবে দ্রুত সেরে ওঠার জন্যও তৎপর হয়েছেন। সেই আলোচনায় স্থির হল মুশারফ যদি জোর করেন তা হলেও কাশ্মীরকে একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু কাশ্মীর অবশ্যই সব আলাপ আলোচনার অন্যতম জরুরি বিষয় থাকবে। ভারত-পাক ভবিষ্যৎ সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে আগ্রা শীর্ষবৈঠক কোনও বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিক এ ছিল প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর একান্ত আকাঙ্ক্ষা। আমার মনে হয়েছিল উনি জানেন আগ্রা বৈঠকের সাফল্য তা যদি যৎসামান্যও হয় ওর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালের

দিকচিহ্ন হবে। তা অবশ্য হল না। আগ্রা বৈঠক ওকে শূন্য হাতেই ফিরিয়ে দিল।

প্রধানমন্ত্রী থাকাতে হাসপাতাল যেমন জমজমাট ছিল সিকিউরিটির বাড়াবাড়িও ছিল তেমনি। তা সত্ত্বেও আমার অনেক ফুল ও কার্ড এল, দেখতেও এলেন অনেকে। মমতার শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছিলেন রতন মুখার্জি। প্রথমেই দেখতে এলেন আদবানিজি। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসেছিলেন কিন্তু আমার কথাও ভুলে যাননি। ঘরে এসে খোঁজখবর করলেন। যেদিন আমার তিন দৌহিত্র আমাকে দেখতে এল সেদিন সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা অফিসারদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছিল। তিন বালকের ভিতরে প্রবেশ করতে বেশ বিলম্ব হল। তার গুরুতর কারণ ছিল। ছোট দু'জন— একজনের বয়স পাঁচ আর একজনের দুই— হাতে করে নিজেদের খেলনা এনেছে। খেলনাগুলি 'ওয়ার টয়' অর্থাৎ যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার বন্দুক, ট্যাংক ইত্যাদি। যথেষ্ট তল্লাশ করার পর তাদের ভিতরে আসার অনুমতি মিলেছিল। অনেক সময় ভেবেছি আমার ব্রিচ ক্যান্ডির দিনগুলি নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়। দিনে ও রাত্রে আলাদা করে দু'জন নার্স ছিল। তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। আর আছে সর্বক্ষণের সেবক আমার পুত্র সুগত। দীর্ঘক্ষণ আমার সঙ্গে হাসপাতালে কাটায় এরিন। ডা. এরিন ব্রোচা নামকরা শিশুচিকিৎসক, এককালে আমার স্বামী ডা. শিশিরকুমার বসুর প্রিয় ছাত্রীদের অন্যতম। রাত্রে সুগতর শোবার জন্য আছে একটা সোফা, ভোর হতে-না-হতে নার্সেরা রুগিদের স্পঞ্জিং ইত্যাদি পরিচর্যা শুরু করে দেয়। তখন আত্মীয়স্বজনদের ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়। বাইরের করিডরে কাগজের কাপে কফি হাতে সবাই পদচারণা করেন। তাদের একটা ক্লাব মতো গড়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কন্যারা আছে পিতা বা মাতার সঙ্গে। তা প্রধানমন্ত্রীর কন্যা, হিউম্যান রাইটস কমিশনের জাস্টিস ভর্মার স্ত্রীর জন্য তাদের কন্যা থেকে শুরু করে সকলের এক অবস্থা। সেই মর্নিং কফি ক্লাবের বলতে গেলে একমাত্র পুরুষ সদস্য সুগত।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর দিন সাতেক মুম্বাইতে বিশ্রাম। মুম্বাইর ফ্ল্যাট তখন প্রায় ফাঁকা। টিপুর ইস্কুল খুলে যাওয়াতে সুগত তাকে নিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে গেল। বাড়িতে আমি, আমার নার্স, অমলা আর ছোট দুই শিশু দৌহিত্র। মাত্রই কয়েকমাস আগে আমি শিশিরকুমারকে হারিয়েছি।



মাঝে মাঝেই মনখারাপ হয়, উদাস হয়ে যাই। একদিন উদাস হয়ে বসে আছি আমার পাঁচ বছরের দৌহিত্র টুংকু এসে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর সে বললে, মন খারাপ কোরো না, তোমার সঙ্গে দাদুভাইর দেখা হবে। চমকিত হয়ে বললাম, কবে! সে বললে, 'তুমি যখন সত্যি, সত্যি, সত্যি খুব বুড়ো হয়ে যাবে আর শূন্যে মিলিয়ে যাবে।' এবার জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় দেখা হবে? সে তর্জনী আকাশের দিকে তুলে বললে, ওই ওপরে, ওপরে (দশ বার) স্বর্গে। শিশুর মনে কী ভাবনা খেলা করে কে জানে!

মুম্বাইতে অনেক কাজও করেছি। শুধু শরীর খারাপ আর মন খারাপ নিয়ে দিন কাটাইনি। পার্লামেন্টে একটি নতুন 'হজ' বিল পাশ করাতে হবে। বিলটি আমার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য এসেছিল। হজ বিল নিয়ে আমি মুম্বাইতে একটি কমিটি মিটিং ডেকে এসেছিলাম। একসময়ে হজযাত্রীদের জন্য মুম্বাই ছিল প্রধান কেন্দ্র। এই বিল পাশ হলে দিল্লি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। কমিটি থেকে আমরা বিভিন্ন মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। মুম্বাইর তাজমহল হোটেলে কমিটির বৈঠক চলছিল। আমি তখনও যাবার অবস্থায় নেই। কমিটির সব সদস্য বাড়িতে এসে আমাকে ওয়াকিবহাল করলেন। মুম্বাইবাসী সদস্যদের মধ্যে সুশীল সিন্ধে আর প্রভা রাও আমাকে বিশেষভাবে দেখতে এসেছিলেন। কলকাতায় ফিরে গিয়েও আমি প্রথম কমিটি মিটিং করলাম তাজ বেঙ্গলে বিষয় হজ বিল। হুইলচেয়ারে মিটিং-এ গিয়ে সভাপতিত্ব করলাম।

কলকাতা ফিরে গিয়ে আমার প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে হল জার্মানিতে আমার যে কনফারেন্স আছে তাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে কি না। অপারেশন-এর পর যেদিন আমার তিন সপ্তাহ হবে ঠিক তার পরদিনই কনফারেন্স। ডাক্তার বলে পাঠালেন, নিশ্চয় যাবে। তিন সপ্তাহ হয়ে গেলেই নর্মাল জীবন শুরু করতে হবে। তবে যেহেতু বিদেশযাত্রা, সঙ্গে কেউ গেলে ভাল হয়। সুগত সঙ্গী হতে রাজি। জুন মাসের নয় তারিখে পায়ে অপারেশন হয়েছিল, জুনের আটাশ তারিখে বার্লিন রওনা হয়ে গেলাম। কনফারেন্স পটসডাম শহরে। পৌঁছে দেখলাম যে হোটেলে থাকব কনফারেন্স সেখানেই। আমি ছাড়া ভারতীয় প্রতিনিধি কমলেশ শর্মা ও জেনারেল নাম্বিয়ার। দু'জনেই অত্যন্ত পরিচিত, আশ্বস্ত বোধ করলাম। ওয়াকার নিয়ে হেঁটে কনফারেন্স হল-এ প্রবেশ করি। কমলেশ শর্মা আর জেনারেল নাম্বিয়ার আমার কাছ থেকে

ওয়াকার নিয়ে বসতে সাহায্য করেন। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী অর্থাৎ পিস কিপিং ফোর্সের উপর ব্রাহিমি রিপোর্ট বার হয়েছে। ব্রাহিমি রিপোর্ট নিয়ে প্রচুর আলোচনা হল।

জার্মান পার্লামেন্টের সদস্যরা আমার সঙ্গে একটা বৈঠক করতে চাইলেন। এমন ব্যবস্থা হল যে হুইলচেয়ার আমাকে নিয়ে লিফটে করে একেবারে কনফারেন্স রুম-এর দরজায় পৌঁছল। ভারত-বন্ধু জার্মান পার্লামেন্টেরিয়ানরা সবাই উপস্থিত। খুব ভাল আলোচনা হল। আমাদের জামাই মার্টিন পাফ জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য, সেও উপস্থিত। অনিতাও বার্লিনে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আমাকে দেখাশুনোর সমস্যা রইল না। অনিতা আমাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুগত ভারমুক্ত হয়ে মার্টিনের সঙ্গে পটসডামের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য দেখতে বার হল। বার্লিনে তখন আমাদের রাষ্ট্রদূত রণেন সেন। রণেন সেন ও কল্পনার সঙ্গে তাদের গৃহে অনিতা, মার্টিন, সুগত ও আমি চমৎকার বাংলা লাঞ্চ খেলাম। জার্মানি ও ইয়োরোপের সব দেশই আমাদের তুলনায় মানুষের শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ও সহানুভূতিশীল। সদ্য অপারেশন করা হাঁটু নিয়ে তাই আমি সব কর্তব্য করে ফেললাম।

ফিরতি পথে লন্ডনে একটি সুন্দর আইরিশ হোটেলে কয়েকদিন কাটালাম। লন্ডনে সুমন্ত্রর বাড়ির যা সিঁড়ি তা আমার পক্ষে নিতান্ত অচল। অতএব সে ক'দিনের জন্য সুমন্ত্রও আইরিশ হোটেলবাসী হল। অধ্যাপক লেনার্ড গর্ডন সেখানে আমাদের সঙ্গে অনেক সময় কাটালেন। আমি আমার পার্লামেন্টারি কাজের কথা ভুলিনি। আমাদের বিদেশমন্ত্রক কমিটির অন্যতম কর্তব্য ছিল বিদেশে আমাদের দূতাবাস কেমন কাজকর্ম করছে তার দেখভাল করা। আমি যখন অন্য কাজেও বিদেশ যেতাম দূতাবাসের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতাম। এতে তাদের কোনও সমস্যা থাকলে জানতে পারতাম। যেমন রাষ্ট্রসংঘের কাজে গিয়ে আমি সেখানকার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে জানতে পারি আমাদের অফিসারের সংখ্যা আর একটু বাড়ালে ভাল হয়। রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক একই সঙ্গে করতে হয়। তখন অফিসাররা একবার এ বৈঠক আর একবার ও বৈঠক ছুটোছুটি করেন। ফিরে এসে আমি বিদেশমন্ত্রককে এ বিষয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। আর একবার নিউইয়র্ক কনসুলেট সম্পর্কে কিছু অভিযোগ কানে এসেছিল। কিন্তু আমি তার কিছুদিন পরে



পৌঁছে যখন তাদের সঙ্গে বৈঠক করলাম তখন দেখলাম যাদের সম্পর্কে অভিযোগ ছিল তারা অপসারিত হয়েছেন। সব কিছু ঠিকমতো চলছে। প্রকৃতপক্ষে তখনকার কনসাল-জেনারেল শ্রীমতী শশী ত্রিপাঠী খুব ভাল ভাবেই কাজকর্ম করছেন। বিদেশে দূতাবাসের অফিসারদের সঙ্গে মতের আদানপ্রদান করা আমি খুবই জরুরি মনে করতাম। লন্ডনে হাইকমিশনে ঢিলেঢালা কাজকর্মের একটা অভিযোগ অনন্তকাল থেকেই শোনা যায়। সব সময়ে যে তা সত্য তা হয়তো নয়। তবুও কে কর্তা তার উপর এ ব্যাপারটা অনেক সময়ে নির্ভর করে। লন্ডনে তখন হাইকমিশনার নরেশ্বর দয়াল। তিনি অফিসারদের সঙ্গে একটা বৈঠকের আয়োজন করলেন। বৈঠকের পরে আমি ওঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। লন্ডন থেকে কলকাতা আমি একাই এলাম। সম্বল ওয়াকার ও হুইলচেয়ার। সুগতর লন্ডনে একটি কনফারেন্স থাকাতে তাকে থেকে যেতে হল। এখন পিছন ফিরে দেখে কীভাবে আমি অপারেশন থেকে সদ্য উঠে এত কাণ্ড করেছিলাম ভেবে আশ্চর্য বোধ করি।

দেশে ফিরে আসা মাত্র আরোই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কেবলই প্লেনে ওঠা-নামা কলকাতা-দিল্লি, দিল্লি-কলকাতা করছি। নিজের লোকসভা কেন্দ্রেও ঘুরছি— কখনও বেহালা, কখনও বারুইপুর, কখনও মগরাহাট। ওদিকে পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশন চলছে। অন্যদিক থেকেও রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রধানমন্ত্রীর আবাসের 'পঞ্চবটী' গৃহে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের আসন্ন আগমন নিয়ে বৈঠক হল। আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখলাম হুইলচেয়ার নিয়ে লোক অপেক্ষা করছে। এর কিছুদিনের মধ্যে মুশারফের ভারতে আগমন। অনেক আশা জাগিয়ে আগ্রা শীর্ষবৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বিরোধী পক্ষ ও নিজের দলেরও কাছে সমালোচনার মুখে পড়লেন। আগ্রা বৈঠকের ব্যর্থতা নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক হল। পয়লা আগস্ট ২০০১-এর সেই বিতর্কে অংশ নিয়ে আমি বলেছিলাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনও ভুল করেননি। দু'দেশের যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর না দেওয়াও ঠিক কাজই হয়েছে। এই শীর্ষবৈঠক চলাকালীন সাংবাদিকদের সঙ্গে সরকারি যোগাযোগ আরও অনেক দক্ষতার সঙ্গে করা উচিত ছিল। সকলেরই মনে আছে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুশারফের সেই কুখ্যাত ব্রেকফাস্ট মিটিং। আমি বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহের উদ্দেশে বলেছিলাম উনি যে কাশ্মীর

আমাদের জাতীয়তার— নেশনহুডের—কেন্দ্রবিন্দু বলে বসলেন তা ঠিক হয়নি। এ কথাটা পাকিস্তান অন্যভাবে ব্যবহার করবে। তা ছাড়া আমি আরও বলেছিলাম বিদেশমন্ত্রীর মনে রাখা উচিত দেশের প্রতিটি রাজ্যেরই ভারতের জাতীয়তা বা নেশনহুডের প্রতি সমান অবদান আছে। যা হোক, এখন আমাদের কী কর্তব্য। অবশ্যই আবারও আলোচনায় বসতে হবে। তবে অপরপক্ষের এ ব্যাপারে কতটা ঔৎসুক্য আছে তা দেখে নিতে হবে। ইতিমধ্যে দেশের ভিতরে আমরা জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব— বিশেষ করে কাশ্মীরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে। উপসংহারে আমি বলেছিলাম— তাজমহল একদিনে তৈরি হয়নি, ভারত-পাক শান্তি ও মৈত্রী একদিনে হবে না, সময় লাগবে। দেখতে হবে কেউ যেন বলতে না-পারে আমাদের তরফে চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল।

নিজের লোকসভা কেন্দ্রের দেখাশুনো করা, পার্লামেন্টের নানান গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও বিতর্কে অংশ নেওয়া ছাড়াও অপর একটি কর্তব্য আমার উপর ন্যস্ত ছিল। কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কাজকর্ম পরিচালনা। শিশিরের আকস্মিক মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন প্রতিষ্ঠানটির ভার কর্নেল গুরুবক্স সিং ধীলনের আদেশে ও অন্যান্য সদস্যদের নির্দেশে আমার উপর এসে পড়ে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় শরৎচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা হয়। আমি পূর্ণ সাংমাকে অনুরোধ করলাম সে বছরের বক্তৃতার জন্য। সাংমা সাগ্রহে রাজি হলেন ও 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি নর্থ-ইস্ট' উত্তরপূর্ব ভারতের সমস্যা নিয়ে চমৎকার বক্তৃতা করলেন। সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল।

অবশ্য সে বছর সেপ্টেম্বরের সব চাইতে চমকপ্রদ ঘটনা হল নাইন-ইলেভেন। সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ড সেন্টারের যমজ টাওয়ার ধ্বংস হয়ে গেল। সেদিন সারাদিন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। সকালে আমাদের পুরো বিদেশ দপ্তর কমিটি নিয়ে গাজিয়াবাদের পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। গাজিয়াবাদের পাসপোর্ট বেশ গোলমেলে জায়গা, গুরুতর অভিযোগ ছিল। দুপুরে একটি ফরাসি ডেলিগেশনের সঙ্গে আলোচনা। ডেলিগেশনের নেতৃত্বে ছিলেন আঁদ্রে লাজোয়ানি (Lajoinie) ফরাসি ন্যাশন্যাল অ্যাসেমবলির বাণিজ্য কমিটির চেয়ারম্যান। সন্ধ্যায় ছিল জাপানি দূতাবাসে নিমন্ত্রণ। জাপানি রাষ্ট্রদূত হিরাবায়াশি আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, খবর শুনেছ! কী খবর! আমি



তখনও কিছু শুনিনি। কে যেন জিজ্ঞাসা করল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কি? হিরাবায়াশি বললেন— না, না সরাসরি আক্রমণ।

এর পরের কয়েক ঘণ্টা তো টেলিভিশনের সামনে থেকে আর নড়তে পারলাম না। বস্টন থেকে সুগতর ফোন, লন্ডন থেকে সুমন্ত্র। আমাকে ফোন করে কেউ কেউ সুগতর খবর নিলেন। যদিও সে নিউইয়র্কে নেই। অবশ্য সন্ত্রাসবাদীরা বস্টনের লোগান এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠেছে শোনা গেল। নিউইয়র্কের বন্ধুদের জন্য চিন্তা হচ্ছিল— লেনার্ড গর্ডন, স্নিগ্ধা মুখার্জি, মারিজুদ্দিন। পরে খবর পেলাম লেনার্ড গর্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে চড়ে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছিল— বাড়ি ফিরতে পথ আর পায় না। মারিজুদ্দিন গাড়ি চালিয়ে অফিসে যাচ্ছিল, সে প্রায় চোখের সামনে সব ঘটতে দেখেছে। এর অল্পদিনের মধ্যে পার্লামেন্টের কাজে ত্রিবান্দ্রম গেলাম। সেখানে কোভালম বিচে সমুদ্রতটে বসে চারিদিকে চেয়ে মনেই হল না পৃথিবীতে কোথাও হিংসা দ্বেষ আছে। সেখান থেকে কন্যাকুমারী যাবার কথা ছিল। বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য জায়গা— যাবার জন্য উৎসুক ছিলাম। কী কারণে যেন যাওয়া হল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। 'অদেখা কন্যাকুমারী'— Kanyakumari Unvisited বলে একটা সনেট লিখে ফেললাম।

শিশিরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী এসে পড়ল। সময় কারও জন্য বসে থাকে না। আমরা নেতাজি ভবনে জন্মদিন পালন করি, মৃত্যুদিন পালন করি না। তবু প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আমরা একটু অন্যরকম ভাবে পালন করলাম। আমার লেখা 'যে তরণীখানি' বইটি সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হল। বন্ধুবর কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নেতাজি ভবনে শিশিরের বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের সমাবেশে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করলেন। সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় সভা পরিচালনা করবেন আর শর্মিলা বইটি থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনাবে এই ছিল সূচি। অনেকদিনের পারিবারিক বন্ধু সংগীতজ্ঞ দিলীপ রায় উপস্থিত ছিলেন।

এই বার্ষিকীর দিন থেকে আমার বসুন্ধরা গৃহে প্রকৃত একাকী জীবন শুরু হল। বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসার পর আমার কন্যা ও তিন দৌহিত্র চার বছর আমাদের সঙ্গেই ছিল। তাদের জন্য উপযুক্ত আবাসের খোঁজ চলছিল কিন্তু মিলছিল না। অবশেষে পাওয়া গেল। সেই সন্ধ্যায় তারা বসুন্ধরা ছেড়ে তাদের নিজের গৃহে চলে গেল। ঠিক সেই দিনটি বেছে নেওয়া বোধহয় ঠিক ছিল না। তবে আমি সাহসের সঙ্গে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলাম।

আমার পার্লামেন্টারি কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে গেলাম। বিশাল লোকসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি লেগেই থাকে। বিদেশ দপ্তর কমিটির কাজেও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। জয়পুরে কমিটির অধিবেশন বসল। কাজ শেষ হবার পর শহরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। অম্বর প্রাসাদ দেখতে গিয়ে সেখানে যশোরেশ্বরীর কালীমন্দির আমার ভাল লাগল। মহারাজ মানসিং যশোর থেকে দেবীমূর্তি এনে এখানে স্থাপনা করেছিলেন। বর্তমান মহারাজা ভবানী সিং তার চন্দ্র প্যালেসে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেও তো এককালে রাজপ্রাসাদ ছিল। চমৎকার একটি সুইটে থাকতে দিয়েছে। লাগোয়া বারান্দায় ঝোলানো দোলনাতে দুলতে দুলতে নানা কথা চিন্তা করি। অপর্ণা সহায় তার দুই বাচ্চা নিয়ে দেখা করে গেল। অপর্ণা আমার পালিতা কন্যাদের অন্যতম। আমার জয়পুরওয়ালি বেটি। পৃথিবীর আরও কোনও কোনও শহরে আমার এরকম কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে আছে। দোলনায় দুলতে দুলতে দেখি আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, তারপর নামল ঝমঝম বৃষ্টি।

আমরা দলের এম পি-রা ব্যক্তিগত ভাবে যে যার কাজকর্ম করে চলেছিলাম কিন্তু দল হিসেবে ২০০১ সালের শুরু থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস নানা সংকটের মধ্যে পড়েছিল। তৃণমূল তার জন্মলগ্ন থেকেই সাধারণ মানুষের মনে আশা জাগিয়েছিল। মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে পশ্চিমবাংলায় একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হতে চলেছে। গণতন্ত্রে মানুষ মাঝে মাঝেই বদল প্রত্যাশা করে। পশ্চিমবঙ্গে তার কোনও লক্ষণ নেই। এই সময়ে কংগ্রেস থেকে মমতার বেরিয়ে আসা, তার পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, রাজনীতির বাইরে থেকে কিছু মানুষকে নিয়ে আসা সবই মানুষ সাগ্রহে লক্ষ করছিল। ঠিক এমনি সময়ে মমতা এমন একটা পদক্ষেপ নিল যা মানুষ ঠিকভাবে গ্রহণ করল না। মমতা তখন রেলমন্ত্রী, সবে দ্বিতীয়বার রেলবাজেট পেশ করেছে এমন সময় আমাদের হতচকিত করে সে রেলমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বসল। এন ডি এ জোট থেকেও সে বেরিয়ে গেল। তেহেলকা কেলেঙ্কারিকে এর কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। এন ডি এ জোটের আহ্বায়ক জর্জ ফার্নানডেজ-এর নাম এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত হওয়াতে মমতা জর্জ ফার্নানডেজ-এর পদত্যাগ দাবি করল। তৃণমূলের অন্যতম এম পি আকবর আলি খোন্দকারের বাড়িতে আমাদের মিটিং হল। প্রথমে আলোচনায় স্থির



হল মমতা আর অজিত পাঁজা মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করবে। বিক্রম সরকার প্রস্তাবটি লিখছিলেন, তিনি সেই পর্যন্ত লিখলেন। এন ডি এ ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথাটা কখন প্রস্তাবে ঢুকল কেউ ভাল বুঝতে পারল না। সেদিন রাত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাজপেয়ীজি একটি ব্যাংকোয়েট দিয়েছিলেন। ডিনারের শেষে সবাই যখন ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি বাজপেয়ীজি আমার পাশে পাশে হাঁটছিলেন। তিনি নিম্নস্বরে আমাকে বললেন, মমতা তো আবার আমাকে মুশকিলে ফেলছে, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো। আমি বললাম নিশ্চয় বলব। বাড়ি ফিরেই সোজা ওপর তলায় ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলাম। কথা হল। কিন্তু মত পরিবর্তন হল না। সকালবেলায় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ফোন এল, আমার অক্ষমতা জানালাম। তবু আশা ছাড়িনি— কলকাতায় দু'-একটা ফোন করলাম যাদের কথা ও শুনলেও শুনতে পারে। ইতিমধ্যে ও নতুন করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাধার কথা ঘোষণা করল।

বিজেপি-র চাইতে আদর্শগতভাবে কংগ্রেস ও তৃণমূল অনেক কাছে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ দুই দলে জোট হওয়া তাই যথেষ্ট ইতিবাচক হতে পারত। কিন্তু যেভাবে তাড়াহুড়ো করে কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এই জোট হল তাতে ফল হল বিপরীত। আর দু'মাস পরে পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। এত কম সময়ের মধ্যে কেন-ই বা মমতা কংগ্রেস ভেঙে চলে গিয়েছিল, কেনই-বা আবার জোট করল এসব কথা মানুষকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব ছিল না। আর বুঝিয়ে বলা যাবে কীভাবে মমতা কেন এমন করল সে বিষয়ে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে নানারকম গুজব ছড়িয়েছিল। কেউ বললে ও এমনিতেই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিত তেহেলকা কেলেঙ্কারি একটা অজুহাত হিসেবে কাজ করল। একটা খুব অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। সুদীপ ও তার স্ত্রী নয়না মমতার নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছিল। সুদীপের ছেড়ে আসা বিধানসভা আসনে নয়না উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল। সামনের নির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থন পেলে জয় সুনিশ্চিত হয়। নয়না জিতেছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমার হাস্যকর মনে হয়েছিল। স্বীকার করতে হবে অনেকের কাছে একথা শুনতে হয়েছিল আমি বিশ্বাসযোগ্য মনে না করলে কী হবে। এভাবে রেলমন্ত্রক ও বিজেপি জোট ছেড়ে আসা যে ভুল হয়েছিল তা মমতা পরে নিজেও বুঝতে পেরেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০১-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ফল হল খুব খারাপ। কোথায় বিকল্প সরকারের স্বপ্ন, তৃণমূলের ভাগ্যে এল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৬০টি।

মমতা ঘরে দরজা দিল। আমি দেখলাম আমি কলকাতার রাজপথে এন ডি টি ভি-র ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, পাশে বিজয়ী সি পি এম-এর পক্ষে বিমান বসু। আমাদের পরাজয়ের, বলা যায় বিপর্যয়ের, কারণ আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে। বিমানবাবুকে কনগ্র্যাচুলেশনস বলে শুরু করলাম। আমাদের আকস্মিক জোট পরিবর্তন ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কথাও বললাম। প্রয়োজন না-থাকলেও সি পি এম রিগিং করেই চলে। সেবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কোথাও অকল্পনীয় ভোটের ব্যবধানে সি পি এম প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। তবে পরাজয়ের পর এসব কথা তুলে কী লাভ। আমি আত্মসমালোচনাতেই থাকলাম।

এই বিধানসভায় প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে নির্বাচনি রণনীতি সবকিছু তৃণমূল কেমন যেন দিশাহীন ভাবে করছিল। আমার পার্লামেন্টারি এলাকার সাতটির মধ্যে একটি যাদবপুর। যাদবপুর বিধানসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্বাচিত হন। সেকথা মনে রেখে আমি মমতাকে বললাম যাদবপুরের জন্য ভেবেচিন্তে জবরদস্ত প্রার্থী দিয়ো। তখন আমরা কংগ্রেস-তৃণমূল জোট জিতলে মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরে নির্বাচনি প্রচার করছি। একদিন আমি মমতাকে বললাম যাদবপুরের জন্য আমার পছন্দের প্রার্থী কে জানো? নাম বলব? মমতা বললে, কী নাম। আমি বললাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিহাস নয় আমি খুব সিরিয়াস ভাবে বলেছিলাম। তোমাকে তো আমরা মুখ্যমন্ত্রী প্রোজেক্ট করে নেমেছি, ওদিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, সরাসরি হয়ে যাক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মমতা জিতবে। ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমি প্রায় ষোলো হাজার ভোটে যাদবপুর সেগমেন্টে এগিয়ে ছিলাম। পরের বার ওরা অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ছ'হাজার ভোটে এগিয়ে রইলাম। আমার মনে হয়েছিল মমতা সেখানে হইহই করে এগিয়ে থাকবে। মমতা বলেছিল, তা হলে সারা রাজ্যে নির্বাচনি প্রচার কে করবে!

একদিন সকালে আমি খবর কাগজ খুলে স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম যাদবপুরের জন্য মমতা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রতিভাময়ী



অভিনেত্রী হিসেবে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের আমি একজন অনুরাগী। কিন্তু যাদবপুর বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে তিনি একেবারে উপযুক্ত নন একথা সকলের জানা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ঘিরে একটি বাম মনোভাবাপন্ন অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্পী, লেখকদের যে পরিবৃত্ত আছে মাধবী তাদেরই একজন। অন্তত লোকে তাই জানে। রাজনীতিতে 'পারসেপশন' অর্থাৎ লোকে কী ভাবে তার গুরুত্ব অনেক। যাদবপুরের তৃণমূলের কর্মী, নেতা, ক্যাডার আমার বাড়িতে ভিড় করল। কেউ মাধবী মুখোপাধ্যায়ের জন্য কাজ করবে না। কী মুশকিল। মমতার আস্তানা তখন নিজাম প্যালেস। সেখানে আমি দৌড়োলাম যদি শেষ মুহূর্তেও কিছু করা যায়। মমতার সঙ্গে তার তখনকার সব সময়ের সঙ্গী নয়না বসেছিল। সে বললে, মাধবী আন্টি দারুণ ফাইট দেবে। আমি ফিরে এসে কর্মীদের বোঝাতে বসলাম, কয়েকদিন ধরে কথা বলে, অনেক বুঝিয়ে আমি তাদের মানিয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে সাংবাদিকরা বুদ্ধদেববাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল আজ নিশ্চয় আপনি মমতার উপর খুব প্রসন্ন। সে থালায় করে নিজের হাতে যাদবপুর আসনটি আপনাকে তুলে দিল।

মমতা সিদ্ধান্ত নিল সে আবার এন ডি এ-তে ফিরে যাবে। ছেড়ে আসার ফলে আমাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড় ধরেছিল। পরাজয়ের পর ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মানুষ ভালভাবে নিল না। এরপর মমতার মন্ত্রীসভায় ফিরে যাওয়া বা না-যাওয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন নাটক চলল। মমতার প্রতি বিজেপি-র আগের মতো পূর্ণ আস্থা আর রইল না। নীতিশকুমার মমতার জায়গায় তখন রেলমন্ত্রী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী মমতাকে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে নিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু মমতা দাবি করল তাকে রেলমন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। এই দাবি মানা বিজেপি-র পক্ষে অসম্ভব। নীতিশকুমারকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। রেলমন্ত্রকের বদলে নানারকম মন্ত্রক মমতাকে ওরা দিতে চাইলেন। সেই সময়ে আমি মমতাকে বলেছিলাম গ্রামীণ উন্নয়ন অর্থাৎ রুরাল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রকটি যেন সে গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে রাজ্যের অনেক উন্নতি করার সুযোগ আসবে। তা ছাড়া সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিন্তু মমতা জেদ ধরে রইল সে রেল ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করবে না। এর বেশ অনেকদিন পর অবশ্য সে কয়লামন্ত্রক গ্রহণ করেছিল। বারবার নানারকম মত বদলের জন্য পরবর্তীকালে বেশ রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছিল।

শীতকালে নানারকম ডেলিগেশনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলতে থাকল। তবে সে সময়ে আফগানিস্তানের অবস্থা নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন চলেছে। আমেরিকানদের হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রবল বাদানুবাদ চলেছে। আমি আমেরিকান অ্যামবাসাডর ব্ল্যাকউইলকে আমার কমিটিতে এসে আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে বললাম। বিদেশমন্ত্রকের ব্যুরোক্রেসি প্রথমেই আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে কমিটিতে ডাকা সমীচীন কিনা প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমার মনে হল এবার আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে সুযোগ দেওয়া উচিত। অ্যামবাসাডর খলিলি তখনও পুরো সুস্থ হননি। আমি ওর জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করলাম। ওর সৌম্য চেহারা ও শান্ত বক্তব্য সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। ২০০১-এর ১৩ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্ট ভবনের উপর আতঙ্কবাদীদের সশস্ত্র আক্রমণ হল।

আফগানিস্তান নিয়ে আমাদের এই আলাপ আলোচনা পর্বের শেষে আমি কাবুলে আমাদের রাষ্ট্রদূত সতীশ লাম্বাকে ডেকেছিলাম। অ্যামবাসাডর লাম্বা খুব ভাল একটা প্রেজেন্টেশন কমিটির কাছে দিয়েছিলেন। ২০০১-এর ১৩ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্ট ভবনের উপর আতঙ্কবাদীদের সশস্ত্র আক্রমণ হল।

বেশ এক ঘটনাবহুল শীতকালীন অধিবেশন শেষে বড়দিনের সময়ে কলকাতা ফিরলাম। জানুয়ারি মাসে নেতাজি ভবনে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। তা ছাড়াও আছে লোকসভা কেন্দ্রের কাজ। বিষ্ণুপুরে গ্রামীণ মেলা বসে। প্রতিবারের মতো এবারও গেলাম। তরি-তরকারি থেকে ফলমূল নানারকম পসরা। বিষ্ণুপুরে আমার কর্মী সুফল। আমার এম পি উন্নয়ন তহবিল থেকে কোথায় কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করি। ইস্কুল ও পানীয় জল ছাড়াও আমার তহবিল থেকে বিদ্যুৎ-এর জন্য আমি প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম। খুব ইচ্ছা হত ঘরে ঘরে আলো পৌঁছক। কাজটা তো করতে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে। অনেক সরকারি গড়িমসি কাটিয়ে ধীর লয়ে হলেও অনেক গ্রামে রাস্তাঘাটে আলো পৌঁছয়। কিন্তু জানতে পারি গরিব মানুষ তাদের বাড়িতে আলো নিতে পারেন না। তার জন্য যেটুকু খরচ তা তার সাধ্যের বাইরে। আমি নিরুপায়।

বেহালাতে মোটরগাড়ির র‍্যালি উদ্‌বোধন করতে গেলাম। নানান মডেলের গাড়ি। শহরে ও গ্রামে ছবি কিছু আলাদা। নেতাজি ভবনে সেবার অধ্যাপক রণজিৎ গুহ নেতাজি অরেশন দিলেন। তিনি নেতাজির অসমাপ্ত আত্মজীবনী



ভারতপথিকের উপর চমৎকার বিশ্লেষণী বক্তৃতা করলেন। ভিয়েনা প্রবাসী এই অধ্যাপক সুগতকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, পারিবারিকভাবে আমাদের সকলের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। সে বছর নেতাজির জন্মদিনের সময়ে আমি ষোলোটি আফগান ছাত্রকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলাম। এরা ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে দিল্লির নানা কলেজে পড়াশুনো করে। এরা নাচ-গান করে নেতাজির জন্মদিনের সকাল জমজমাট করে তুলল। তারপর আমি তাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে বসিয়ে দিলাম। তারা তাদের পড়াশুনো ও নানাবিষয়ে মতবিনিময় করল। দু'পক্ষই একে অপরের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না। কিছুক্ষণ পরে নেতাজি ভবনের শরৎ বসু হল-এ তাদের আড্ডায় ফিরে এসে দেখি তারা একসঙ্গে হয়ে নাচ-গান করছে।

এর মধ্যে দু'-একবার দিল্লিতে ডাক পড়ল। বিদেশি ডেলিগেশন ও ভি আই পি আগমন লেগেই থাকে। এইসময়ে টোনি ব্লেয়ার এসেছিলেন। ফেব্রুয়ারির দু' তারিখে শিশিরকুমার বসুর জন্মদিনের উৎসব পালন করেই আমি মুম্বাই পাড়ি দিলাম। নিউইয়র্ক থেকে ডা. রানাওয়াট এসেছেন আমার দ্বিতীয় হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করবেন। বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করে বললে, এবার তো আর তোমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেই। কারণ তার দ্বিতীয় হাঁটু তো হয়ে গেছে। ওর তো আর তৃতীয় হাঁটু বা 'থার্ড নি' নেই। সে সময়ে পার্লামেন্টে একটা হাসির গল্প বা জোক চালু হল। কেউ বললে প্রধানমন্ত্রীর 'থার্ড নি' আছে বইকী— কেন আদবা—নি! আরও একবার সকলে আমার সঙ্গে দাঁড়াল। সুগত সঙ্গে আছে। এরিন ব্রোচা আবারও সর্বক্ষণের সঙ্গী। ডা. লড, ফিজিয়োথেরাপিস্ট কবিতা মেনডেন, মুম্বাই বিমান বন্দরে আসা-যাওয়ার পথে দেখাশুনোর ভার নিয়েছেন মি. ঘোরাই।

মুম্বাইতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন শ্যাম বেনেগাল। তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ওপর একটা ছবি করবেন। সে বিষয়ে সুগত ও আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। ওর সঙ্গে শিশিরের খুবই পরিচয় ছিল। যখন উনি নেহরুর উপর ছবি করছিলেন তখন নেতাজি ভবনে এসেছিলেন। উনি শিশিরকুমার বসুর একটি সাক্ষাৎকার সেই সময়ে রেকর্ড করেছিলেন। ওর নেতাজি স্ক্রিপ্ট-এর লেখক সামা জাইদি ও অতুল তিওয়ারির সঙ্গেও পরিচয় হল। আমি বললাম ওর নেতাজি ছবির জন্য যা সাহায্য লাগে ছবি, ফিলম, দলিলপত্র ইত্যাদি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো সবরকম সাহায্য করবে। সুগত আর

আমি বলাবলি করলাম শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় নেতাজির উপর একটি পূর্ণ দৈর্ঘের চিত্র হতে চলেছে জানলে শিশিরকুমার অত্যন্ত প্রীত হতেন। তবে আমি শ্যামকে সাবধানও করে দিয়েছিলাম যে যারাই নেতাজিকে নিয়ে ফিলম করেন, বই লেখেন বা অন্য কাজ করেন তাদের কপালে ভোগান্তি থাকে। এর আগে হেমেন গুপ্ত ফিচার ফিলম করে অনেক বিপাকে পড়েছিলেন। হেমেন গুপ্ত যথেষ্ট খ্যাতনামা ফিলম ডিরেক্টর ছিলেন, তার ১৯৪২ ছবি মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছিল।

অস্ত্রোপচারের পর কলকাতায় ফিরে এসে দু' সপ্তাহ বিশ্রাম। দিনের বেলায় একজন নার্স আমার সেবার ভার নিল। আমার পাড়ার কেবল অপারেটর আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ফোন করে বলল, আপনার জন্য আমির খানের 'লগান' লাগিয়ে দিই, বাড়িতে বসে দেখবেন। টিপু আর সুগত আমার সঙ্গে 'লগান' দেখতে যোগ দিল। দুই পায়ে অস্ত্রোপচার হয়ে যাবার পর আমি শারীরিক ও মানসিক ভাবে অনেক ভাল বোধ করতে লাগলাম। স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারার অনুভূতিই আলাদা। যেন নূতন করে জীবন লাভ হল। লোকসভার ২০০২-এর মোটা ডায়েরিতে পয়লা বৈশাখে আমি আমার নবজন্মের কথা লিখলাম।

মে মাসের শেষে আর একবার রাষ্ট্রসংঘে গেলাম, একটি ছোটখাটো কনফারেন্স-এ যোগ দিলাম। বিজয় নাম্বিয়ার এসে দেখা করে গেলেন। উনি তখন রাষ্ট্রসংঘে আমাদের মুখ্য প্রতিনিধি হয়েছেন। তারপর বস্টনে চলে গিয়ে ছুটি কাটালাম। খুব আনন্দে কাটল। কারণ তিন দৌহিত্র সঙ্গে ছিল। টিপুর জন্মদিন আমাদের পারিবারিক বিশেষ দিন। ওদের চলে যাবার কথা, আমরা তাই দু' দিন এগিয়ে নিয়ে এসে ওর জন্মদিন পালন করলাম। সুগত, আয়েষা, বাচ্চারা, আমি কেক কেটে হইচই করলাম। তবে সেসময়ে আমেরিকা ও ইয়োরোপে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল যে ভারত-পাক যুদ্ধ আসন্ন। আমরা দু'দেশই পরমাণু শক্তিধর। তাই কী যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবে কে জানে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের ভারতীয় উপমহাদেশে যেতে বারণ করা হল। তাদের সব কূটনীতিকদের পরিবার পরিজনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হল! ইংল্যান্ড সরকারিভাবে ব্রিটিশ নাগরিকদের ভারত বা পাকিস্তান যাওয়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসল। ফলে আমার তিন দৌহিত্র ইংল্যান্ডে আটকে গেল। বস্টন থেকে আমি মাঝে মাঝেই ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূত ললিত



মান সিং আর লন্ডনে হাইকমিশনার রণেন সেনের সঙ্গে অবস্থা কী কথা বলি। ওরা দু'জনেই এই অহেতুক ভীতি কাটাবার চেষ্টা করছেন। আমিও আমেরিকান বন্ধুবান্ধবদের আশ্বস্ত করি আমরা মোটেই যুদ্ধ করব না। তারা বিশ্বাস করে না। বলে, দু'পক্ষের সৈন্যসামন্ত সীমান্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যে-কোনও সময়ে কিছু ঘটে যেতে পারে। আমি বুঝিয়ে উঠতে পারি না যে, আমাদের মাঝে মাঝে এরকম 'নারদ নারদ' অবস্থা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সুকুমার রায়ের ভাষায়— 'ভেরি সরি, ভাই মশলা খাবি' বলি।

দেশে ফিরে চেন্নাইতে একটা মিটিং সেরে আমরা কমিটির বেশ কয়েকজন তিরুপতি গেলাম। গাড়িতে চারঘণ্টা লাগল। অন্যদের সঙ্গে সেবার রেণুকা চৌধুরী ছিলেন। রেণুকার চেহারা খুব আকর্ষণীয়। আমি তাকে মাঝে মাঝেই বলতাম, তুমি এখানে কী করছ, তোমার জায়গা বলিউড। ও হেসে বলত জানো তো আমি একসময়ে খুব রোগা ছিলাম এখন মোটা হয়ে পড়েছি।

তিরুপতিতে পৌঁছে মনটা শান্ত হয়ে গেল। চারিদিক অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আমাদের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো অপরিষ্কার নয়। সকলে খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটছে। এখানে অনেকেই মাথার চুল উৎসর্গ করে। তাই অনেকের মাথা ন্যাড়া। পরদিন মন্দিরে দর্শন হল। শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্রধারী বিষ্ণু। চোখ কাপড়ে বাঁধা। ভক্ত ও ভগবানে দৃষ্টি বিনিময় হল না। শুনলাম বিশেষ দিনে চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। অজস্র ভক্ত লাইন দিয়ে দর্শন করছেন। এম পি হবার সুবাদে লাইন থামিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হল দর্শনের। শুনেছি তিরুপতির ঠাকুর অত্যন্ত জাগ্রত। ভক্ত যা চান বাসনা পূর্ণ হয়। তাই তো কী চাই! জ্ঞান, ভক্তি, দেশের কল্যাণ? শেষ পর্যন্ত সব মায়েদের মতোই তিন ছেলেমেয়ের মঙ্গল কামনা করলাম।

সে বছরের অর্থাৎ ২০০২ সালের সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল গুজরাটের দাঙ্গা। সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। আমি লোকসভার উইমেনস এমপাওয়ারমেন্ট কমিটির সদস্য। এই কমিটি থেকে আমরা একদল গুজরাটের অবস্থা দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম ও শুনলাম তা এককথায় হৃদয় বিদারক। আমেদাবাদ ও বরোদায় সব ত্রাণশিবির ঘুরে দেখলাম। তার মধ্যে শাহ্ আলম ক্যাম্প, পাঁচমহল সবই ছিল। পুলিশ অফিসারদের কমিটিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। তারা যেন কেমন নির্বিকার। এই কমিটির চেয়ারপার্সন

মার্গারেট আলভা। সর্বদলীয় কমিটি। আমি দেখলাম মার্গারেটের প্রশ্ন করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। চেয়ারপার্সনকে নিরপেক্ষ থাকতে হয়। বিজেপি-র সদস্যরা কোনও কঠিন প্রশ্ন হলে ওর নিরপেক্ষতায় সন্দেহ প্রকাশ করছে। তখন অপ্রিয় প্রশ্ন করার ভার আমি নিলাম। আমি সরকারের শরিকদলের সদস্য। দেখলাম মহিলাদের ওপর অত্যাচারের কথা অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে। শত শত মানুষ একসঙ্গে হয়ে ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছে, লুটপাট করেছে— এসব ঠিক অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা তো ত্রাণ শিবির ঘুরে এসেছি, মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পাঁচমহল ত্রাণ শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল জয়ন্তী রবি, গোধরার সে জেলাশাসক। দেখে ভাল লেগেছিল একজন মহিলা শাসক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সাহসের সঙ্গে কর্তব্য করার চেষ্টা করছেন। আমরা চলে আসার অল্পদিনের মধ্যে তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে আমার বছরখানেক পরে লন্ডন শহরে দেখা হয়। সেদিন আমরা আজকের দেখা হওয়া আর দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাটে দেখা হওয়াতে কত তফাত বলাবলি করছিলাম।

অটলবিহারী বাজপেয়ী গুজরাটের দাঙ্গাকে 'জাতীয় কলঙ্ক' আখ্যা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'রাজধর্ম' পালন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বীকার করেছিলেন সকল প্রজার দিকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়নি। কিন্তু আমেদাবাদে তিনি জোর গলায় যা বলেছিলেন গোয়াতে তাদের পার্টির বৈঠকের পর সুর নরম করে ফেলেন। হতাশ হয়েছিলাম। পার্লামেন্টের বক্তৃতায়, অনেক টিভি সাক্ষাৎকারে আমি বারবার বলেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর উচিত নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করা, আরও অনেক বেশি assertive হওয়া। টিভি-তে সর্বদলীয় কোনও আলোচনা হলে আমাকে নিয়ে বিপাকে পড়তে হত। হয়তো রাজীবপ্রতাপ রুডি সরকারের সমর্থনে গুজরাট নিয়ে কিছু বলছেন। শরিক হিসেবে আমার তাকে সমর্থন করার কথা। আমি যা বলছি তাতে উৎসাহিত হয়ে অমর সিং চিৎকার করছেন, তোমার শরিক কী বলছে শোনো— আমরা বলছি না— ইওর অ্যালাই!

আমেদাবাদে, বরোদাতে আমি ত্রাণশিবির ছাড়াও কিছু উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তারা নিজের বাড়িঘর ছেড়ে আত্মীয় বা বন্ধুদের বাড়ি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে ওঁরা বললেন, এই প্রথম কোনও হিন্দু আমরা কেমন আছি দেখতে এল।



তারা তখনও ঘোরের মধ্যে আছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করেছেন তারা রাতারাতি শত্রু হয়ে যাবে। সাধারণত দাঙ্গাহাঙ্গামায় গরিব মানুষ মরে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুজরাটের দাঙ্গায় কিন্তু উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজের ওপর আঘাত এল। অনেকে ভাল ব্যবসা করতেন, সর্বস্বান্ত হলেন। প্রাক্তন সাংসদ খুন হলেন নিজের বাড়িতে। গুজরাটে অনেক সময় নাম দিয়ে কে কোন ধর্মের বোঝা যায় না। গান্ধি পদবি হিন্দু বা মুসলমান যে কারও হতে পারে। কিন্তু দাঙ্গার সময়ে দেখা গেল দুষ্কৃতীরা ঠিক জানে কে অপর ধর্মের। ঠিক জায়গাতেই তারা আক্রমণ চালিয়েছে।

ফিরে গিয়ে পার্লামেন্টে আমি একটা আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেছিলাম। তখন পুনর্বাসন নিয়ে বিতর্ক চলছে। আমি বলেছিলাম পুনর্বাসন মানে তো মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন আর এক পাত্র খিচুড়ি নয়। পুনর্বাসন মানে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা, মন থেকে ভীতি দূর করা। দেখেছিলাম মেয়েরা ত্রাণশিবির থেকে ঘরে ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। অবশ্য যাদের ঘর আছে, অনেকের বাড়িঘর আর নেই। আমার বক্তৃতায় আমি বললাম, আজকাল প্রায়ই গুজরাতি অস্মিতা বলে একটা কথা শুনতে পাই। আমার দেখা হওয়া সেইসব ধনী মুসলমান পরিবারের কথা উল্লেখ করে বললাম, এরাও সেই অস্মিতার অংশ। এরা গুজরাটি বলে গৌরব বোধ করেন। তারা এখানে জন্মেছেন, এখানে বড় হয়েছেন। আজ তারা বিচ্ছিন্ন বোধ করছেন। এদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আমার ভয় ভয় করেছে। আমি দেখেছি এদের মনের মধ্যে এক চাপা ক্রোধ আর গভীর বিচ্ছিন্নতা বোধ গুমরে মরছে। পুনর্বাসন মানে তাদের হৃত সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া আর তাদের নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে দেওয়া। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই কিন্তু ভবিষ্যতের আতঙ্কবাদ জন্ম নেয়।

গুজরাটের পরিস্থিতির ফলে আমার এক গভীর ব্যক্তিগত সংকট হল। গুজরাট নিয়ে বিজেপি-র বা বলা চলে এন ডি এ সরকারের নীতি আমি কোনওমতেই সমর্থন করতে পারব না। কিন্তু মমতার এই ব্যাপারে একটা দোলাচল মনোভাব আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমি তাকে একজন একান্ত সেকুলার ও সংখ্যালঘু দরদি মানুষ হিসেবে চিনি। গুজরাটের কাণ্ড যে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক ঘোর কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে তা কি সে বুঝতে পারছে না। নাকি সে নূতন করে আর

বিজেপি-র সঙ্গে সংঘাতে যেতে চায় না। একবার বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে, ফলে পূর্ণ আস্থা হারিয়েছে। ক্যাবিনেটে ফিরে যাওয়া নিয়ে একটা চাপান-উতোর চলছে। কিন্তু মমতাকে আমি যতটুকু চিনি সে তো কোনও কিছুর পরোয়া করে না। তবে সে গুজরাটের মতো সমর্থনের অযোগ্য ব্যাপারে আরও জোর গলায় কেন প্রতিবাদ করতে পারছে না। মমতা আমাদের দলের সাংসদদের একটা মিটিং ডেকেছিল। এমনিতে ও নিজেই বেশির ভাগ ব্যাপারে কী করা হবে স্থির করে ফেলে। গুজরাট নিয়ে কিন্তু পার্লামেন্টের তিনতলায় ছোট অফিস ঘরে মিটিং ডাকল। সবাইকে ও এক এক করে জিজ্ঞাসা করল, সুদীপদা-রঞ্জিতদা- বিক্রমদা-দীনেশদা....? আমার সঙ্গে কেউ একমত হলেন না। গুজরাট নিয়ে ভোট হবে আমাদের কী করণীয়! আমার মত আমরা বিপক্ষে ভোট দেব নয়তো ভোটদানে বিরত থাকব। আর একবার আমি আমার দলকে বুঝিয়ে 'পোটা' আইন-এর সময়ে ভোটদানে বিরত রাখতে পেরেছিলাম যদিও সমর্থনের জন্য হুইপ জারি হয়ে গিয়েছিল। এবার দলকে মানাতে পারলাম না। মমতা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। সে বারবার বলতে লাগল, কৃষ্ণাদি আপনি বিচলিত হবেন না। দেখবেন বিতর্কের সময়ে আমি কীরকম জোরালো প্রতিবাদ করব। আমি নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ চাইব। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না প্রতিবাদ করে, পদত্যাগ চেয়ে তারপর সরকারের পক্ষে ভোট দিলে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার কী বাকি থাকবে! আমি বলেছিলাম, তবে তুমি মায়াবতী হয়ে যাও। এই সমর্থনের বদলে তোমার দাবি পেশ করো, তোমাকে পুরনো দপ্তর ফিরিয়ে দেবে কি? যদি তেমন কিছু না হয় কেন তুমি আগ বাড়িয়ে এরকম একটা অসমর্থনযোগ্য ব্যাপারে তোমার সমর্থন দেবে? কিছু করা গেল না। সরকারকে সমর্থনের জন্য হুইপ জারি হল।

দলের হুইপ অমান্য করলে দলবিরোধী আইনের কবলে পড়তে হয়, সদস্য পদ খারিজ হয়ে যায়। আমি সে রাত্রে অনেক চিন্তা করলাম। হুইপ অমান্য করে বহিষ্কৃত হয়ে গেলে কেমন হয়। কেমন যেন অতি নাটকীয় শোনাচ্ছে। শুভার্থীরা বললেন, তুমি চলে গেলে গুজরাটের সম্পর্কে সরকারের পলিসি কিছু পালটাবে না। মাঝখান থেকে আমরা একজন ভাল সাংসদ হারাব। ভিতরে থেকে হয়তো কোনও কাজে লাগতেও পারো। আমি পারিবারিক ভাবে মহান পূর্বপুরুষদের কথা মনে করলাম। তারা কখনও আপোশ করেননি,



তার জন্য রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র বসু ভারত ভাগ ও বাংলা ভাগ রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। দেশভাগ রোধ করতে পারেননি। বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনে যে ভূমিকা তার প্রাপ্য ছিল তার থেকে বঞ্চিত হলেন। সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস সভাপতি হলেন। কিন্তু গাঁধীজি ও দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত কোনও কাজ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করার এই সময়। একথা সুভাষচন্দ্র তার নিজের দলকে মানাতে পারলেন না। দেশের বাইরে চলে গিয়ে তবেই তিনি তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সুযোগ পেলেন। এরা বিরাট ও মহৎ ব্যক্তিত্ব। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের শুধু মনে হল রাজীব গাঁধীর আমলে যে দলত্যাগ-বিরোধী আইন পাশ হয়েছিল তা না-হলে ভাল হত। আমরা এই আইনের বলে এম পি কেনাবেচা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে একজন সৎ, বিবেকবান সাংসদের নিজের বিবেচনা ও বিবেক অনুযায়ী ভোট দেবার ক্ষমতাও হরণ করা হল। যে ব্রিটিশ ওয়েস্ট মিনিস্টারের ধাঁচে আমাদের গণতন্ত্র তাতে এরকম কিছু নেই।

গুজরাট নিয়ে বিতর্ক গভীর রাত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে আমি পার্লামেন্টের বাইরে যেতে চাইলাম। সকলে সমস্বরে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। যে-কোনও সময়ে ভোটের জন্য ঘণ্টা বাজতে পারে। আমার দলের চিফ হুইপ সুদীপকে আমি আমার মোবাইল নম্বর দিয়ে বেরিয়ে এলাম। একটি কূটনীতিকদের সমাবেশে নিমন্ত্রণ ছিল। মন-মেজাজ ভাল নেই। আমি হলঘরের এক কোণে বেজার মুখে বসেছিলাম। অনেকবার মিডিয়াকে আমার মতামত বলার ফলে ডিপ্লোম্যাটরা আমার মনের ভাব জানতেন। একজন বিদেশি ডিপ্লোম্যাট একটি ক্ষুদ্র ক্রিস্টাল পাত্রে জাপানি সাকে নিয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার মনের বেদনা এই পেয়ালায় ডুবিয়ে দাও!

বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তেলেগুদেশম শত শত মন চাল ঘরে তুলল। বিরোধিতা করে ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর ওমর আবদুল্লা যেমন মন্ত্রিত্বে ছিলেন তেমন রইলেন। শরিক দলের মধ্যে তৃণমূল সমর্থন দিয়ে শূন্য হাতে রইল এবং এরজন্য ভবিষ্যতে দলের অনেক ক্ষতি হল।

তাইপে-র একটা কনফারেন্স-এ যোগ দিতে আমার আমন্ত্রণ এল আগস্ট

মাসে। বিষয়— গণতন্ত্র। তাইওয়ানের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। মন্ত্রীরা ওদেশে যেতে পারেন না। এমনকী কোনও বিশিষ্ট ভারতীয় ওদেশে গেলে চিনদেশ রাগ করে, সরকারি প্রতিবাদ পাঠায়। অবশ্য সাধারণ এম পি-দের যেতে বাধা নেই। অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন সাধারণ এম পি ছিলেন তখন ঘুরে এসেছেন। আমি যেতে পারি কি না আলোচনা হল। বিদেশ দপ্তর পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে আমার একটা আনুষ্ঠানিক পরিচয় আছে। সেটা কি বাধা হয়ে দাঁড়াবে! বিদেশ সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ এম পি হিসেবে কনফারেন্স-এ যোগ দেওয়া স্থির হল। সুগত আমার সঙ্গে যোগ দিল।

তাইপে-র গ্র্যান্ড হোটেলে আমরা ছিলাম। তেইশ বছর আগে আমি আর শিশির এই একই হোটেলে ছিলাম। তাইপে-র প্রতি আমার একধরনের দুর্বলতা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজি একটি বোমারু বিমানে সায়গন থেকে টুরেন হয়ে তাইপে বিমান বন্দরে নেমেছিলেন। জ্বালানি ভরে নেবার পর উড়তে গিয়ে বিমানটি রানওয়ের ওপরে ক্র্যাশ করে। অন্যান্য আহতদের সঙ্গে নেতাজিকে নানমন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডা. ইয়োশিমি ও অন্যান্যরা চিকিৎসা করলেও নেতাজিকে বাঁচানো যায়নি। থার্ড ডিগ্রি বার্ন অর্থাৎ গভীরভাবে অগ্নিদগ্ধ হবার ফলে তার মৃত্যু হয়। তাইপে-র ক্রিমেটরিয়ামে হবিবুর রহমান তার শেষ কাজ করেন। তার দেহাবশেষ নিশি হোংগানজি মন্দিরে কয়েকদিন রাখা হয় তারপর হবিবুর রহমান ও হায়াশিদা সেটি টোকিওতে নিয়ে যান।

কনফারেন্স খুব জাঁকজমক করে হল। উদ্‌বোধন করলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট চেন সুই বিয়ান। বিদেশমন্ত্রী ইউজেন চেন, মহিলা উপরাষ্ট্রপতি সিউ লিয়েন অ্যানেত লু আর প্রধানমন্ত্রী ইউ সি কিন-এর সঙ্গে আমার আলাপ হল। আমি আমার চেয়ারপার্সন পরিচিতি না ব্যবহার করতে বলেছিলাম আর যথাসাধ্য চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু খুব কাজ হয়নি। আমি যা-ই বলি খবর কাগজে প্রথম পাতায় চলে যায়, সঙ্গে বড় বড় ছবি। আমি দুই দেশে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর করার কথা বলি। রাজনৈতিক দিক এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

আমি যতক্ষণ কনফারেন্স করি সুগতকে ওরা নেতাজির সঙ্গে বিজড়িত সব জায়গাগুলি দেখিয়ে দেন। নিশি হোংগানজি মন্দির, নানমন হাসপাতালের



জায়গায় ঝলমলে নতুন হাসপাতাল উঠেছে। ক্রিমেটরিয়াম আর নেই, সেখানে পেট্রল পাম্প। একদিন আমাকে আর সুগতকে গাড়ি করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ রানওয়ের চারিদিক দেখিয়ে দেন।

সেখান থেকে আমরা টোকিওতে চলে গেলাম। নেতাজির জাপানি সহযোগীরা আর বিশেষ কেউ বেঁচে নেই। যে দু'-একজন আছেন তাদের মধ্যে শিগেমোটো ওকুদা দেখা করতে এলেন। আর এলেন শিবুসাওয়া জুনিয়র। এর পিতৃদেব শিবুসাওয়া সিনিয়র ছিলেন নেতাজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। টোকিওতে ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া কনফারেন্স-এ যোগ দিতে নেতাজি এসেছিলেন। সে সময়ে তিনি শিবুসাওয়া পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন। বর্তমান শিবুসাওয়ার বয়স তখন মাত্র ষোলো বছর। কিন্তু ওর স্পষ্ট মনে আছে নেতাজি কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির সকলের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। ওর ছোট বোন নেতাজির কোল থেকে নামতে চাইত না। বাড়ির পরিচারক থেকে সিকিউরিটির লোকজন সব নেতাজির প্রীতিমুগ্ধ। আমরা ফোর সিজনস হোটেলে ছিলাম। সেখানে শিবুসাওয়া, ওকুদার মতো নেতাজি অনুরাগীদের, বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য সুগত একটা লাঞ্চের ব্যবস্থা করল। সকলেই নেতাজির স্মৃতিচারণ করলেন। একদিন কিছু ফুল ও জাপানি প্রথামতো পূজার উপাচার নিয়ে রেনকোজি মন্দিরে শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম। পুরোহিত মোচিজুকি ও তার পত্নী আমাদের স্বাগত জানালেন। মিসেস এমোরি নামে এক জাপানি মহিলা ছিলেন নেতাজির টোকিও ক্যাডেটদের মাতৃসমা। তিনি নেই, তার কন্যা মাৎসুশিমা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ক্যাডেটদের শেখানো আজাদ হিন্দ ফৌজের গান এখনও তিনি গাইতে পারেন।

আমার পার্লামেন্টারি কাজেরও কিছু সাক্ষাৎকার ছিল। 'ডায়েট' অর্থাৎ জাপানের পার্লামেন্টে আমার ওদের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠক হল। এদের আপার হাউজ ও লোয়ার হাউজে আলাদা চেয়ারপার্সন। তাই দু'জনের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক হল। আমাদের পার্লামেন্টে যেমন লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলে একটাই কমিটি ও একজন চেয়ারম্যান, এদের তেমন নয়। আমাদের বৈঠকে ভারত-জাপান সম্পর্ক ও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা হল। ভারতের রাষ্ট্রদূত আফতাব শেঠ তখন টোকিওর বাইরে। ডেপুটি মি. নন্দ আমাদের সম্মানে এক

নৈশভোজ দিলেন। সেখানে জাপানের পার্লামেন্টের আরও সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় হল। মোচিজুকি ও তার স্ত্রী-ও উপস্থিত ছিলেন।

দেশে ফিরে আবার কাজের আবর্তে জড়িয়ে পড়লাম। লোকসভার কেন্দ্র ঘুরে দেখা, এলাকার উন্নয়নের জন্য এম পি তহবিল থেকে বরাদ্দ করা ইত্যাদি। ঘন ঘন দিল্লি গেলাম। ফরাসি সেনেটের একদল সদস্য মসিয়ঁ ফসোঁর (Fauchon) নেতৃত্বে দেখা করতে এলেন। ইয়োরোপিয়ান পার্লামেন্টের এক ডেলিগেশন এল, তাদের নেতা মি. ক্রেসপো (Crespo) এম ই পি। আমার কমিটি নিয়ে চেন্নাই আর মুম্বাই সরকারি ট্যুরে যেতে হল। বিদেশ দপ্তর কমিটি কলকাতায় একটা মিটিং করল। সদস্যরা দল বেঁধে নেতাজি মিউজিয়াম দেখতে এলেন। দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা এসে গেল। বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজা উদ্‌বোধন করলাম। এইসময়ে বিভিন্ন জায়গায় বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠানে যেতে হয়। দরিদ্র মানুষদের মধ্যে পুজোর সময়ে জামাকাপড় দেওয়া রীতি। অল্পদিন পরে কালীপুজো। আর এক প্রস্থ পূজা উদ্‌বোধন। সঙ্গে এবার বস্ত্র নয় কম্বল বিতরণ। কারণ শীতকাল এসে পড়েছে। কালীপূজার রাত্রে বসুন্ধরা গৃহে আলোক সজ্জা। ছাদে বসে বাজির আলো আকাশে, নীচে তুবড়ি।

দেওয়ালির পরই দিল্লি গেলাম। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে হবে। দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমার একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত সেক্রেটারি বিশ্বনাথন আমাকে বিমানে তুলে দিল। নিউইয়র্কের পথে লন্ডনে হিথরো বিমান বন্দর থেকে আমার সঙ্গে আরও কেউ কেউ যোগ দিলেন— বিদেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সমতা পার্টির দিগ্বিজয় সিং, তেলেগু দেশমের ইয়েরান নাইডু তাদের অন্যতম। এবার আমি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জেনারেল অ্যাসেমবলিতে বক্তৃতা করলাম। একের পর এক দেশকে নাম ধরে ডাকা হয়। যখন ইন্ডিয়ার ডাক পড়ল আসন থেকে হেঁটে গিয়ে স্টেজে উঠলাম। সামনে পোডিয়াম বা বক্তৃতার স্ট্যান্ডটি বেশ উঁচু। কাছে গিয়ে দেখি একটা টুল রাখা আছে। তার উপর চড়ে বক্তৃতা করলাম। পরে আমাকে বলা হল ওটা যে বিশেষ করে আমার জন্য তা নয়। ওখানে সব সময়ে রাখা থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক রাজনৈতিক নেতাই খর্বকায়। এবারের অধিবেশনের সময়ে উইক এন্ড হলে আমি হার্ভার্ডে সুগতর কাছে চলে যেতাম। শাটল অর্থাৎ এরোপ্লেনের ফেরি চড়া বেশ রপ্ত করলাম। শুক্রবার সব কাজকর্ম শেষ করে শাটল-এ চেপে পড়া আবার সোমবার সকালে ফিরে এসে সোজা



রাষ্ট্রসংঘের কমিটি মিটিং-এ ঢুকে পড়া। জেনারেল অ্যাসেমবলি ছাড়াও কয়েকটি কমিটিতে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এবার আমি আর ওয়াশিংটন গেলাম না। অ্যামবাসাডর ললিত মান সিং একদিনের জন্য নিউইয়র্ক এলেন। আমরা ভারতবর্ষের বিদেশনীতি ও দেশবিদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে গল্প করতে করতে লাঞ্চ খেলাম। সুমন্ত্র লন্ডন থেকে এসে কয়েকদিন নিউইয়র্কে কাটিয়ে গেল। সুগত কখনও এলে আমরা হেঁটে হেঁটে আমাদের প্রিয় রেস্তোরাঁ ভঙ্ (Vong)-এ ডিনার খেতে যেতাম। পা ভাল হয়ে গেছে, নিউইয়র্কের রাস্তায় হাঁটতে পেরে খুব ভাল লাগত। সব মিলে ২০০২-এর নভেম্বরে এই ইউ এন সেশন মনে গাঁথা হয়ে আছে।

ক্রিসমাসের সময়ে কলকাতায় পারিবারিক সম্মেলন। সুগত ও সুমন্ত্র এসে পৌঁছল। আমরা নেতাজির জন্মদিনের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হলাম। জন্মদিনের ঠিক আগেই রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম নেতাজি ভবনে এলেন। উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম কলকাতায় এলে উনি অবশ্য নেতাজি ভবনে আসবেন। উনি কথা রাখলেন। নেতাজির স্টাডিতে ঢুকে তিনি একটি চেয়ারে বসে চোখ বুজে নেতাজিকে ধ্যান করলেন।

২৩ জানুয়ারি নেতাজির স্মারক বক্তৃতা দিলেন অর্জুন আপ্পাদুরাই। উনি একজন স্কলার, বিদ্বজ্জন তো বটেই কিন্তু ওর অন্য এক পরিচয় হল উনি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী এস এ আয়ারের পুত্র। এস এ আয়ারের নেতাজির উপর লেখা বই 'আন টু হিম এ উইটনেস' একটি অপূর্ব বই। আয়ার বেশ কিছুদিন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ারম্যানও ছিলেন। যেমন হয় খুব জাঁকজমক করে নেতাজি জন্মদিন পালিত হল। পারিবারিক ভাবে সুগত, আয়েষা, অ্যালান, শর্মিলা সকলের উপস্থিতিতে খুব আনন্দের সঙ্গে জানুয়ারির উৎসব কাটল। টিপু তার মুভি ক্যামেরাতে অনেক ছবি ধরে রাখল। ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে শিশিরকুমার বসুর বিরাশিতম জন্মদিনে নেতাজি ভবনের পাশের রাস্তা অ্যালেনবি রোড 'শিশিরকুমার বসু সরণি' নামাঙ্কিত হল। রাজপথের উপর সকালবেলার অনুষ্ঠানে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় নামকরণ ঘোষণা করলেন। শেরিফ প্রবীর রায় বক্তৃতা করলেন। নেতাজির অন্তর্ধানের সময়ে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য শিশিরকুমার রাঙাকাকাবাবুকে গাড়ি করে এই রাস্তা ধরে উলটো দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। টিপু 'গ্রেট এসকেপ' বই থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করল। সকলে খুব অভিভূত হয়েছিলেন।

ছয়

## ভারতের প্রতিনিধি

ব্যক্তিজীবনে উত্থান-পতন থাকবেই। আবর্তিত হবে আনন্দ-বিষাদ। বলা হয় মানুষকে হতে হবে 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ।' বলা যত সহজ কাজে তত সহজ নয়। নতুন বছর অর্থাৎ ২০০৩ সাল খুব আনন্দের মধ্যে শুরু হলেও অল্পদিনের মধ্যে আমার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত আঘাত নেমে এল। শিশিরকুমার সবসময়ে বলতেন ব্যক্তিগত দুঃখ যেন কখনও পাবলিক ডিউটির বাধা না হয়। আমার বহির্জগতের কাজকর্মে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি হতে দিলাম না। এত কাজ, এত ব্যস্ততার মধ্যেও মনে এক গভীর বিষাদ। শিশিরের চলে যাওয়ার শোক সবে যেন একটু সামলে উঠেছিলাম আবার মনের জোর হারিয়ে গেল। বেঁচে থাকা মনে হল অর্থহীন। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে আহ্বানের অপেক্ষা। এই বিষাদাচ্ছন্ন সময়ে দুই পুত্র আমাকে আনন্দে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিল। আমার তরুণ বয়সে এক অসাধারণ সাধকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি বলতেন, 'ঝড় বৃক্ষকে সতেজ করে' আর একটি বাক্য যোগ করতেন, 'অবশ্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে।' আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম।

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটে যেতে লাগল। পার্লামেন্টের সেশন থাকলে তো সপ্তাহে সপ্তাহে দিল্লি যাতায়াত আছেই। অন্য সময়েও দেশবিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা বিভিন্ন ডেলিগেশন আসছে। আমার বিদেশমন্ত্রক কমিটির সঙ্গে তাদের আলোচনা থাকে। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এলেন। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সঙ্গে একটি লাঞ্চ বৈঠক হল। জার্মানির প্রেসিডেন্ট আসার পর খুব হইচই হল। জার্মান অ্যামবাসাডর রিখ্‌টার ও তার স্ত্রী বেশ বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। সবকিছুতেই উপস্থিত থাকতে



বলতেন। জার্মান প্রেসিডেন্ট যেদিন প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিলেন সেখানেও ছিলাম। যথারীতি তার সম্মানে আমাদের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি ভবনে ডিনার দিলেন। ফিকি (ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স) এবং সি আই আই (কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি) যৌথভাবে একটি লাঞ্চ মিটিং ব্যবস্থা করেছিল, জার্মান প্রেসিডেন্ট সেখানে তার বক্তব্য রাখলেন। বাজেট অধিবেশন শুরু হলে পর বিদেশমন্ত্রকের বাজেট আমাদের কমিটিতে আলোচনার জন্য পেশ করা হল।

অযোধ্যার মন্দির বিতর্ক ২০০৩ সালের গোড়ায় আবার নূতন করে মাথা চাড়া দিল। স্পিকার অযোধ্যার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের অনুমতি দিলেন। ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে আমি অযোধ্যা বিতর্কে অংশ নিয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি পার্লামেন্টের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অংশ নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু অযোধ্যা বিতর্কে আমি যে বক্তব্য রেখেছিলাম পার্লামেন্টের রেকর্ড থেকে তার পুরোটা উদ্ধৃত করে দিলাম।

শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু (যাদবপুর): মি. স্পিকার স্যার, আমি অত্যন্ত মর্মবেদনার সঙ্গে এই বিতর্কে অংশ নিতে দাঁড়িয়েছি। দীর্ঘক্ষণ ধরে যে পরস্পর দোষারোপ চলছিল তা শুনলাম। বিভিন্ন দল থেকে যে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া হল তা শুনলাম। আবার অনেক আইনগত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও শুনতে পেলাম। এইভাবে বসে বসে এসব কথা শুনে যাওয়া নিতান্ত বেদনাদায়ক। কারণ আমাদের দেশের যা সত্যিকারের সমস্যা তাই নিয়ে বিচার-বিবেচনা না করে এই অবান্তর কথা নিয়ে আলোচনা করছি। সমস্যাগুলো কী? আসল সমস্যা হল দারিদ্র, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা। কী আর বলব আমরা সময় নষ্ট করছি অসার বিতর্কে। এই মুহূর্তে সবচাইতে কী জরুরি? এই মুহূর্তে সবচাইতে জরুরি হল জাতীয় জীবনে শান্তি, ঐক্য ও শুভবুদ্ধি...। যাইহোক, আর কিছু বলার আগে এই বিষয়ে আমার দলের যা বক্তব্য তা আর একবার পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল। এন ডি এ সরকারের শরিক হিসেবে আমরা কমন মিনিমাম এজেন্ডা মেনে চলব। তার থেকে কোনও বিচ্যুতি আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। আমি একথাও পরিষ্কার করে দিতে চাই যে কোর্ট এ বিষয়ে (রামমন্দির বিতর্কে) যে চূড়ান্ত রায় দেবেন— তা সে রায় যাই হোক না কেন— আমরা মেনে নেব। আমি তো দেখছি আপনারা সকলেই তা মেনে নিচ্ছেন। তা হলে মতান্তর হচ্ছে কোথায়! সকলেই তো একই কথা বলছেন।

একথা বলার পরেও আমি একটা বা দুটো কথা বলতে চাই। সমস্যাটা কি শুধু কয়েক একর জমি আর কিছু ইট-পাথরের বির্তয়ে নাকি কোনও প্রকৃত বিষয় জড়িত আছে। কেউ একথা উল্লেখ করছেন না কিন্তু একটা মূল বিষয় হল গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধর্ম দিয়ে নিরূপণ করা চলে না। ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার তত্ত্ব যে-কোনও দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশের মঙ্গলের জন্য ভাল প্রোগ্রাম, রাজ্যের সুশাসন ও ভাল পরিকল্পনা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হয়, জিতে নিতে হয়। এন ডি এ সরকারের অন্যতম শরিক হিসেবে আমি চাই এন ডি এ এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নিক, অন্য কোনও উপায়ে নয়।

স্যার, আর একটি কথা, আমার জনজীবনে বা পাবলিক লাইফে আমি প্রচণ্ডভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি। কিন্তু আমি একজন হিন্দুও বটে— আমি মনে করি আজকে যারা নিজেদের হিন্দু বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তাদের অনেকের চাইতে আমি প্রকৃত হিন্দু। আমার হিন্দুত্ব আমি শিক্ষা করেছি স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দর কাছে। আমি এই সভাকে মনে করিয়ে দিতে চাই তারা আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি একজন হিন্দু হিসেবে চাই আপনারা আমার কথা শুনবেন। আমি স্বামী বিবেকানন্দ থেকে মাত্র দুটি লাইন শোনাতে চাই, আশাকরি আমার সহকর্মী বন্ধুরা মন দিয়ে শুনবেন। আপনারা তো জানেন উনি বলেছিলেন সকল ধর্মই সত্য। তিনি বিশ্বধর্মের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— 'আমি মুসলমানের মসজিদে যাব'— আমি আবার বলছি—

'আমি মুসলমানের মসজিদে যাব, আমি ক্রিশ্চিয়ানের চার্চে গিয়ে ক্রসের সামনে নতজানু হব; আমি বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের জীবন ও বাণী অনুশীলন করব। আমি অরণ্যে গিয়ে হিন্দুর সঙ্গে ধ্যানে বসব যিনি জ্ঞানের আলোক সন্ধান করছেন যে আলোকে সর্বজনের অন্তর আলোকিত হবে।'

স্যার, এই হল হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম এক মহৎ দর্শন। সেখানে হিংসার কোনও স্থান নেই। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উপনিষদ পড়বার পর বলেছিলেন— উপনিষদ আমার জীবনে শান্তি, মরণেও শান্তি। উপনিষদ পাঠ করার পর কী অমূল্য কথাই না বললেন। আমি চাই আপনারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মের নামে, হিন্দুধর্মের নামে হিংসার প্রচারের নিন্দা করুন।

স্যার, আমি আরও একটি বিষয় বলতে চাই— ভারতবর্ষের একটি সার্বিক



সংস্কৃতি আছে। আমরা অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন দেখেছি— হিন্দু সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। শ্রীঅরবিন্দ, যাঁকে আমরা সকলে শ্রদ্ধা করি তিনি এই সার্বিক সংস্কৃতি সম্পর্কে কী বলেছিলেন? আমি আপনাদের আহ্বান করছি মুঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাঁর যে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন তা আপনারা শুনুন। আমি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি, তিনি বললেন—

'মুঘল সাম্রাজ্য একটি বিরাট সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কাজে এবং একে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে এক বিশাল রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্য ছিল যেমন অপূর্ব, তেমন শক্তিমান ও মঙ্গলদায়ক এবং আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি সত্ত্বেও একথা বলতে হবে যে মধ্যযুগের অথবা সমসাময়িক অনেক ইয়োরোপীয় রাজ্য বা সাম্রাজ্যের চেয়ে ধর্মের ব্যাপারে অনেক উদার ও পরমতসহিষ্ণু। মুঘল শাসনের সময়ে ভারতবর্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে, অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে, শিল্প ও সংস্কৃতির আলোকে এক উচ্চস্থান অধিকার করেছিল।'

এই উদ্ধৃতি দিলাম শ্রীঅরবিন্দের 'স্পিরিট অ্যান্ড ফর্ম অব ইন্ডিয়ান পলিটি' থেকে। উনি এমন কথাই বলেছিলেন। উনি ভারতীয় শিল্পকলার স্বপক্ষে আরও একটি বই লিখেছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষের মসজিদ ও সমাধিগুলির সৌন্দর্য কতখানি মূল্যবান মনে করেন। আমাদের দেশের একটি বিশেষ মসজিদের ভাগ্যে যা ঘটল আমার মনে হয় না তিনি এতে প্রীত হতেন।

স্যার আমি বিশেষ চিন্তিত ভারতবর্ষের সুনামের উপর, হিন্দুধর্মের সুনামের উপর এ এক কলঙ্কের ছাপ। আমাদের যা হোক করে এটা (হিংসা) থামাতেই হবে। আসুন আমরা আমাদের প্রকৃত সমস্যা দারিদ্র, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হই। চলুন আমরা শত শত ইস্কুল, হাসপাতাল গড়ে তুলি। সভার এদিকে (ট্রেজারি বেঞ্চে) যারা বসে আছেন আমার সেইসব সহকর্মীদের আমি বলতে পারি এসবই হবে শ্রীরামের উপযুক্ত মন্দির। তিনি এই মন্দিরে স্থিত হবেন। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করবেন। যদি রক্তপাত, হিংসা ও ঘৃণার উপর ভিত্তি করে কোনও পরিকাঠামো গড়ে ওঠে শ্রীরাম সেই মন্দিরে বাস করতে অস্বীকার করবেন। এই আমার অভিমত।

স্যার, একটু আগে কে যেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বললেন। গাঁধীজির সত্যাগ্রহ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কথা

স্মরণ করিয়ে দিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সকলে দেশকে বিদেশি শাসন মুক্ত করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। তাদের আত্মত্যাগ যেন বৃথা না হয়। আমরা তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান আমাদের সকলকে এই ভারতবর্ষে থাকতে হবে। সর্বক্ষণ এইরকম একটি বিষাক্ত বিষয় নিয়ে মনান্তর করে যাওয়া অর্থহীন। আমি মহাত্মা গাঁধীর নামে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে আপনাদের আহ্বান করছি ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করুন। ভারতবর্ষের সামনে বিপুল সম্ভাবনা। শীঘ্রই আমরা অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিসম্পন্ন দেশ হতে চলেছি। আসুন আমরা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এক বৃহত্তর, মহোত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখি। মি. স্পিকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

এই মন্দির বিতর্কে আমার নিজস্ব কঠোর মত ছিল। আমি আবেগতাড়িত, আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। আমার বক্তৃতা শেষ হলে পর বিরোধী পক্ষের অনেকে এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। আমার ঠিক আগে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন। তিনি মাঝেমাঝেই আমার উদ্দেশে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন— এই তো কৃষ্ণাদি ওদের সঙ্গে বসে আছেন, ওদের শরিক, কী-ই বা বলবেন! আমার বলা হয়ে যাওয়ার পর উঠে এসে বললেন, খুব ভাল বলেছেন। আমি ভাবছি আজ আমাদের কোয়ালিশনের বড় শরিক নিশ্চয় আমার উপর খুবই অপ্রসন্ন হবে। আমার নিজের দলই বা কী মনে করবে কে জানে!

কিন্তু আমার জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট নাজুমার সম্মানে ডিনার ছিল। আমার তো পার্লামেন্টে বক্তৃতা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এলেন। আমি একটু অবাক হলাম। আমি সাধারণত দূর থেকে হাতজোড় করে নমস্কার করি। তা হাত যখন বাড়িয়ে দিলেন আমি গ্রহণ করলাম। উনি হাসিমুখে বললেন, তোমার বক্তৃতা আমি শুনলাম, তোমার বক্তব্য আমি সবই শুনেছি। আমি যখন বলছিলাম তখন উনি চেম্বারে ছিলেন না। বুঝলাম নিজের অফিসে টিভি মনিটরে উনি মন দিয়ে শুনেছেন। ওর



হাসিমুখ ও হ্যান্ডশেক করা দেখে বুঝলাম উনি অন্তত আমার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত।

দোল বা হোলির সময়ে সাধারণত কলকাতায় আসি। বসুন্ধরা গৃহের ছাদে পারিবারিক হোলি খেলা হয়। এ বছর বাড়িতে না হয়ে সন্তোষপুরের পথে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে হোলি খেললাম। মেয়েরা রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে পথে নাচলেন, আবির ছড়ালেন। ছোটরা আনন্দ করল। মার্চ মাসে অল্প কয়েকদিনের ছুটি থাকাতে সুগত এসেছিল। সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন নিয়ে তুমুল গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আগের বছর রাষ্ট্রসংঘে যখন কুখ্যাত ইউ এন প্রস্তাব ১৪১৪ পাশ হয় তখন আমি নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত ছিলাম। দেখেছিলাম পনেরোটি দেশের প্রতিনিধি হাত তুলে সেই প্রস্তাব পাশ করলেন। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য আর দশজন অস্থায়ী। সিরিয়া শেষ পর্যন্ত কী করবে সংশয় ছিল। কিন্তু সিরিয়াও প্রস্তাবের স্বপক্ষে হাত তুলল।

ইরাক সমস্যা নিয়ে আমাদের বিদেশমন্ত্রক কমিটির বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শোনা হোক আমার তাই ইচ্ছা। এই ব্যাপারে তাই আমি আমার কমিটিকে যথাসাধ্য ওয়াকিবহাল করে রাখতে চাইছিলাম। বাজেট অধিবেশনের সময় যখন বিদেশ সচিব এবং অন্যান্য সচিবেরা কমিটির কাছে বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে এলেন আমি ইরাকের সর্বশেষ পরিস্থিতি কমিটির কাছে পেশ করতে বললাম। বিদেশ সচিব কানওয়াল সিবাল ইরাক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেন। সাধারণত বাজেটের উপর সচিবদের অনেক প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হয়— যেমন দূতাবাসের ভাড়াবাবদ অত খরচ হল কেন অথবা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশনস বা আই সি সি আর-এর জন্য আরও টাকা বরাদ্দ করা হল না কেন ইত্যাদি। ইরাক আমাদের মন বিক্ষিপ্ত করে দেওয়াতে সচিবেরা অনেক প্রশ্নোত্তর থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। স্পিকারের চেম্বারে আমাদের ঘন ঘন সর্বদলীয় আলোচনা হতে লাগল। আমি এর সব মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম কারণ এতে দেশের বিদেশনীতির প্রশ্ন জড়িত। আমার দৃঢ় মত ছিল আমরা এই আগ্রাসনে জড়িত হব না, আমাদের সেনাবাহিনী অবশ্যই জড়িত থাকবে না। আমেরিকার ইরাকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করা হবে স্থির হল। প্রস্তাবের ভাষা কী হবে তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলল। ইংরাজিতে

'কনডেম' (condemn) বলা হবে, না মৃদুভাবে 'ডিপ্লোর' (deplore) বলা হবে। পছন্দমতো শব্দ পাওয়া মুশকিল। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় দু'-একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'এই যে ইংরেজির প্রফেসর কিছু বলুন।' ইংরেজি ফেল করল। তখন হিন্দিতে 'নিন্দা' বলা হবে স্থির হল। কমিউনিস্টরা চাইলেন 'ঘোর নিন্দা'। শেষ পর্যন্ত 'নিন্দা'ই যথেষ্ট হবে মনে হল। এই প্রস্তাবের উপর পার্লামেন্টে বিতর্কে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম। বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হল।

ডিপ্লোম্যাটিক স্তরে ইরাক নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে। ভারতবর্ষের মতামত আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। জার্মান রাষ্ট্রদূত রিখ্‌টার সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছিলেন। তবুও তাদের পলিটিকাল কাউন্সেলর আমার অফিসে এসে আলোচনা করে গেলেন। আমেরিকানরাও তাদের অফিসারকে পাঠালেন। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ব্ল্যাকউইল আমাদের কয়েকজনকে বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অ্যামবাসাডর ব্ল্যাকউইল আর একবার আমাদের কমিটিতে বক্তব্য রাখতে পারলে খুশি হতেন— যেমন আফগানিস্তান সংকটের সময়ে করেছিলেন। কিন্তু আমি এবার অন্যরকম চিন্তা করলাম। ইরাকে আমেরিকার ভ্রান্ত নীতি যে একটা বিপর্যয় ডেকে আনবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমেরিকানরা আমাদের সমর্থন আশা করছিল, আমাদের সেনাবাহিনীকেও ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল। আমার চিন্তা হয়ে যাচ্ছিল আমাদের কোয়ালিশন সরকার কোনও ভুল না করে। আমি কমিটির সামনে বিভিন্ন মধ্যপ্রাচ্য বিশারদদের ডেকে পাঠালাম। তাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিদেশ সচিবেরা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা ছিলেন। তারা কমিটিকে তাদের সুচিন্তিত মতামত জানালেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন জে এন দীক্ষিত, ইনি পরে কিছুকাল মনমোহন সিং-এর সরকারে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর একজন ছিলেন হামিদ আনসারি। ইনি পরে আমাদের উপরাষ্ট্রপতি হলেন। হামিদ আনসারি পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে বিদেশ দপ্তর কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি সে সময়ে যে তৎপরতা দেখিয়েছিলাম তা যথেষ্ট কাজে লেগেছিল। সরকার কোনও ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে ফেলতে পারেনি।

জার্মান সরকার আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন ওদের দেশে গিয়ে দুটি বিষয়ে



আলোচনা করতে হবে। এক, ইরাক পরবর্তী পরিস্থিতি আর এক সন্ত্রাসদমন বিরোধী ব্যবস্থা। অতএব মে মাস ২০০৩ সালে আমরা কয়েজন এম পি জার্মান শহর উইসবাডেনে পৌঁছলাম। উইসবাডেনে এসে আমার খুব আনন্দ হল। ত্রিশ বছর আগে আমি আর শিশির এই শহরে এসেছিলাম। উইসবাডেন আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সেটা ছিল আমার জীবনে এক বিশেষ বছর। আমরা ইয়োরোপের দেশে দেশে ইতিহাসের সন্ধানে ঘুরেছিলাম। আমাদের নিজেদের দেশের ইতিহাস। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অনেক সহকর্মী তখনও জীবিত, তাদের সঙ্গে দেখা হল। অনেক অমূল্য দলিল, ছবি সংগ্রহ করে কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় দিতে পেরেছিলাম। এই ভ্রমণের শেষে আমার বই 'ইতিহাসের সন্ধানে' লেখা হয়েছিল। উইসবাডেন তেমনি সুন্দর রয়েছে শুধু আগের মানুষেরা আর নেই। এখানে থাকতেন নেতাজির সহকর্মী লোথার ফ্রাংক। তারা আজ আর নেই।

উইসবাডেনে আমাদের কাজকর্ম শুরু হবার আগে ওরা ওয়াইন-এর সেলারে নিয়ে গেলেন। ওদের দেশের রকমারি সাদা ও লাল ওয়াইন মাটির নীচের কক্ষে রয়েছে। অনেকে ওয়াইন টেস্টিং-এ যোগ দিলেন। ওয়াইন পান করা নয়, জিভে স্পর্শ করে কোনটা কেমন চেখে দেখে ফেলে দিতে হয়। আমাদের দলে জেনারেল ত্রিপাঠী, সুরেশ প্রভু, কপিল সিবাল আরও কেউ ছিলেন। উইসবাডেন অ্যাসেমবলির সদস্যরা আমাদের অ্যাসেমবলি হাউস ঘুরিয়ে দেখিয়ে লাঞ্চ খাওয়ালেন। সন্ত্রাসমূলক অপরাধ নিয়ে যারা কাজ করেন তেমন কয়েকজন বিশিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হল। উইসবাডেন উষ্ণ জলের প্রস্রবণ বা 'স্পা'-র জন্য বিখ্যাত। স্পা-তে যাওয়া হল। শহরে ঘুরতে ফিরতে আমার চোখে পড়ে গেল শিশির আর আমি বহুদিন আগে যে হোটেলে ছিলাম তা এখনও রয়েছে, হোটেল ক্লি (Klee)।

উইসবাডেন থেকে আমরা বার্লিন চলে এলাম। সেখানে আমাদের রাষ্ট্রদূত রঙ্গচারি ও তার স্ত্রী কোকিলা অন্যান্য জার্মান অফিসারদের সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন। জার্মানিতে এলাম অথচ অনিতা ও মার্টিনের সঙ্গে দেখা হবে না তা হতে পারে না। আউগসবুর্গ থেকে অনিতা ও মার্টিন এসে পড়ল বার্লিনে। সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। তারই মধ্যে ফাঁক পেলে অনিতা, মার্টিন ও আমি কোনও কাফেতে বসে আড্ডা দিই। জার্মান পার্লামেন্টের অনেক সদস্য বিশেষ পরিচিত। হয় তারা দিল্লিতে আমাদের কমিটিতে

এসেছেন নয়তো আমরা ওদের সঙ্গে আগে বার্লিনে পরিচিত হয়েছি। ওরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করলেন, ডিনার খাওয়ালেন। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত ক্রাইম নিয়ে যারা কাজ করেন তেমন সব অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে মত বিনিময় হল। একটা বিষয় আমার অবাক লেগেছিল। ক্রাইম নিয়ে যারা সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করেন ভেবেছিলাম তারা চেহারায় ও কথাবার্তায় খুবই ভয়াবহ হবেন। কিন্তু দেখলাম এরা মৃদুভাষী ও সজ্জন। যত চেষ্টাই হোক যারা নিজের জীবন বাজি রেখে সন্ত্রাস করেন তাদের প্রতিরোধ করা যে কঠিন এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত ছিল না। অ্যামবাসাডর রঙ্গচারি ও কোকিলা অনিতা, মার্টিন ও আমাকে তাদের গৃহে আমন্ত্রণ করল। তারা সংগীতশিল্পী জুবিন (Zubin) মেটাকে সংবর্ধনা দিচ্ছিল। জুবিন মেটা পদ্মবিভূষণ পেয়েছিলেন, বার্লিনে সেই সম্মান তার হাতে তুলে দেওয়া হল। বাড়ির পিছনে বাগানে আয়োজন হয়েছিল। মনে আছে হঠাৎ খুব ঠান্ডা পড়ে গিয়েছিল। জুবিন মেটার সঙ্গে একই টেবিলে বসার ফলে বেশ আলাপ হয়ে গেল। চমৎকার মানুষ।

দেশে ফিরে আসার পর আর নতুন করে স্যুটকেস গোছাতে সময় পেলাম না, সেই স্যুটকেস হাতেই রওনা হয়ে পড়লাম। এবার গন্তব্য ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি— সি আই আই আমাকে একটি এম পি-দের ও শিল্পপতিদের দলের নেতৃত্ব দিয়ে আমেরিকা নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল। বিভিন্ন দল থেকে এম পি-রা এই দলে ছিলেন। কংগ্রস থেকে সত্যব্রত চতুর্বেদি, বিজেপি থেকে বিক্রমকেশরি দেও, সেলিম শেরওয়ানি (সমাজবাদী দল), রামমোহন রাও (তেলেগু দেশম), জেনারেল শংকর রায়চৌধুরী (নির্দল)। সি আই আই-র তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আনন্দ মাহিন্দ্র ও ডিরেক্টর জেনারেল তরুণ দাস সকলেই ডেলিগেশনে ছিলেন। যে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম সুগত বস্টন থেকে দেখা করতে নিউইয়র্কে চলে এল। নিউইয়র্কে থার্ড অ্যাভেনিউ আর ফিফটি থার্ড স্ট্রিটের মোড়ে আমাদের প্রিয় রেস্তোরাঁ 'ভঙ' (Vong)। হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'ভঙ'-এ পৌঁছে ডিনার খেলাম। নিউইয়র্কের পথে হেঁটে বেড়াতে পেরে খুব ভাল লাগল। পায়ের সার্জারির আগে অনেকদিন এরকম হেঁটে বেড়াতে পারিনি।

পরদিন সকাল থেকে কাজের শুরু। প্রথমেই নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে ব্রেকফাস্ট মিটিং। তারপর ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের কাজকর্ম শুরু। শুনলাম টেবিলের চারিদিকে বসে যাকে বলে সিট-ডাউন ব্রেকফাস্ট



মিটিং। এই বৈঠক সম্পর্কে আমি মনে মনে একটু নার্ভাস ছিলাম। কূটনীতিক আলোচনা আমি ভালই চালাতে পারব। রাজনৈতিক বিষয় বা আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়েও সহজেই কথাবার্তা বলতে পারব। কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনও ধারণা নেই। মনে মনে ভয় থাকলেও ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় বস্টন থেকে সুগত আর লন্ডন থেকে সুমন্ত্রর উদ্বিগ্ন টেলিফোন, স্টক এক্সচেঞ্জটা কেমন হল? তাদের আশ্বস্ত করলাম। নিউইয়র্ক থেকে আমরা যাব ওয়াশিংটন। চলে যাবার আগে আমাদের রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি বিজয় নাম্বিয়ার ও তার ডেপুটি গোপীনাথন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। রাষ্ট্রসংঘে আমাদের কাজকর্ম কেমন চলছে তাই নিয়ে কথাবার্তা হল। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতবর্ষের জন্য একটি সিট-এর দাবিতে আমরা কূটনীতিক স্তরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেখলাম আমাদের ডেলিগেশনের জন্য ঠাসা প্রোগ্রাম। আমাদের রাষ্ট্রদূত ললিত মান সিং আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমার জন্য ললিত মান সিং একটি বিশেষ কাজের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। ওয়াশিংটনে আমরা যাকে 'ইন্ডিয়ান ককাস' বলে থাকি সেই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কয়েকজনকে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড বা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই পুরস্কার তিনি আমার হাত দিয়ে দেওয়াবেন। ক্যাপিটল-এ একটি বড় সভার আয়োজন হয়েছিল। যেসব আমেরিকান জনপ্রতিনিধিরা সেনেটে বা হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ-এ ভারতের পক্ষ হয়ে কথাবার্তা বলেন তাদের নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ককাস'। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনকে আমি 'ভারতমিত্র' বা ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড তুলে দিলাম। সে সময়ে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের উপর আমি একটি ভাষণ দিয়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানের উপলক্ষ ছিল 'ইন্ডিয়ান ককাস'-এর দশম বর্ষ পূর্তি। শুনলাম প্রথমদিকে এই ককাসের সদস্য মাত্র দু'-তিন জন ছিলেন। কিন্তু এখন ভারতবন্ধুর সংখ্যা শতাধিক।

নানান আমেরিকান রাজনীতিকদের সঙ্গে আমাদের ডেলিগেশনের আলাপ আলোচনা সাক্ষাৎকার চলতে লাগল। আমেরিকান কংগ্রেস সদস্যা ন্যান্সি পেলোসি তখন ডেমোক্রেটিক পার্টির মাইনরিটি লিডার। ন্যান্সি পেলোসিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। পরবর্তীকালে ন্যান্সি ওদের হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ-এ স্পিকার হলেন। আমেরিকার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ব্রুকিংস

ইনস্টিটিউট-এ যখন আমাদের মিটিং চলছে স্ট্রোব টলবট এসে ঢুকেই বললেন, মিসেস বোস এইমাত্র সুমন্ত্রর কাশ্মীর-এর উপর বইটা পড়ে শেষ করলাম, আমি ব্লার্বও লিখেছি। ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ট্রোব টলবটের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একসময়ে স্ট্রোব টলবট ও যশোবন্ত সিংহের দীর্ঘ আলাপ আলোচনা দু'দেশের সম্পর্ক সহজতর করেছিল। ওয়াশিংটনের 'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট অব ডেমোক্রেসি'-র সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে দু'দেশের গণতন্ত্র নিয়ে কথা হল। 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন' হল এক দক্ষিণপন্থী কিন্তু অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাদের সঙ্গে লাঞ্চ বৈঠক হল। একটি চমৎকার সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন অ্যামব্যাসাডর টেরেশিটা শেফার তার প্রতিষ্ঠান সেন্টার অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর তরফে। ওদের প্রেসিডেন্ট হাম্‌রে (Hamre) সভাপতিত্ব করেন। আমার নিজের বক্তব্য তো বেশ ভালভাবে হয়ে গেল। কিন্তু যখন জেনারেল শংকর রায়চৌধুরী বলছিলেন তখন কাশ্মীর সম্পর্কে তার কোনও বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন দর্শক আসন থেকে দু'জন প্রবীণ পাকিস্তানি সাংবাদিক। কিঞ্চিৎ তিক্ততার সৃষ্টি হতে চলেছিল, টেরেশিটার দ্রুত হস্তক্ষেপে বেশিদূর গড়াতে পারল না। আমরা যে মে ফ্লাওয়ার রেনেশাঁস হোটেলে ছিলাম সেখানেই এই সেমিনার আয়োজিত হয়েছিল।

সরকারি সব সাক্ষাৎকারে আর প্রেসের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আমাকে কেবলই ভারতের ইরাক নীতির ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। ইরাকে ভারতের নিজস্ব নীতি আমেরিকাকে অসন্তুষ্ট করেছিল। অনেক বৈঠকে আমি বলেছিলাম আমেরিকা সকলের মতামত তুচ্ছ করে এককভাবে ইরাকে যে আগ্রাসনের নীতি গ্রহণ করেছে তা কোনওমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘকে পাশ কাটিয়ে নিজের খেয়ালমতো চলা আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 'তাই বলে পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করানো কি জরুরি ছিল?' জবাবে বলতে হল আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। জনগণের মনের কথাই প্রস্তাবে প্রতিফলিত।

অবশ্য কোনও কোনও সাক্ষাৎকার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন ক্রিস্টিনা রোকা তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট। তার সঙ্গে দিল্লিতেও আগে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। আমাদের দেশের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। সেনেটর হিলারি ক্লিন্টন-এর সঙ্গে তার সেনেট অফিসে বৈঠকটি বেশ মনে রাখার



মতো। হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে আমার প্রথমবার দেখা হয়েছিল কলকাতা শহরে। মাদার টেরেসার অন্তিম কাজে যোগ দিতে হিলারি কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার অন্যতম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সাংসদ হিসেবে আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র বলে উঠলেন— 'আপনার শহরে আসতে পেরে আমি ধন্য বোধ করছি। কলকাতা খুব প্রাণবন্ত শহর।' এবার অবশ্য টেবিলে মুখোমুখি বসে আলাপ আলোচনা হল। দু'দেশের রাজনীতির হালচাল। ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে অনেকবারই হিলারি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন-এর কথা উল্লেখ করলেন। আমার স্বামী যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন বা আমার স্বামী ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই বলেন ইত্যাদি। হিলারির আত্মজীবনী তখন দু'-একদিনের মধ্যে প্রকাশিত হতে চলেছে। দেখলাম নিজের বই প্রকাশ নিয়ে হিলারি খুশি ও উত্তেজিত হয়ে আছে। আমি দেশে ফেরা মাত্র ওর বইটি আমার হাতে এল 'দেশ' পত্রিকায় সমালোচনা লেখার জন্য।

অ্যামবাসাডর ললিত মান সিং একদিন আমাকে নিয়ে বার হলেন, বাড়ি দেখাবেন। দুটি খুব সুন্দর সম্পত্তি উনি আমাকে দেখালেন। অনেকদিন হল ওয়াশিংটন শহরে একটি ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ কিছু হয়নি। আমার বিদেশমন্ত্রক পার্লামেন্টারি কমিটিতে এই কেন্দ্রের কথা উঠলেই বিলম্বের জন্য সদস্যরা তীব্র সমালোচনা করতেন। অনেক সময় ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসকেও দোষারোপ করা হত। প্রকৃতপক্ষে ওদের কোনও দোষ ছিল না। ভাল কোনও সুন্দর বাড়ির খবর পেলেই ওরা দাম ইত্যাদি বিদেশমন্ত্রককে জানাতেন। তারপর এই টেবিল থেকে সেই টেবিল ফাইল যেতে যেতে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেত। দামও নিত্যদিন বেড়েই চলেছে। ললিত মান সিং যে দুটি বাড়ি দেখালেন একটি আমার খুবই পছন্দ হল। স্প্যানিশ ভিলা ধরনের বাড়ি, মাঝখানে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বাড়ির লাগোয়া নিজস্ব পার্কিং-এর জায়গা। এই ধরনের কেন্দ্রে পার্কিং থাকা খুব জরুরি। অন্য বাড়িটিও এত ভাল না-হলেও বেশ ভাল। আমি তৎক্ষণাৎ বিদেশমন্ত্রককে চিঠি দিলাম আর টালবাহানা না করে শীঘ্র সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা সম্পত্তি কিনে ফেলা হোক। আমার যে স্প্যানিশ ভিলাটি পছন্দ তাও জানালাম। বিশেষ কাজ হল না, সে বাড়িও হাতছাড়া হয়ে গেল।

ওয়াশিংটনে আমাদের ডেলিগেশন-এর কাজকর্ম শেষ হয়ে এল। চলে আসার আগে বিদেশমন্ত্রক পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে আমার

জন্য ললিত মান সিং ও তার স্ত্রী ইন্দিরা তাদের গৃহে একটি রিসেপশন-এর আয়োজন করেন। সেখানে বহুলোকের সঙ্গে দেখা হল। অনেকে ওয়াশিংটনের বাইরে থেকেও এলেন। সুগত এসেছিল বস্টন থেকে।

ডেলিগেশন চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেল। আমি চলে গেলাম বস্টনে কয়েকদিন নিরিবিলি ছুটি কাটাতে। পুরনো পারিবারিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ল্যারি সার্মাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ওদের ডিন বিল কার্বির সঙ্গে আর একদিন সাক্ষাৎকার। আমার ডাক্তার এলেনা মাসেরোট্টির সঙ্গে একদিন দেখা করলাম। মহিলা নিজে হুইলচেয়ার পার্সন, হাঁটাচলা করতে পারেন না। কিন্তু খুব মনের জোর। জুনের শুরু, বস্টনের গাছে ফুলের সমারোহ চোখে পড়ছে। বস্টন থেকে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। চলে আসার ঠিক আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ডিনার যাকে 'ব্ল্যাক টাই' ডিনার বলে তাতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সেখানে অনেক বিশিষ্ট জনের সঙ্গে দেখা হল। খুব ভাল লাগল যখন দেখলাম আমি যে ডেলিগেশনটি নিয়ে ওয়াশিংটনে এসেছিলাম তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেকে জানেন। বললেন খবরের কাগজে পড়েছেন, ছবি দেখেছেন। মনে হল তা হলে এই ডেলিগেশন ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর করতে কিছু সাফল্য পেয়েছে।

ফিরতি পথে লন্ডনে সুমন্ত্রর সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে দেশে ফিরে এলাম। এসেই দিল্লিতে পার্লামেন্ট হাউজ অ্যানেক্সিতে আমার ছোট অফিস ঘরটিতে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অনেক কূটনীতিকরা তাদের নতুন পদে যোগ দেবার আগে দেখা করতে আসতেন। বিজয় নাম্বিয়ার পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত হয়ে যাবার আগে দেখা করেছিলেন। একদিন হর্ষ ভাসিন এলেন। তিনি ডেনমার্কে আমাদের রাষ্ট্রদূত হতে চলেছেন। হর্ষ ভাসিনকে পাকিস্তানে হাইকমিশনার করে পাঠানো হবে এমনি একটা কথা চলছিল। উনি সেভাবে প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধং দেহি মনোভাব কেটে গিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে আশা করা হচ্ছে। অবস্থা একটু বন্ধুত্বপূর্ণ হলেই দু'পক্ষের রাষ্ট্রদূত কাজের ভার নেবেন। কিন্তু দু'দেশের সম্পর্ক কিছুতেই আর স্বাভাবিক হবার লক্ষণ নেই। তখন হর্ষ ভাসিনকে ডেনমার্কে যোগ দিতে বলা হল। এদিকে এই ঘোষণার পরেই হঠাৎ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে উন্নতির আশা দেখা দিল। সে সময়ে স্থির হল চিনে আমাদের রাষ্ট্রদূত শিবশংকর



মেননকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে। ওদিকে পাকিস্তান পাঠাল তাদের হাইকমিশনার পদে আজিজ আহমদ খানকে। উভয়পক্ষে সেই সময়ে সামান্য হলেও কিছু সম্পর্কের উন্নতির আশা দেখা দিয়েছিল। আমার কাছে আসার ঠিক আগে হর্ষ গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের কাছে। তার সঙ্গে দেখা করা প্রোটোকল বা কূটনীতিক সৌজন্যের মধ্যে পড়ে। উনি গিয়ে দেখেন রাষ্ট্রপতি কালাম কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন। এবং ডেনমার্ক সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তার সামনে রয়েছে। উনি অনেক কিছু উপদেশ দিয়ে চললেন। শেষপর্যন্ত ভাসিন কাগজ কলম বার করে নোট নেওয়া শুরু করলেন।

শুনে রাষ্ট্রপতি কালামের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কথাও আমি বললাম। উনি প্রোটোকল বিশেষ মানতেন না। যখনই যেতাম নিজের কাজের টেবিল চেয়ারে কম্পিউটার খুলে বসে আছেন। খেতে নিমন্ত্রণ করলে, যদি বুফে হয় নিজের হাতে প্লেট এনে আমার হাতে দিচ্ছেন। আমি অপ্রস্তুত। মাঝে মাঝেই আমাদের এম পি-দের ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করতেন। একবার আমাদের পশ্চিমবাংলার এম পি-দের ব্রেকফাস্ট খাইয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রীতিমতো ক্লাস নেবার ব্যবস্থা। আমাদের রাজ্যে ডেভেলপমেন্ট করতে হলে কী কী করতে হবে, কেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি এই বিষয়ে অনেকক্ষণ ক্লাস নিলেন। পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারটাতে আমার সঙ্গী রাজ্যের শাসক দলের অনেক এম পি মোটেই প্রীত হননি। রাষ্ট্রপতি কালামকে তার ঈষৎ খামখেয়ালি এবং নিতান্ত সহজ আচার ব্যবহারের জন্য আমার খুবই ভাল লাগত।

বিদেশমন্ত্রক পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্যদের নিয়ে কাশ্মীরে কাজে যেতে হল। কিছুদিন হল কাশ্মীরে যেতে হবে পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সর্বদা হিংসা, রক্তপাত যাবার পথে বাধা। ২০০৩ সালের জুন মাসের শেষদিকে অল্পদিনের জন্য অবস্থা মনে হল ভাল। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজি এপ্রিল থেকে শান্তি প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। কাশ্মীরের মানুষের জন্য আমার মনের মধ্যে সবসময়ে একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে আমি কতবার যে কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি আর কাশ্মীর সংক্রান্ত সব বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছি। আমি যখন নতুন মেম্বার, সবে এসেছি সেই ১৯৯৬ সালেও আমি কাশ্মীরের মানবাধিকার কর্মী ও আইনজ্ঞ জলিল আনদ্রাবির দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলেছিলাম। সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব

পাইনি। আনদ্রাবি কলকাতায় এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তখন আলাপ হয়েছিল। হঠাৎ তার নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর শুনে আমি বিচলিত হয়েছিলাম। তাকে রাস্তায় নিজের গাড়ি থেকে নামিয়ে কোনও অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন পর তার দেহ ঝিলম নদীতে ভেসে ওঠে। এই ট্র্যাজিক ঘটনার কোনও সরকারি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। কাশ্মীর নিয়ে সব বিতর্কেই আমি অংশগ্রহণ করতাম। যেবার স্বশাসন নিয়ে বিতর্ক হল আমি বলেছিলাম ফারুক আবদুল্লা যেভাবে বলছেন সেভাবে না-হলেও কাশ্মীরের মানুষকে যথাসম্ভব স্বশাসন দেওয়া হোক। অন্যান্য অনেক বিতর্ক ও আলোচনায় আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম আয়ার্ল্যান্ডে যেমন দু'পক্ষে শান্তি প্রক্রিয়া চলছে সেই ধাঁচে আমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কাশ্মীরে আমি একাধিকবার গেলেও পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে এই প্রথম গেলাম। আমাদের কমিটির গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। দেখে আশ্চর্য হলাম হোটেল বেশ লোকজনে ভরতি। মাত্র এক বছর আগে সুমন্ত্র এসেছিল, সে বলেছিল হোটেল খাঁ খাঁ করছে, জনমানবহীন। অবস্থার নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়েছে। রাজ্যের পুলিশ, ডাক-তার বিভাগ, পাসপোর্ট অফিসের অধিকর্তাদের সঙ্গে আমাদের কমিটির দীর্ঘ বৈঠক হল। একদিন আমরা পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শনে গেলাম। বেশ ভিড়, অনেক লোক নতুন পাসপোর্ট করাবেন বা অন্যান্য কাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা অপেক্ষমান জনতার সঙ্গে মিশে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সকলেই বললেন শ্রীনগরের পাসপোর্ট অফিস ছিল নিতান্ত অকর্মণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু সম্প্রতি যে পাসপোর্ট অফিসার এসেছেন তার আমলে চোখে পড়ার মতো উন্নতি হয়েছে। জন শিলসি-কে আমারও অত্যন্ত পছন্দ হল। দক্ষ ও সৎ অফিসার। এসেছেন পূর্ব ভারতের সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে। ইম্ফল-এর লোক। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল খ্যাতনামা কাশ্মীরি কবি আগা শাহিদ আলির পিতৃদেব বসে আছেন। কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে বললেন পুত্র শাহিদ আলির কাছে নিউইয়র্ক যাবেন বলে রওনা হয়েছিলেন। পথে দিল্লি বিমানবন্দরে ওভারকোট চুরি হয়ে গেছে। পকেটে ছিল টিকিট, পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র। তাই ফেরত এসেছেন। আমি জন শিলসিকে ডেকে বললাম, অবিলম্বে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট ইস্যু করতে, উনি যেন অসুস্থ পুত্রের কাছে শীঘ্র পৌঁছতে পারেন।



মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সৈয়দ আমাদের চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। কন্যা মেহবুবাও যোগ দিল। মেহবুবার সঙ্গে আমার আগেই কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে কাশ্মীর নিয়ে এক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিল সে। ইয়াসিন মালিকও একই কারণে এসেছিল। নেতাজি ভবনে আই এন এ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে আমি দু'জনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। আলাপরত মেহবুবা ও ইয়াসিনের ছবি তোলার জন্য ফটোগ্রাফারদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সেদিন চা-চক্রে আমরা মুফতি মহম্মদ সৈয়দকে কাশ্মীরে যে শান্তির আবহ ফিরে এসেছে— তার জন্য অভিনন্দন জানালাম। তবে এই শান্তি ছিল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। আমরা চলে আসার পরপরই মুফতি সাহেবের সঙ্গে যেখানে আমরা চা খেয়েছিলাম সেখানেই এক বিস্ফোরণ ঘটে।

একদিন ভোরবেলা গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলে কফি নিয়ে বসে আছি খবর এল ইয়াসিন মালিক দেখা করতে এসেছে। ব্যাটরা হাসপাতালের ডা. কাউলের ঘরে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতি ইয়াসিন। আমি অবশ্য তাকে অনেকদিন আগে থেকে চিনি। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় উপত্যকায় হিংসাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে সে কারাগারে ছিল। মুক্তি পাবার পর ১৯৯৫-এর জানুয়ারিতে নেতাজির জন্মদিনের সময়ে আমরা তাকে কলকাতায় নিয়ে আসি। নেতাজি ভবনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে সে কাশ্মীরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেছিল। তার সঙ্গে সেবার জলিল আনদ্রাবি ও আরও কয়েকজন এসেছিল। সেমিনারে উপস্থিত ইতিহাসবিদ ও বিদ্বজ্জনদের সে বলেছিল, আমাদের কথা, আমরা কী চাই কেউ শুনতে চায়নি। আজকে আপনারা যেমন শুনছেন সেদিন যদি তা সম্ভব হত তা হলে হয়তো আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হত না। সেদিন সকালে হোটেলের ঘরে বসে আমরা অনেক গল্প করলাম। ফোন বেজে উঠল। আমেরিকা থেকে সুগত। ইয়াসিন ওর সঙ্গেও কথা বলল। আমরা ঠিক করলাম দিনের বেলা অফিসিয়াল কাজকর্ম চুকে যাবার পর আমি একদিন ইয়াসিনের বাড়ি যাব।

এক সন্ধ্যায় ইয়াসিন গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিতে এল। আমরা দু'জনে বেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময়ে আমাদের সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার জন্য যে

উচ্চপদস্থ অফিসার তার চোখ পড়ল আমাদের দিকে। তিনি কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, ম্যাডাম, আপনি একা বাইরে যাচ্ছেন? আপনি এর সঙ্গে যাচ্ছেন? অসম্ভব! এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারব না। ইয়াসিন ভয়ানক রেগে উঠল। সে চিৎকার করে বললে, আমি আমার দায়িত্বে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। কেউ ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি কি জানো উনি কে? উনি আমার মা। সিকিউরিটি অফিসার বিদ্রূপের সুরে বললে, তোমরা নিজের লোকেদের বাঁচাতে পারো না আর বলছ এঁকে বাঁচাবে। এই যে সেদিন অমুক নেতা গুলিতে নিহত হলেন, পেরেছিলে ওকে বাঁচাতে? আজ যদি ম্যাডামের কিছু হয়ে যায় আমি তার জন্য দায়ি হব। ম্যাডাম যদি নিতান্ত তোমার সঙ্গে যেতে চান তবে অন্তত এক জিপ ভরতি সেনা গাড়ির পিছনে যাবে। আর ম্যাডামের বডিগার্ড ওর সঙ্গে গাড়িতে থাকবে। ইয়াসিন আর সিকিউরিটি অফিসারে হাতাহাতি হবার উপক্রম। জন শিলসি মাঝে পড়ে থামাবার চেষ্টা করছে। শেষপর্যন্ত রফাসূত্র স্থির হল। আমি সামনের সিটে ইয়াসিনের পাশে বসব। পিছনের সিটে অন্তত একজন বডিগার্ড থাকবে। মনে হয় জিপ-ভরতি সেনাবাহিনীও ফলো করেছিল, তবে তারা বেশ দূরত্ব বজায় রেখেছিল।

ইয়াসিন যা বলছিল তার মধ্যে যুক্তি ছিল। সে যে এলাকায় থাকে তাকে শ্রীনগরের 'গাজা স্ট্রিপ' বলা হয়। সর্বদা গোলমাল লেগেই থাকে। নিঃশব্দে চলে যাওয়া এক হিসেবে বেশি নিরাপদ। এক গাড়ি সেনাবাহিনী সঙ্গে গেলে বিপদের ঝুঁকি বেশি। শ্রীনগরের গাজা স্ট্রিপ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির প্রবেশপথে আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি নয়— আখরোট বর্ষণ করা হল। আমাকে আগে বলা হয়নি সেদিন সকালে এক অনুষ্ঠানে ইয়াসিনের বোন আমিনার বিবাহ হয়েছে। ইয়াসিন প্রথা অনুযায়ী আমার গায়ে একটি শাল জড়িয়ে স্বাগত করল। আখরোটের পুটুলি আমার হাতে তুলে দেওয়া হল। আমার অবশ্য আমিনার জন্য শুভাশির্বাদ ছাড়া কিছুই নেই। আমিনা চমৎকার মেয়ে। তার বিয়ের খবরে আমি খুব খুশি হলাম। তেমনি ইয়াসিনকে কে দেখবে ভেবে চিন্তা হল। আমি দেখেছি ইয়াসিন জেলে থাক বা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাক আমিনা কীভাবে দেখাশুনো করে। জেলে তার উপর কোনও দুর্ব্যবহার অত্যাচার হয়েছে খবর পেলে দিল্লিতে মন্ত্রী-আমলা-নেতাদের দুয়ারে ঘুরে ন্যায়বিচার চায়। সবাই কার্পেটে বসে



কাশ্মীরি খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। আমার সিকিউরিটি গার্ডকেও তারা যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাল। সে বেচারি ঘরের একপাশে তার অস্ত্রের ট্রিগারে আঙুল রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, ডিউটিতে আছি, বসবারও অনুমতি নেই। বাকি সবাই মিলে খুব আনন্দ করা হল। মনে হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হবার পর এই প্রথম কোনও পার্লামেন্টের সদস্য এই এলাকায় পা রেখেছে। গভীর রাত্রে ইয়াসিন আবার গাড়ি চালিয়ে নির্বিঘ্নে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটেনি।

একদিন কাজে পহালগাম যেতে হল। পহালগাম আমার প্রিয় জায়গা। একসময়ে লেডার নদীর তীরে তাঁবু খাটিয়ে পাহাড়ের নির্জন সৌন্দর্যে বাস করেছি। এবার দেখলাম লোকজন বাড়িঘর অনেক বেড়ে গিয়েছে। কাশ্মীরে এলে আগের স্মৃতি মনে পড়ে। কখনও এসেছি অল্পবয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে। কখনও বা নিজের স্বামী-পুত্র কন্যা সহ। এই পাহাড়-পর্বত ছিল আমার পরিচিত এক সাধকের সাধনার স্থল। যৌবনে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করে পাহাড়ে চলে আসেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমতলে নেমে যান। পিছনে রেখে যান অনেক কাশ্মীরি বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ।

আমাদের সরকারি কাজকর্ম শেষ। এবার একদিন ডাল লেকে নৌকাবিহারে যাওয়া হবে স্থির হল। অনেকগুলো শিকারা নিয়ে আমরা লেকের জলে ভেসে পড়লাম। শিকারাওয়ালারা ভারী খুশি। মনে হল অনেকদিন পর এত খদ্দের একসঙ্গে পাওয়া গেছে। গোলমালের কারণে ভ্রমণেচ্ছুদের সংখ্যা তো খুবই কমে গিয়েছে। বিভিন্ন শিকারায় দোকানিরা ফুল, জাফরান, পাথরের মালা পসরা সাজিয়ে আমাদের শিকারার কাছে ধেয়ে এল। আমি একটা পাথরের মালা পছন্দ করলাম। দামটা অত্যন্ত বেশি চাইছে। তা হোক, কাশ্মীরের অর্থনীতিতে সামান্য সাহায্য হলেও হতে পারে।

আমাদের শিকারায় সবাই হইচই করে আনন্দ করছে। বিভিন্ন শিকারা থেকে পরস্পর হাত নাড়ছে, ক্যামেরায় একে অপরের ছবি তোলা চলছে। আমাদের শিকারায় আমি গান ধরলাম— 'বেলা বয়ে যায়—ছোট্ট মোদের পানসি তরী সঙ্গে কে কে যাবি আয়—' মিনতি সেন, সিপিএম সাংসদ আমার সঙ্গে গলা মেলাল। এমন সময়ে হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সি বার্তা এসে পৌঁছল— 'শিগগির যে যেখানে পারো তরী তীরে ভিড়িয়ে নাও। এখুনি একটা প্রচণ্ড ঝড়

ধেয়ে আসছে।' বার্তার মর্ম বুঝে ওঠার আগেই প্রবল ঝড় আছড়ে পড়ল। শিকারা বিপজ্জনকভাবে দুলছে। কোনও শিকারার ওপরের বর্ণময় ঢাকা উড়ে চলে গেল। চারিদিকে ভীত ত্রস্ত গোলমাল। আমি শান্ত হয়ে বসে আছি। ভাবলাম হাঁটুর অস্ত্রোপচারের ফলে সাঁতার কাটতে পারব না, যেখানে সেখানে তীরে উঠতে পারব না। আমার চাই সিঁড়িওয়ালা ঘাট। অতএব ভেবে লাভ নেই, যা হবার হবে। সামনেই তীর দেখা যাচ্ছে। ঠিক আগের শিকারাটা তীরে পৌঁছেছে, সবাই লাফ দিয়ে নামছে। নজরে এল আমার একান্ত অনুগত সেক্রেটারি বিশ্বনাথন লাফিয়ে নেমেই জুতো জোড়া খুলে ফেলে প্যান্টের পা গুটিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। ও জানে আমাকে সাহায্য করতে হবে। টলমল করতে করতে আমাদের নৌকো পাড়ে ঠেকল। আমরা তো উঠেছি বাকিরা কোথায়? সবাই ঠিক আছে তো? হোটেলে পৌঁছে মাথা গুনতি করা হল। সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। এবার হাসি ফুটল। সকলে বলাবলি করছে কালকের খবরের কাগজে কী দারুণ খবর হত ভাবো। ডাল লেকে নৌকাডুবিতে এতজন পার্লামেন্টের সদস্য মৃত। ইস, কী মিস হয়ে গেল!

ভোরবেলার ফ্লাইটে আমরা শ্রীনগর থেকে লাদাখ এসে পৌঁছলাম। উচ্চতা এগারো হাজার ফিটের উপরে। অনেকের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমার দুই পুত্র কেবলই ই-মেল করছিল, 'তুমি লে যাবে না।' আমাদের প্রাক্তন ফরেন সেক্রেটারি রাসগোত্র সাহেব গল্প করেছিলেন নিতান্ত অল্প বয়সে তিনি লে পৌঁছে এরোপ্লেন থেকে নামা মাত্র মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। হোটেলে পৌঁছে কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি কঠোর নির্দেশ জারি করলাম, আজ সারাদিন কেউ হোটেলের বাইরে যাবেন না। আজ পূর্ণ বিশ্রাম। কাল থেকে কাজ শুরু। দিনেরবেলা সকলেই নির্দেশ মেনেছিলেন। বিকেলের পর দেখি সবাই পথে নেমেছেন। বলতে গেলে একটিই রাস্তা, দু'দিকে দোকানপাট। সবাই ঘুরে দেখছেন। লে শহরে আমাদের সব মিটিং খুব বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হল। কোনও একটা মিটিংয়ে ওরা অনুরোধ করলেন যদি লে থেকে মানস সরোবর যাবার পুরনো রাস্তা খুলে দেওয়া যায়। চিন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই পথ খুলে দিলে খুব তাড়াতাড়ি মানস সরোবর যাওয়া যাবে। আজকাল উত্তরপ্রদেশ দিয়ে যেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। আমরা যখন লাদাখে ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী চিন সফর করছেন। খবর



পেলাম মানস সরোবরের বিকল্প রাস্তা নিয়ে আলোচনা এজেন্ডাতে আছে। পরে অবশ্য আমরা হতাশ হয়েছিলাম। বিকল্প পথ হিমাচল প্রদেশ দিয়ে হবে, লাদাখ দিয়ে নয়। লাদাখের মানুষজন খুব সরল সাদাসিধে। বেশিরভাগ বৌদ্ধ, অনেকে মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান।

লে থেকে সবাই যায় খারদুং লা, জায়গাটি ১৮,৩৫০ ফিট উচ্চতায়। কিন্তু মোটর গাড়িতে যাওয়া যায়। এটা পৃথিবীর উচ্চতম জায়গা যেখানে মোটর গাড়ি চড়ে পৌঁছনো সম্ভব। খারদুং লা না-দেখলেই নয়। এদিকে আমাদের লাদাখি বন্ধু সিদ্দিকের কম্পিউটারে সুগত ও সুমন্ত্রর উদ্বিগ্ন ই-মেল আসছে, মা যেন কিছুতেই আঠারো হাজার ফিটের উপর খারদুং লা পাসে না যান। পুত্রদের উদ্বেগ দেখে আমি ঠিক করলাম আমি যাব না। সকালের মিটিং তাড়াতাড়ি শেষ করে একদিন সব সঙ্গীদের খারদুং লা রওনা করে দিলাম। লাইন দিয়ে অনেকগুলি গাড়ি রওনা হল। একটি গাড়িতে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা ও ডাক্তার আছে। বলা তো যায় না যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবাই রওনা হয়ে যাবার পর আমি আমার ছোট গাড়িটিতে উঠে ড্রাইভারকে বললাম আমাকে একটু ওই পথে নিয়ে চলো রাস্তাটা কেমন অন্তত একটু দেখব। আমার সঙ্গে দুই মহিলা। একজন প্রবীণা, তিনি বৌদ্ধ। অন্যজন তরুণী, ধর্মে খ্রিস্টান। আমাদের গাড়ি পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে শুরু করল। দু'পাশে প্রকৃতির অপূর্ব এক রুক্ষ সৌন্দর্য। কোনও এক অজানা শক্তির উদ্দেশে মাথা নত হয়ে আসে। আমি ড্রাইভারকে বলছি, আর একটু, আর একটু দূর যাই। একসময়ে দেখলাম পনেরো হাজার ফিট উচ্চতায় পৌঁছেছি। এখানে শেষ লোকালয়। আমি আর লাদাখি প্রবীণা ঠিক আছি। কিন্তু তরুণী মেয়েটির মাথা ঘুরছে। তার মাথায় জল দেওয়া হল। পনেরো হাজার পৌঁছে ফিরে যাব? চলো আরও যাই। এরপর থেকে পথ বেশ খারাপ। একসময়ে পৌঁছে গেলাম খারদুং লা। আমাদের এম পি-দের বিশাল ক্যারাভান তখনও সেখানে আছে।

আমাকে দেখে সবাই চমকিত। করেছেন কী! এভাবে একা কেউ আসে। সাবধানে গাড়ি থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে ক্যামেরাতে ছবি তুললাম। তারপর চুপচাপ গাড়িতে বসলাম। সূর্যাস্তের আগেই হোটেলে পৌঁছলাম। এদিকে লাদাখ সরকার ডিনারের ব্যবস্থা করেছেন, আর আছে লাদাখি নৃত্য।

লাদাখি নৃত্য খুব ধীর লয়ে হয় দেখলাম। তাদের নিজস্ব পোশাক পরে হাতে রঙিন স্কার্ফ নিয়ে একদল ছেলেমেয়ে ধীরে ধীরে নেচে চলেছে। তাদের

মধ্যে থেকে কয়েকজন আমার দিকে এসে হাত ধরে দলে টেনে নিল। অতএব স্কার্ফ হাতে আমিও তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচে যোগ দিলাম। আমার এম পি বন্ধুরা হইহই করে উঠলেন। অনেকে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। খুব আনন্দময় পরিবেশ। সিদ্দিক তাড়াতাড়ি আমার দুই পুত্রকে ই-মেল পাঠাল— খারদুং লা পাস ও তারপর লাদাখি নৃত্য সত্ত্বেও মা ভাল আছেন, চিন্তা কোরো না।

সিদ্দিক আর তার স্ত্রী আমাকে নিয়ে গেল একদিন সিন্ধু নদের উৎসের কাছে। জলে আঙুল ডুবিয়ে নীরবে বসে রইলাম। এই সেই সিন্ধু নদ পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের পাকিস্তানি বন্ধু ইকবাল আহমেদের কথা মনে পড়ল। সে বলত ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি সবই আমাদের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে রেখেছে, ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আজ যদি একটি গাছের চারা পেশোয়ারে লাগাই দেখবে বছর দুয়েক বাদে তোমাদের বাংলায় সেই গাছ পৌঁছে গেছে।

লাদাখে আছে অনেক সুন্দর মঠ। পাহাড়ি পথে সিঁড়ি ভাঙতে হয় বলে আমি যাই না। বিশ্বনাথন কোনও এক মনাস্টারি থেকে এনে দিল জপের মালা।

লাদাখ থেকে আমরা নেমে এলাম জম্মুতে। লাদাখের শান্ত পরিবেশের পর এই প্রথম একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম। এখানে মানুষ শান্তিতে নেই। যারা শহরের বাইরে থাকে তারা বললে দিনেরবেলা বিশ্রাম করি রাত জেগে এলাকা পাহারা দিই। অনেকে বললে উপত্যকা থেকে এখন সন্ত্রাসবাদীদের নজর সমতলে নেমে এসেছে। জম্মুতে অল্পদিন ছিলাম। কারও বাড়ি গিয়ে দেখা করার সময় নেই। তাই বন্ধুবর কাশ্মীর টাইমস পত্রিকার সম্পাদক বেদ ভাসিন হোটেলে চলে এলেন দেখা করতে। ওর সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনা হল। জম্মু থেকে সবাই বৈষ্ণোদেবী দেখতে যায়। আমরাও ঠিক করলাম পাহাড়ের দিকে যাব। পাহাড়ে যাওয়া ও ফেরার পথে লক্ষ করলাম পথের দু'ধারে অল্প ব্যবধানে সেনাবাহিনীর সেনারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নেহাত বেমানান। শুনলাম এরা ডিউটিতে আছে। এদের খাবারও পৌঁছে দেওয়া হয়। কোথাও নড়বার উপায় নেই। বিপজ্জনক ডিউটি। পিছনের পাহাড় ও জঙ্গল থেকে যে-কোনও সময়ে হামলা হতে পারে। সব তরফেই



মানুষ এখানে ত্রাসের মধ্যে বাস করে। কবে যে এই সমস্যার সমাধান হবে, শান্তি ফিরবে কে জানে।

পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশন বা মনসুন সেশন শুরু হল। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তার জার্মানি সফর ও চিন সফরের ওপর রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করলেন। আগস্টের মাঝামাঝি বিরোধী পক্ষ বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। ১৯ আগস্ট ২০০৩-এ তার উপর বিতর্ক হল। দু'পক্ষ থেকেই ক্লান্তিকর, মাঝারি মানের দীর্ঘ বক্তৃতা হল। সরকারের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হল না।

অধিবেশন চলাকালীন আমাদের অনেক সময় কাটত সেন্ট্রাল হল-এ। কে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল দিল্লিতে পার্লামেন্ট জীবন ছেড়ে আসার পর আপনি সবথেকে বেশি কী মিস করেন। আমি জবাবে বলেছিলাম, সেন্ট্রাল হল। সেন্ট্রাল হল-এ প্রবেশ করলে রাজনীতিকদের এক অন্য চেহারা চোখে পড়ত। যা কিছু বাক্-বিতন্ডা মনোমালিন্য পিছনে ফেলে এসে এখানে সবাই খোলামনে মিশতেন। ওই যে দু'জন সাংসদ পাশাপাশি বসে কফি খেতে খেতে গল্প করছেন কে বলবে মাত্র দু' মিনিট আগে চেম্বারের ভিতরে দু'জনে প্রবল বাক্-বিতণ্ডা করছিলেন।

আমি যখন প্রথম পার্লামেন্টে এলাম বাজপেয়ীজি বিরোধী দলনেতা। ওকে সেন্ট্রাল হল-এ বেশি বসতে দেখিনি। তবে অধিবেশনের ফাঁকে ওকে মাঝে মাঝেই কফি কর্নারের একপাশে দাঁড়িয়ে টোস্ট আর কফি খেতে দেখতাম। পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাতজোড় করে নমস্কার করতাম। উনি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতেন। তখন আমার ওর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়নি। পরবর্তীকালে যথেষ্ট কাছে থেকে জানবার সুযোগ হয়েছিল। মন্ত্রী মহাশয়েরা সাধারণত সেন্ট্রাল হল-এ নগণ্য সব সদস্যদের সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করতেন না। অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। তিনি যখন হোম মিনিস্টার রোজ আমাদের সঙ্গে বসে লাঞ্চ খেতেন। লাঞ্চের সময়ে সেন্ট্রাল হলে ঢুকলেই ইন্দ্রজিৎবাবুর আহ্বান কানে আসত— মিসেস বোস, কী খাবেন? পোংগল বলব না উপ্মা? খাওয়া যা-ই হোক ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করা একটা অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ছিলেন বিগত যুগের একজন পার্লামেন্টেরিয়ান। দেশের জরুরি সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনার জন্য পার্লামেন্টের সভা বসত। সভায় যারা যোগ দিতেন তাদের

ব্যবহার হত সভ্যোচিত। সভায় বিতর্কের মান যেভাবে নেমে যাচ্ছে, অনেক সদস্য যেভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেন— এসব দেখে উনি দুঃখ পেতেন। পরবর্তীকালে আর এক গৃহমন্ত্রী বা হোম মিনিস্টার হলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। প্রায়ই দেখা যেত লম্বা পা ফেলে তিনি পুরো সেন্ট্রাল হল পার হয়ে অপর দিকে নিজের অফিসঘরে চলেছেন। তার আচরণে ছিল সবসময়ে সৌজন্যের প্রকাশ। তার পথে যারা পড়বেন তাদের কুশল সংবাদ নেওয়া চাই। মুখোমুখি হলেই দাঁড়িয়ে যাবেন, 'কৃষ্ণাজি, কেমন আছেন? শিশিরকুমারজির কী খবর? বেটা-বেটিরা সব কোথায়?' তবে পার্লামেন্টের সবচাইতে বর্ণময় ব্যক্তিত্ব লালুপ্রসাদ (যাদব)। চারিদিকে পারিষদবৃত হয়ে লালুজি সেন্ট্রাল হল-এ ঘুরছেন। যেন সঙ্গে চলেছে ছোটখাটো শোভা যাত্রা। পারিষদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে যদি কখনও চোখ পড়ে যায় আমার দিকে তবে অবশ্যই হাঁক দেবেন— দিদি, নমস্তে!

অন্যান্যদের মধ্যে দেখতাম সনিয়া গাঁধীকে, তিনি তখন বিরোধী নেত্রীর ভূমিকায়। শীতকালে শাড়ির ওপর একটি কালো রঙের শর্ট কোট পরা। যখন প্রবল গ্রীষ্ম তখন ভারতের নানা রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সুতির শাড়ি— হয়তো বা কেরলের ধবধবে সাদা শাড়িতে সোনালি পাড়। পনিটেল করে বাঁধা চুল হাঁটার তালে তালে দুলছে। তিনিও কখনও-সখনও পারিষদবৃত হয়ে বসেন। কংগ্রেসের মহিলা সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে কত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। কেউ বা তাড়াতাড়ি বেয়ারাকে ডেকে বলে দেন ম্যাডাম কফিটা কড়া পছন্দ করেন। আমার সঙ্গে ঘটনাচক্রে সনিয়ার বেশি দেখা হয়ে যেত লেডিজ রুমের সামনে। সেখানে দুটো ওয়াশরুমের সামনে অপেক্ষারত অবস্থায় দু'-চার কথা হচ্ছে। হয়তো একটা দরজা খুলে গেল সনিয়া সৌজন্য দেখিয়ে সর্বদা আমাকে অগ্রাধিকার দেবেনই। একদিন একইসঙ্গে দুটো দরজা খুলে গেল। আমাকে বিস্মিত করে সনিয়া আমার জন্য ইয়োরোপিয়ান স্টাইলেরটা ছেড়ে দিয়ে নিজে ভারতীয় স্টাইলে ঢুকে গেলেন। আমি মনে ভাবলাম এর পরও এরা একে বিদেশিনী বলে কেন!

সিরিয়াস আলোচনা যে না হয়েছে তা নয়। মহিলা বিল পাশ করানোর ব্যাপারে ওর যথেষ্ট আগ্রহ দেখেছি। আমি যখন ওকে আমার বিকল্প প্রস্তাবের কথা বলি তখন উনি সেই প্রস্তাব দলের বিশিষ্ট কয়েকজনকে দেখতে বলেন। কপিল সিবাল দেখেছিলেন। সনিয়া আমাকে বলেন উনি ৩৩% সংরক্ষণ নিয়ে



মহিলা বিলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি তা একেবারে ব্যর্থ হয় তখন আমার বিকল্প বিবেচনা করা যাবে।

অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ অধিবেশনও দেখেছি সেন্ট্রাল হল-এ। এই গোলাকৃতি হলঘরের দেওয়াল থেকে দেশের শ্রদ্ধেয় নেতারা চেয়ে রয়েছেন উত্তরসূরিদের দিকে। হল-এর পুরনোদিনের দাঁড় করানো পাখাগুলো আজও মন্দমধুর ছন্দে ঘুরছে। সব অধিবেশনের গোড়াতে বা অন্য কোনও বিশেষ দিনে ভারতের রাষ্ট্রপতি এই সভাঘরে রাজ্যসভা ও লোকসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। অন্তত তিনজন রাষ্ট্রপতিকে এই ভূমিকায় একাধিকবার দেখার সুযোগ হয়েছে শংকরদয়াল শর্মা, কে আর নারায়ণন, আবদুল কালাম। রাষ্ট্রপতি দক্ষিণের একটি দরজা দিয়ে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করতেন। সঙ্গে থাকতেন উপরাষ্ট্রপতি, স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী। পিছনে রঙিন পাগড়ি মাথায় বর্ণময় পতাকা হাতে প্রহরী। গাম্ভীর্যপূর্ণ, উজ্জ্বল মিছিল। মন্ত্রীরা সামনের আসন আলো করে বসতেন। পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারম্যানরাও আধা-ভি আই পি পর্যায়ে পড়েন। আমাদের আলাদা আসন রক্ষিত থাকত। আমি কোনওদিন সেখানে বসিনি। অধিবেশন কক্ষের শেষদিকের একটি দরজার নিকটবর্তী আসন খুঁজে বসতাম। সেখান থেকে পুরো শোভাযাত্রা দৃষ্টিগোচর হত।

বিশেষ অধিবেশনগুলোর মধ্যে মনে রাখার মতো ছিল ১৯৯৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের মধ্য রাতের অধিবেশন। সভাকক্ষ ভিড়ে উপচে পড়ছে। শিশিরকুমার বসু আমার সঙ্গে ছিলেন। অন্যপাশে উত্তরপ্রদেশের রামপুরের বেগম নূর আর জিতেন্দ্রপ্রসাদ। নেহরুর বিখ্যাত Tryst with Destiny বক্তৃতা যখন বাজিয়ে শোনানো হল আমার মনে পড়ছিল পঞ্চাশ বছর আগে দিল্লির নিকলসন রোডের বাসভবনে বসে আমি রেডিয়োতে এই বক্তৃতা শুনেছিলাম। হলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস ও করতালি বা ডেসক চাপড়ে অভিনন্দন শোনা গেল যখন সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। নেতাজির কণ্ঠস্বর যেন মহাত্মা গাঁধী ও নেহরুর বক্তৃতার সঙ্গে বাজানো হয় এই দাবি নিয়ে আমাকে স্পিকারের কাছে, পার্লামেন্টে জিরো আওয়ারে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গুজরালের কাছে অনেক দরবার করতে হয়েছিল। সমবেত অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ দেখে খুব পরিতৃপ্ত বোধ হল। চেয়ে দেখলাম সেন্ট্রাল হল-এ দেওয়ালে চিন্তামণি কর-এর আঁকা

নেতাজির প্রতিকৃতি, হাতে আজাদ হিন্দ সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুখে প্রশান্ত অভিব্যক্তি।

নানান ব্যস্ততা, লোকজনের যাওয়া-আসায় দিল্লির দিন কাটতে লাগল। সুধা মুরথি একদিন এসে আমার ও সুগতর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেলেন। ইনি ইনফোসিসের নারায়ণ মুরথির স্ত্রী। কিন্তু নিজগুণেই ইনি বিশিষ্ট ও সর্বজন পরিচিত। সুধা মুরথির সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার খুব ভাল লেগেছিল। সুধা পরে কলকাতায় এলেন, নেতাজি ভবনে এলেন। হার্ভার্ডে একটি কনফারেন্সে আবার আমাদের দেখা হল।

একদিন শ্যাম বেনেগাল দেখা করতে এলেন। তিনি তখন 'নেতাজি' ছবিটির শুটিং নিয়ে খুব ব্যস্ত। তিনি এমন একটা অভিজ্ঞতার কথা বললেন যে শুনে আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। যুদ্ধের দৃশ্য শুটিং করার সময়ে আর্মি সব পরিচালকদের সাহায্য করেন। কাশ্মীর নিয়ে ছবি হয়েছে, চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ছবি হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকজন সেসব ছবিতে অংশ নিয়েছে। শ্যাম বেনেগাল সুভাষচন্দ্রের উপর 'বোস, দ্য ফরগটেন হিরো' ছবিটি করার ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। ওকে বলা হয়েছে এসব ফিলমের ব্যাপারে সেনারা শুটিংয়ের প্রয়োজনে পাকিস্তানি বা চিনা সৈনিকের পোশাক পরতে পারেন কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের ইউনিফর্ম পরতে পারবেন না, নিষেধাজ্ঞা আছে। শুনে আমি স্তম্ভিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তি ফৌজ তাদের সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা! আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নানডেজকে ধরবার চেষ্টা করলাম। তিনি তখন দেশের বাইরে। আমি জিরো আওয়ারে বক্তব্য রাখার জন্য নোটিশ দিলাম। আমি যখন পার্লামেন্টের 'জিরো' আওয়ারে প্রতিবাদ করে বক্তব্য রাখছি তখন কংগ্রেসের চিফ হুইপ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে আমি সম্পূর্ণ একমত, আমার দল এই বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের অ্যাসোসিয়েট করছে। ডিফেন্স মিনিস্টার অধিবেশন কক্ষে অনুপস্থিত। স্পিকার নির্দেশ দিলেন এই জিরো আওয়ারের বক্তব্য অবিলম্বে তাকে জানানো হোক। আমি একটা কয়েক লাইনের জবাব পেলাম যাতে এই জঘন্য প্রথার কোনও ব্যাখ্যা নেই। কয়েকদিন পর জর্জ ফার্নানডেজ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বললেন আই এন এ সম্পর্কে এই ধরনের নিয়মকানুন মাউন্টব্যাটেন শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং নেহরু তার কোনও প্রতিবাদ করেননি। আমি জিজ্ঞাসা



করেছিলাম পরবর্তীকালের সরকার বা আপনারাও কী করছেন। উনি তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। 'পোস্ট-কলোনিয়াল' মানসিকতার শিকড় যে কত গভীরে তা সেদিন হতাশভাবে উপলব্ধি করলাম। ক্ষমতাসীন সরকারের তরফে যতই অবহেলা, ঔদাসিন্য দেখানো হোক না কেন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর হৃদয়ে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্থান অমলিন ও অটুট রয়ে গেছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশনস বা ICCR-এর কাজকর্মের প্রতি আমার খুব নজর ছিল। কূটনীতির নানা স্তর আছে। আজকাল রাজনৈতিক কূটনীতির চাইতেও অনেক সময় অর্থনৈতিক কূটনীতি বা ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। আমার মনে হয়েছিল কালচারাল ডিপ্লোম্যাসি বা সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যে কূটনীতি তারও গুরুত্ব আছে। ICCR-কে শুধু একটা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে না-রেখে আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে ভাল হয়। বিদেশমন্ত্রকের বাজেট যখনই আমাদের কমিটিতে অনুমোদনের জন্য আসত আমি এদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। নতুন ভাবনা-চিন্তা কী করা যায় আলোচনার জন্য আমি একবার আমাদের কমিটিতে বিশিষ্ট চিত্রকর, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী, শিক্ষাবিদ এদের আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা তাদের অভিমত দিলেন। সোনাল মান সিং নিজে উপস্থিত হতে পারেননি বলে দীর্ঘলিখিত নোট পাঠিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রোগ্রাম হয় তার সম্বন্ধে সমালোচনা ছিল যে সেটা বিশেষভাবে দিল্লিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। পূর্ব ভারত বা দক্ষিণ ভারত অবহেলিত হয়। এইসব আলোচনার ফলে ICCR-এর কাজকর্মে ভবিষ্যতে গতি এসেছিল। নানান বিষয়ের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান সুসম্পর্ক স্থাপনের পদক্ষেপও বিদেশ কমিটির একটি আলোচনার বিষয় ছিল। ভারত-পাক সম্পর্ক সর্বদাই এমন একটা দোলাচল অবস্থায় থাকত যে খুব কিছু করে ওঠা সম্ভব হত না। এই হয়তো শান্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে, পরমুহূর্তেই যুদ্ধং দেহি মনোভাব।

মাঝে মাঝেই দিল্লি-কলকাতা করতে হয়। নিজের কেন্দ্রের নানান কাজ থাকে। একবার তখনকার মেয়র সুব্রত মুখার্জি ক্রিকেট তারকা সৌরভ গাঙ্গুলিকে বড় করে সংবর্ধনা দিলেন। আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করলেন

সৌরভ ও ডোনার হাতে উপহার তুলে দিতে হবে। টাউন হল-এ সভা হল। ডোনার গলায় একটি সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিলাম মনে পড়ছে। গাঙ্গুলি পরিবার একসময়ে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। আমার প্রথম নির্বাচনে ওদের পারিবারিক সমর্থন পেয়েছিলাম। পরে ওরা অন্য মতের শরিক হন। তবে পরস্পর সৌহার্দ্য বা সৌজন্যের কোনও অভাব হয়নি। একবার লন্ডনের প্লেনে সৌরভ, ডোনা, আমি একই সঙ্গে যাত্রী। সৌরভ আমাকে বলেছিল— 'আপনি না রাজনীতিতে থাকবেন না, আপনাকে মানায় না।'

পনেরোই আগস্ট এসে পড়ল। প্রতিবারের মতো বেহালার একটি জনসভায় ১৪ তারিখ রাত বারোটায় পতাকা উত্তোলন করলাম। পরদিন সকালে বেহালা, কবিতীর্থ বিভিন্ন জায়গায় পতাকা তুলতে হল। সেবার অর্থাৎ ২০০৩ সালের আগস্টে মমতা আসানসোলে তৃণমূল কংগ্রেসের এক অধিবেশন করবে স্থির করল। কলকাতা থেকে যাব বলে আমি একটি টয়েটা কোয়ালিস গাড়ি ভাড়া করলাম। অন্য কর্মীরাও সঙ্গে যাবে। একটি অল্পবয়সি মুসলিম ড্রাইভার পাওয়া গেল। ভাল গাড়ি চালায়। ভোরবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে রতন, অনির্বাণ, শম্ভু, রঞ্জন, অমলা। রাস্তার অবস্থা খুব ভাল না-হলেও খারাপ নয়। তবে দু'দিক থেকে বিশাল সব ট্রাক ক্রমাগত যাতায়াত করছে। আমার চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল। স্বপ্নে দেখছি একটা ট্রাকের সঙ্গে আমাদের গাড়ির ধাক্কা লেগে গেছে। দুর্ঘটনার কথা কেউ জানে না। আমাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। খবরের কাগজ অফিসে খবর পৌঁছে গেছে। এমন সময়ে তন্দ্রা ভেঙে গিয়ে চোখ খুললাম। সামনেই একটা দৈত্যের মতো ট্রাক একেবারে আমাদের গাড়ির ওপর এসে পড়ছে। কেমন যেন শান্তভাবে চেয়ে রইলাম, শুধু মনে হল— উঃ এবার ভীষণ জোরে আওয়াজ হবে। যেন আওয়াজ হওয়াটা একমাত্র ঘটনা। গাড়ির পিছন দিক থেকে ভয়ার্ত আর্তনাদ ভেসে এল। আমার পাশে বসা তরুণ ড্রাইভার গাড়িটা ডানদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে প্রাণপণে ব্রেক কষল। দেখলাম মাত্র একচুল তফাতে আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছি। অলৌকিক কাণ্ড, যাকে বলে hair's breadth escape!

পৌঁছে দেখলাম এ ধরনের কনফারেন্সে যেমন হয়, কোলাহলমুখর পরিবেশ। বাইরে থেকে আসা ডেলিগেশন সামলাতে স্থানীয় নেতৃত্ব ব্যতিব্যস্ত। একটি গেস্ট হাউসে আমার ও আমার দলবলের থাকার ব্যবস্থা



হয়েছে। অন্য একটিতে ডা. রঞ্জিত পাঁজা, ডা. বিক্রম সরকার এরা উঠেছেন। বেশ উৎসবের পরিবেশ। পরদিন সিরিয়াস কাজকর্ম শুরু হল। একটি সিনেমা হল-এ অধিবেশনের আয়োজন। বিদেশনীতি বিষয়ে যে সেশন মমতা বলে রেখেছে সেখানে আমি প্রস্তাব পেশ করব। সেইমতো তৈরি হয়ে এসেছি। আমি প্রস্তাব পেশ করার পরে সুব্রত মুখার্জি উঠে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখলেন। ফরেন পলিসির উপর প্রস্তাব আমি ইংরেজিতে রেখেছিলাম। মনে হয় সাধারণ কর্মীদের কথা ভেবে বাংলাতে রাখলেই ভাল হত। সকলেরই সময় বাঁধা ছিল— তাই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেবারও সুযোগ ছিল না।

নানান কাজের ফাঁকে একদিন ভোরবেলা অন্যান্য অনেকের মতো আমরাও কল্যাণেশ্বরী মন্দির দেখতে গেলাম। কালীমন্দির, শোনা যায় দেবী খুব জাগ্রত। আমি ছেলেবেলায় এই মন্দিরে বেশ কয়েকবার এসেছি। সেকালের সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট অঞ্চল ছিল মিহিজাম। সেখানে বাবা বাড়ি করেছিলেন, নাম ছিল বেণুবন, বৌদ্ধ মঠের নামে। তখন কল্যাণেশ্বরী মন্দির ছিল নির্জন শান্ত পরিবেশে এক প্রাচীন কালীমন্দির। অজয় নদীর ধারে দিন কাটিয়ে গোরুর গাড়িতে করেও ফিরে গিয়েছি। এখন দেখলাম শহুরে পরিবেশ, ভক্তদের ভিড়। জাগ্রত কালীর কাছে মনোবাসনা জানিয়ে অনেকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি গাছের ডালে নুড়ি বেঁধে দিচ্ছেন। নিয়ম হল মনোবাসনা পূর্ণ হলে আর একবার এসে নুড়িটি খুলে ফেলতে হবে। সবাইকে দেখে আমিও নুড়ি বাঁধলাম গাছের ডালে। মনোবাসনা পূর্ণ হবার অপেক্ষায় আছি।

শেষদিনে বাইরে মাঠে মস্ত জনসভাতে মমতার বক্তৃতা হয়ে অধিবেশন শেষ। ওদিক থেকে কলকাতা ফিরবার পথে সকল যাত্রীদের একটা অবশ্য কর্তব্য থাকে। বর্ধমানের কাছে শক্তিগড়ে গাড়ি থামিয়ে সেখানকার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ল্যাংচা কিনে নিয়ে যাওয়া। আমরাও অন্যদের সঙ্গে যোগ দিলাম। চারিদিকে 'ল্যাংচা মহল', 'ল্যাংচা ঘর', 'ল্যাংচা প্যালেস' রকমারি দোকান। এক মস্ত মাটির হাঁড়ি ভরতি ল্যাংচা নিয়ে কলকাতার পথে রওনা।

কলকাতা ফিরেই দিল্লিতে দৌড়তে হল। ক্রিশ্চিনা রোকা আমেরিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট একটা ডেলিগেশন নিয়ে দিল্লি এসেছেন। সরকারি স্তরে আলাপ আলোচনা ছাড়াও শিল্পমহলের সঙ্গে ওর কথোপকথন হল। ওর সম্মানে ফিকি (FICCI) লাঞ্চ অধিবেশন ও সি আই আই (CII) ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল। ওর ডেলিগেশনের সদস্যদের মধ্যে একজন

ছিলেন ডেভিড গুড। তিনি ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার ভারপ্রাপ্ত। তার সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হল আর ভারত ও তার প্রতিবেশীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হল। তিনি দিল্লির কাজ সেরে কলকাতায় এলেন। আমার সঙ্গে আবার দেখা হল। ডেভিড গুড নেতাজি ভবনও দেখে গেলেন। পরবর্তীকালে উনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের চাকুরি ছেড়ে যখন অন্য কাজ নিলেন তখনও আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে, যোগাযোগ রয়েছে। এবার দিল্লিতে থাকার সময়ে আমি কপিল সিবালের সঙ্গে কথা বললাম। সেপ্টেম্বরে নেতাজি ভবনে আমরা শরৎ বসু লেকচার-এর ব্যবস্থা করে থাকি। কপিলকে আমি অনুরোধ করলাম এ বছরের বক্তৃতাটা যেন উনি দেন। কপিল সিবাল সেবার 'মাইনরিটি রাইটস'— সংখ্যালঘুদের অধিকারের উপর চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সুগত যে 'সাউথ এশিয়া ইনিশিয়েটিভ' গড়ে তুলেছিল, তার কাজকর্ম ভালভাবে শুরু হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে তারা 'সাউথ এশিয়া উইদাউট বর্ডার' পর্যায়ের প্রথম কনফারেন্স আয়োজন করেছে। আমি সেই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন ছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এসেছিলেন। আমি যে অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছিলাম সে অধিবেশনে আমার সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের সৈয়দা আবিদা হুসেন, বাংলাদেশের আবুল হাসান চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক নূর ইয়ালমান। এই কনফারেন্সের উদ্বোধন বেশ বড় করে চালর্স হোটেলের কেনেডি রুমে হয়েছিল। 'কী-নোট' অ্যাড্রেস বা প্রধান উদ্‌বোধনী বক্তৃতা করেছিলেন অমর্ত্য সেন। অন্যান্যদের মধ্যে সুগত বলেছিল, আর বক্তব্য রেখেছিলেন হার্ভার্ডের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ল্যারি সার্মাস। একদিন দুপুরের অধিবেশনে লেখক অমিতাভ ঘোষ তার নতুন প্রকাশিতব্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি (হাংরি টাইডস) থেকে পড়ে শোনালেন। সভাপতি ছিলেন ডিন বিল কার্বি। আর অধ্যাপক হোমি ভাবা একটি চমৎকার সাহিত্যমনস্ক ভাষণ দিয়েছিলেন। কনফারেন্সের শেষদিনে সুগত ও আয়েষা বাড়িতে সব ডেলিগেটদের জন্য ফেয়ারওয়েল ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল।

কলকাতা ফেরার পথে লন্ডনে কয়েকদিন সুমন্ত্রর সঙ্গে কাটালাম। কিছু অন্য কথাবার্তাও হল। লন্ডনে তখনও আমাদের হাইকমিশনার রণেন সেন,



আর ডেপুটি হলেন সত্যব্রত পাল। দু'জনের সঙ্গেই আলোচনা হল। সেই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ লন্ডনে এলেন। লন্ডনের পথে তার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ হল। এর আগেরবার আরও তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। এবারও কম নয়। আমার যেন কোথায় যাবার ছিল। ভিড়ের জন্য সব ক্যাব যেতে অস্বীকার করাতে বাতিল করতে হল। লন্ডনের পক্ষে কয়েকটা খুব রোদ ঝলমল দিন পেলাম। সুমন্ত্রর বাড়ির পিছনে বাগানে প্রচুর গোলাপ ফুল ফুটেছিল।

লন্ডন থেকে দেশের পথে রওনা হলাম সেপ্টেম্বরের ত্রিশ তারিখ, শিশিরের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এরোপ্লেনে মন খারাপ করে বসেছিলাম। কবে যেন আমার বালক দৌহিত্র টুংকু আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল আমাদের দু'জনের দেখা হবে 'আপ দেয়ার'। প্রতীক্ষায় রয়েছি।

কলকাতায় ফিরতেই দুর্গাপুজোর বাজনা বেজে উঠল। পুজোর সময়ে কতকগুলো অবশ্য করণীয় কাজ থাকেই। যেমন ঘুরে ঘুরে এলাকার পূজা উদ্‌বোধন। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বস্ত্র বিতরণ। বেহালা পূর্বের একটি ওয়ার্ডে আমাদের কাউন্সিলার রত্না শূর পাড়ার গরিব বাচ্চাদের আমার হাত দিয়ে প্রতি বছর নতুন জামা দেবার আয়োজন করতেন। জামা হাতে বাচ্চাদের উজ্জ্বল মুখগুলো বড় আনন্দ দিত।

বিদেশমন্ত্রক কমিটির একটি বৈঠক কলকাতায় ডেকেছিলাম। কলকাতায় আই সি সি আর -এর মস্ত বাড়ি তৈরি হচ্ছে হো চি মিন সরণিতে। এই বাড়ির জন্য টাকা বরাদ্দ করা, বাড়ির নির্মাণ কাজ কেমন চলছে দেখা সবই বিদেশমন্ত্রক কমিটির কাজ। সব সদস্যদের নিয়ে নির্মীয়মাণ বাড়ি দেখতে যাওয়া হল। হো চি মিন সরণিতে ঠিক উলটো ফুটপাথে আমেরিকার কনসুলেট, সঙ্গে বাসস্থানও। ফলে সিকিউরিটির নানা ঝামেলা। লরি-বোঝাই ইট নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। দেখে ভাল লাগে সেই বাড়ি আজকে রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার হিসেবে শহরের একটি সাংস্কৃতিক দিকচিহ্ন।

বিদেশমন্ত্রক কমিটির সদস্যদের জন্য তাজ বেঙ্গলে ডিনার ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল। বাহাদুর খানের পুত্র সরোদ বাজালেন। কলকাতার শিল্পীমহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই উপস্থিত। কলকাতায় যতবার বিদেশমন্ত্রক কমিটির মিটিং হত আমি নিজের বাড়িতে থাকতাম, হোটেলে থাকিনি। বাইরে থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে হত।

এবার কিন্তু এক সন্ধ্যায় আমি অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাজ বেঙ্গলে চেক ইন করলাম। তার কারণ পরদিন ভোরবেলার ফ্লাইটে আমরা পুরো কমিটি আন্দামানের পথে রওনা হব। আন্দামানে আমাদের এই কমিটি মিটিং বলতে গেলে এ বছরের শেষ ট্যুর। 'বে আইল্যান্ড' হোটেলে পৌঁছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। বহু বছর আগে শিশির আর আমি আন্দামানে এসেছিলাম। তখনও আমার এই সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল— যত্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তি, স্তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্।

সেবার শিশির আর আমি এসেছিলাম নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ওপর একটি প্রদর্শনী নিয়ে, প্রদর্শনী দেখতে লোক ভেঙে পড়েছিল। নেতাজি ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্দামান এসেছিলেন। তিনি সেলুলার জেলকে ফ্রান্সের বাস্তিল কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আন্দামান ও নিকোবরের উনি নূতন নামকরণ করেছিলেন 'শহীদ' ও 'স্বরাজ'। আন্দামান ও নিকোবরই আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম স্বাধীন ভারতীয় ভূখণ্ড। শিশির ও আমার কাছে সেবারের আন্দামান যাত্রা ছিল এক সেন্টিমেন্টাল জার্নি। আমি এই দ্বিতীয়বার আন্দামানে এলাম। শিশির অবশ্য রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে ১৯৮৮ সালের ২৩ জানুয়ারি আন্দামানে নেতাজির জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। সেবার নেতাজি ভবনের ভার আমাকে সামলাতে হয়েছিল।

আমাদের কমিটির আন্দামানের অফিসারদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হল। একদিন গভর্নর এন এন ঝা-র সঙ্গে মিটিং ছিল। তিনি আমাকে বললেন, ডা. শিশির বসুর সঙ্গে আমার খুবই পরিচয় ছিল। উনি আমাকে ওর 'গ্রেট এসকেপ' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস জেভিয়ার বলে আন্দামান প্রশাসনের একজন অফিসার আমাকে বললেন, যখন রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ এসেছিলেন তখন ডা. বসুকে দেখাশুনোর ভার আমার দায়িত্ব ছিল। আমি ওকে সেলুলার জেল এবং নেতাজি সম্পর্কিত দ্রষ্টব্য ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম।

সরকারি কাজকর্ম শেষ করে আমরাও সেলুলার জেল দেখতে গেলাম। আমার কমিটির সকল সদস্যই অভিভূত হয়ে গেলেন। এই কারাগারে কত বিপ্লবীর জীবন কেটেছে, কত তরুণ দেশের কাজে এইখানে ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান সেইসব তরুণের নাম মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। বিপ্লবীরা বেশিরভাগ পঞ্জাব ও বাংলা



থেকে। জেল দেখতে এসেছেন যারা তারা ফাঁসির মঞ্চ, ফাঁসির দড়ি তীর্থযাত্রীর মতো দেখছেন। আর একদিন লঞ্চে করে যাওয়া হল রস আইল্যান্ড, এই দ্বীপে একসময়ে ব্রিটিশ কমিশনার থাকতেন পরে আজাদ হিন্দ সরকারের হেড কোয়ার্টার হয়েছিল এখানে।

কালীপূজার সময়ে কলকাতা থেকে আমার কর্মীরা দাবি করতে থাকলেন যেন পূজার সময়ে কলকাতায় থাকি। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে খবর দিল ওইদিন কানাডার প্রধানমন্ত্রী আসছেন। আমি একটু দ্বিধা করে কলকাতায় কর্মীদের সঙ্গে কাটাব স্থির করলাম। এবার ঘুরে ঘুরে কালীপূজা উদ্বোধন। সেই সঙ্গে অনেক জায়গায় কম্বল বিতরণ। বাড়িতেও আলো দিয়ে সাজানো। দেখতে দেখতে ঈদ এসে পড়ল। ঈদের সময়ে প্রতিবারের মতো ষোলো আনা মসজিদের সামনে দাঁড়ানো। নমাজ শেষে সকলে বার হলে ঈদ মুবারক জানানো। আমার সঙ্গে গোলাম কাদের, কুরবান আরও কর্মীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। ষোলো আনা মসজিদের জন্য আমার এম পি তহবিল থেকে ওখানকার কবরস্থানের উন্নতির জন্য কিছু করতে পেরে ভাল লেগেছিল। ওই এলাকার সকল মাদ্রাসা ও স্কুলের জন্যও যথাসাধ্য করেছিলাম। সব কাজই করতে হত রাজ্য সরকারের এজেন্সি মারফত। আমি চলে আসার পর অনেক প্রজেক্টের কাজই ওরা আর করে ওঠেননি।

দিল্লি-কলকাতা জীবন চলতে লাগল। হয়তো আজ সকালে দিল্লিতে লাওস থেকে আসা মহিলা সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করলাম, দুপুরে উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট কমিটির অধিবেশন, রাত্রে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে রিসেপশন। পরদিন হয়তো চলে এলাম কলকাতায়। বেহালায় অ্যাম্বুলেন্স দিলাম, বারুইপুরে বইমেলা উদ্ঘাটন, আটঘরা নামে এক ছোট গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলন ও বৈঠক। যখনই গ্রামে যেতাম গ্রামবাসীরা অত্যন্ত সুখী হতেন।

দিল্লিতে সংস্কৃতি নামে এক আর্ট গ্যালারি উদ্বোধন করতে নিমন্ত্রণ পেলাম। সমসাময়িক বাংলা চিত্রকলার প্রদর্শনী। উদ্‌বোধন করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম আমার জীবনে প্রথম কেরিয়ার শুরু করেছিলাম কলা সমালোচক হিসেবে। সেই সুবাদে এবং নানা পারিবারিক কারণে সেকালের অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন— যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত, পোর্ট্রেট

পেন্টিং-এ সিদ্ধহস্ত অতুল বসু। সংস্কৃতির প্রদর্শনীটি চমৎকার ছিল। ওরা একটি মূল্যবান ক্যাটালগও প্রকাশ করেছিলেন।

ডিসেম্বরে পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশন বসল। শেষদিনে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী একটা বড় ডিনার দিলেন সকল এন ডি এ সদস্যদের জন্য। অশোক হোটেলে কনভেনশন হল-এ এই ভোজসভা হল। ব্যবস্থাপনায় তখনকার সংসদীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। সে সময়ে একটা ইংরেজি কথার খুব চল হয়েছিল, কথাটা ফিল গুড (Feel good)। বিজেপির মতে তাদের এই চার বছরের অধিক শাসনকালে দেশের মানুষ ফিল গুড অর্থাৎ খুবই ভাল আছেন, ভাল বোধ করছেন। তা সেই সময়ে বিশেষজ্ঞদের মতে অর্থনীতির অবস্থা বেশ ভাল। আমি ফিকির (FICCI) কয়েকটি আলোচনা সভায় গিয়েছিলাম। সেখানে বিশেষজ্ঞরা— তারা কোনও পার্টির অনুগত নন— গ্রাফ সহযোগে বক্তৃতায় বুঝিয়েছিলেন অর্থনীতির অবস্থা খুব ভাল। সার্ভিস সেক্টর, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সব জায়গায় সত্যিই স্ট্যাটিসটিক্স দেখাচ্ছে অর্থনীতি কত চাঙ্গা। আমি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করেছিলাম তবে বাজারে গেলে অন্যরকম অনুভূতি হয় কেন, মূল্যবৃদ্ধিতে বিভ্রান্ত হতে হয়। সে যাই হোক, অর্থনীতিতে দেশের অবস্থা ভাল, বিদেশনীতিতেও ভারতবর্ষ ভাল করছে। ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ভাল দিকে মোড় নিয়েছে। প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সময়ে সামান্য হলেও অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। দেশের মধ্যে বিজেপি তখন মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান বিধানসভায় নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। সব মিলে দেশের মানুষের যাই মনে হোক এন ডি এ নেতৃত্বে বেশ 'ফিল গুড' আবহাওয়া। ফলে অনেকেই বলাবলি করতে লাগলেন লোকসভা নির্বাচন আগেই ডেকে দিলে কেমন হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজেপি-র যারা বন্ধু নন তারাও একটু আশ্চর্য হয়ে মনে করছিলেন এন ডি এ-র শাসনকালে পারফর্ম্যান্স খুব খারাপ নয়। আর এন ডি এ বাঁচিয়ে রাখতে বিজেপি তার বিতর্কিত মতাদি যথাসাধ্য দূরে রেখেছিল। তবে একটা বিরাট কলঙ্ক আর সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তা হল গুজরাট। কিন্তু এত বীভৎস ঘটনার পরও বিধানসভার নির্বাচনে গুজরাটের জনগণ জিতিয়ে আনলেন সেই কলঙ্কিত অধ্যায়ের নায়ককে। ঈশ্বরের মতোই জনগণের মন বুঝে ওঠা ভার।

আমরা সকলেই বুঝতে পারলাম এই শীতকালীন অধিবেশনই প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ লোকসভার শেষ অধিবেশন। ফেব্রুয়ারি মাসে একটি অন্তর্বর্তীকালীন



বাজেট পেশের জন্য অধিবেশন ডাকতে হবে। অক্টোবর ২০০৪ অবধি যে পূর্ণ মেয়াদ তার জন্য অপেক্ষা করা হবে না। 'ইন্ডিয়া শাইনিং' স্লোগান নিয়ে বিজেপি নেমে পড়বে মনস্থির করেছে। এটা যে কতখানি আত্মঘাতী হবে তা ওরা অনুমান করতে পারেনি।

একদিকে পার্লামেন্টের গোলাকৃতি সৌধ, অপরদিকে সাউথ ব্লক আর নর্থ ব্লকের ইমারত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার নিতান্ত ছেলেবেলার এক ঝাপসা স্মৃতি হচ্ছে এই মহতী সৌধের মাঝখানের চক-এ পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে একটা টাঙায় চড়ে চলেছি আমি। এর পরের স্মৃতিচিত্র হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, দিল্লির পথে আমজনতার সঙ্গে হেঁটে চলেছি। আজ আমার ছোট্ট মোটর গাড়িটিতে চড়ে সেই চেনা পথে যেতে যেতে বিশাল সেই অট্টালিকার দিকে চেয়ে মনে মনে গুডবাই বললাম। কলকাতায় ফিরলাম। ক্রিসমাস ডে-র পরদিন ২৬ ডিসেম্বর ছিল আমার জন্মদিন। আমার ছেলেবেলার এক প্রিয় কবি ক্রিস্টিনা রসেটির কবিতা মনে পড়ছিল। জীবনের যাত্রাপথের শেষে ক্লান্ত কবি প্রশ্ন করছেন Shall I find comfort, travel sore and weak? উত্তর কবিতার মধ্যেই আছে of labour you shall find the sum. কবি আশ্বাস পাচ্ছেন Yea beds for all who come. জন্মদিন আনন্দেই কেটেছিল। দুই প্রবাসী পুত্র কাছে ছিল, কন্যার ফোন এসেছিল। অনেক রাত্রে এসে উপস্থিত মমতা। সঙ্গে আছেন সুব্রত মুখার্জি। মমতা বললে, কৃষ্ণাদি আপনার জন্য একটা নীলাম্বরী শাড়ি এনেছি।

জীবন তার আপন ছন্দে চলতেই লাগল।

## সাত

## জনগণমন

ছোটখাটো একটি বাজেট অধিবেশন হয়েই ত্রয়োদশ পার্লামেন্টের জীবনাবসান ঘোষণা করলেন স্পিকার মনোহর যোশি। অর্থাৎ সাইনে ডাই অধিবেশন শেষ হল। এই স্পিকার মনে প্রাণে কট্টর শিবসেনা ছিলেন। কীভাবে যেন বিশেষ শোরগোল না-তুলে তিনি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনে পড়ছে আমি প্রিয়রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমরা অর্থাৎ কংগ্রেস বিনা বাক্য ব্যয়ে শিবসেনা স্পিকার কী করে মেনে নিলে! অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোনও লাভ হত না। স্পিকার হিসেবে সভায় কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে যোশি মন্দ চালিয়ে যাননি।

পার্লামেন্টারি প্রথা বলে স্পিকার হলে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সভা পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবে তা কতখানি সম্ভব সংশয়াতীত নয়। দৈনন্দিন কাজে নিরপেক্ষ পরিচালনা হয়তো সম্ভব। কিন্তু অন্তর থেকে দলীয় সত্তা মুছে ফেলা যায় কি! কোনও পার্লামেন্টারি সংকটের মুহূর্তে স্পিকার কী ভূমিকা নেবেন বলা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের উপর তা নির্ভর করে। আমি স্পিকারের ভূমিকায় দেখেছি পূর্ণ সাংমা, বালযোগী ও মনোহর যোশি। সাংমা সভা পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। যত চিৎকার-চেঁচামেচি গোলমাল হোক সহজে সভা মুলতবি করতেন না। সিংহাসনে বসে বইয়ের পাতা ওলটাতেন। ওয়েল-এ দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করে প্রতিবাদকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন আবার কাজ শুরু হত। স্পিকার হিসেবে আমি সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেখার সুযোগ পাইনি। চতুর্দশ লোকসভার বিশৃঙ্খল আচরণে উনি তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে উনি পার্লামেন্টারি প্রথা মেনে দলের উর্ধ্বে থাকার ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে নিজের দলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটে যায়।



আবার এক ভরা গ্রীষ্মে নির্বাচনি প্রচার শুরু হল। নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির করার সময়ে নির্বাচন কমিশন ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষা ইত্যাদি নানারকম কথা বিবেচনা করেন। কেন যে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতুর সুবিধা অসুবিধাগুলো ভাবেন না। চৈত্র-বৈশাখের খর রৌদ্রে প্রার্থী, দলীয় কর্মী, ভোটদাতা সকলেরই প্রাণান্ত। মে মাসের দশ তারিখ ২০০৪ সাল চতুর্দশ লোকসভার নির্বাচন হল। এই নির্বাচনে আমাদের অর্থাৎ তৃণমূলের বিপর্যয় হল। আমরা ছিলাম ন'জন এম পি। এক ধাক্কায় সংখ্যাটা দাঁড়াল এক।

আমাদের ন'জন এম পি-র যে পার্লামেন্টারি পার্টি তা মোটের উপর সুখের সংসার ছিল। কখনও পার্লামেন্ট ভবনের তিনতলায় ছোট পার্টি অফিসটিতে বসে আলোচনা। বিশ্বস্ত কর্মী রতন মুখার্জি চা-মিষ্টি আনতে দিলেন। কখনও মমতার ফ্ল্যাটে খাওয়া-দাওয়া। সেকালে আমাদের বিশেষ টাকাপয়সা ছিল না। প্রায়ই মেনু ডিমের ডালনা আর ভাত। হঠাৎ কখনও ডা. রঞ্জিত পাঁজা এককিলো মাংস নিয়ে হাজির। তাড়াতাড়ি রান্না করা হল। ডা. পাঁজা এবং আনন্দমোহন বিশ্বাস রান্নায় উৎসাহী। মাঝে মাঝেই ওরা দু'জন রান্না করে যেসব খাওয়া স্বাস্থ্যের কারণে ওদের নিষিদ্ধ গোপনে খেয়ে নিতেন। তার ফল ভাল হয়নি।

খাওয়া-দাওয়ার গল্প করতে গিয়ে একটা অভিজ্ঞতা মনে পড়ল। আমি থাকি দোতলার ফ্ল্যাটে। মাঝে মাঝেই ওপরে মমতার শোবার ঘরে বসে কখনও জরুরি কথা, কখনও গল্প-গুজব হয়। এক সন্ধ্যায় ওপরে উঠে মমতার শোবার ঘরে কেউ আছেন শুনে বাইরে বসার ঘরে সবে বসেছি এমন সময় ভিতরে ডাক পড়ল। প্রবেশ করে দেখি শয্যার উলটো দিকের চেয়ারে বসে সোমেন মিত্র সুপ খাচ্ছেন। আমি আমার বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করতে করতে মমতার প্রশ্নের জবাবে সুপ খাব না জানালাম। সোমেন বললেন, দিদি খান, সুপটা খুব টেস্টি হয়েছে। মমতার আদেশে সবাই খাবার ঘরে এসে টেবিলে খেতে বসলাম। রান্নাঘর থেকে গরম বেগুনি ভাজা প্লেটে দিয়ে পরিবেশক জিজ্ঞাসা করলেন, আর একখানা দিই? মুখ তুলে দেখলাম পরেশ পাল। সে তখন একান্ত সোমেন অনুগামী। এই খাওয়া-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এক অস্থায়ী সমঝোতার মধ্য দিয়ে সোমেনের একান্ত ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত ভট্টাচার্য তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায় এলেন। জয়ন্তকে আমি পছন্দ করতাম। সে আমার বিদেশমন্ত্রক কমিটিতেও ছিল।

চতুর্দশ লোকসভার নির্বাচনের কথায় ফিরে যাই। আমি, ডা. রঞ্জিত পাঁজা,

ডা. নীতিশ সেনগুপ্ত, ডা. বিক্রম সরকার, আকবর আলি খোন্দকার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বিশ্বাস সবাই ধরাশায়ী হলাম। অনেকদিন দল থেকে সাসপেন্ড হয়ে থেকে আবার ফিরে আসা অজিত পাঁজাও পরাজিত। মমতা জয়ী হল। তৃণমূলের একমাত্র সাংসদ। সেই জয়ের স্বাদও ফিকে লাগল কারণ দুই লক্ষ চোদ্দো হাজার ভোট থেকে নেমে গিয়ে ব্যবধান দাঁড়াল আটানব্বই হাজারে।

নির্বাচনি ময়দানে পা দিয়ে আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে কেমন এক শীতল ভাব অনুভব করলাম। যারা আমাদের দলীয় সমর্থক নন, কোনও রাজনৈতিক দলে নেই এমন সব সাধারণ মানুষও আমাকে একান্ত ভাবে সমর্থন করেছেন। তা না হলে যাদবপুরের মতো কঠিন জায়গায় তিনবার জয়ী হওয়া অসম্ভব। এবার সেই সাধারণ মানুষ কেমন যেন নীরব। অনেকে সরবও হলেন। আমার এলাকা বেহালা, যাদবপুর যখন ঘুরছি মানুষ প্রকাশ্যে কিছু বলছিলেন না। কিন্তু আমি থাকি দক্ষিণ কলকাতায়। সেখানকার পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু, স্বজন অনেকেই বাড়ি বয়ে এসে অথবা টেলিফোনে বলতে লাগলেন— এবার তোমাদের অর্থাৎ তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছি না। তাদের বিরূপ হবার কারণ কী। তারা বলেন মমতার ইংরেজিতে যাকে বলে flip flop অর্থাৎ দোলাচল পছন্দ করেননি। ওদের অনুযোগ— তোমরা কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল করলে, এন ডি এ-তে যোগ দিলে, তারপর তুচ্ছ কারণে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার কংগ্রেসের সঙ্গী হলে। সেখানেও টিঁকলে না, চলে গেলে এন ডি এ-তে— মন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে দেবে দেবে করে ঝুলিয়ে রাখল। তারা মন থেকে ফিরিয়ে নিল না তোমাদের। এসব হচ্ছে কী!

আমি মনে ভেবে দেখলাম যারা এসব বলছেন তারা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজ। ভোটের হিসেবে এদের পার্সেনটেজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এরা হলেন— ওপিনিয়ন মেকার, মত গড়ে দেন। লক্ষণ ভাল নয়! (পরবর্তীকালে এর উলটো ছবি আমরা দেখেছিলাম যখন শিক্ষিত, সুশীল সমাজ মমতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন)।

দ্বিতীয় অভিযোগ যেটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠল সেটা আরও বেশি গুরুতর। সেটা হল গুজরাট। গুজরাট কাণ্ডের পরও এন ডি এ-কে সমর্থন করা, তাদের সঙ্গে ভোট দেওয়া মানুষ ভালভাবে নেয়নি। আমার বারবার মনে পড়ছিল আমাদের পার্লামেন্টারি কমিটির দিল্লি বৈঠকে আমি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলাম। কিন্তু মানাতে পারিনি।



কিন্তু নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে এই গুজরাট ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতা অন্তত অন্যরকম হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় দরিদ্র মুসলমান গ্রামে গিয়ে আমি যে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি তা যেমন আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল তেমন বিস্মিতও করেছিল। 'মা এসেছে,' 'মা এসেছে' বলতে বলতে কুটির ছেড়ে সবাই জিপের কাছে ছুটে আসছেন। মেয়েরা হলুদ মাখা হাত শাড়িতে মুছছেন, কোলে শিশু। অনেক অল্পবয়সি ছেলে, যুবক তারা আমার জিপ টেনে নিয়ে যাবে কাদার ওপর দিয়ে, ড্রাইভারকে চালাতে দেবে না। সবচাইতে অপ্রস্তুত, প্রায় অপরাধী বোধ করছি যখন মেয়েরা কেউ কেউ কোলের বাচ্চাকে আমার পায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বারণ শুনছেন না। এ অভিজ্ঞতা আমার প্রথম।

বারুইপুরের দিকে যখন গেলাম সেখানেও আমার মুসলমান কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস। আমি ওদিককার কবরস্থানের জন্য কোথায় কী করেছি তারা নিজেরাই প্রচার করছে। এমনকী বিদেশমন্ত্রক কমিটিতে আমি কী কাজ করেছি বেশ গর্বের সঙ্গে বলছে। প্রচার সেরে ফিরে এসে আমি বাড়িতে বলেছি— কই তবে যে শুনলাম ওরা রাগ করেছেন।

তবে উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে বেশ একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছি। তাদের গম্ভীর ও শীতল চাহনি। কিন্তু সেসব অঞ্চলেও অনেক তরুণ মুসলমান কর্মী আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। চিন্তার কারণ দেখিনি।

কিন্তু নির্বাচনের দিন দশেক আগে এক অদ্ভুত খেলা শুরু হল। মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর থেকে আমার কর্মীরা সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বলতে লাগলেন, ওরা কী যেন গুজরাটের দাঙ্গার ওপর ফিলম তৈরি করেছে, ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় বীভৎস অত্যাচারের ছবি দেখাচ্ছে। ওরা নিজেরাই বললেন, বুঝতে পারছি এগুলো বানানো— কারণ সত্যি দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়ে কেউ দাঁড়িয়ে ওরকম ছবি তোলেনি। কিন্তু এই বানানো মিথ্যা ছবি খুব ক্ষতি করছে। আমার সংখ্যালঘু কর্মীরা বললে, 'মা, আমরা দিদিকে (মমতা) প্রাণ থেকে ভালবাসি। আর আপনি তো আমাদের মা। কিন্তু এইসব বীভৎস জিনিস দেখে আমাদেরই রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে। যা হোক, কিছু করুন।' এমন খবরও এল কোনও কোনও মসজিদ থেকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এইসব অপপ্রচারের মোকাবিলা করার মতো সংগঠিত শক্তি তৃণমূলের ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্টদের মতো একটি কঠোর শৃংখলাবদ্ধ রেজিমেন্টেড

দলের সঙ্গে লড়াই করার মতো কোনও সংগঠন আমাদের ছিল না। প্রথমবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম নেই নেই করেও তাদের কিছু সংগঠন তখনও আছে। 'মাদার কংগ্রেস' ও 'যুব কংগ্রেসে' একটা রেষারেষি চলত। কিন্তু উভয়ের উপস্থিতি আছে। দ্বিতীয়বার তৃণমূলের বয়স মাত্র এক মাস। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনের সময়ে মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে। তারা জোর করে এসে সমর্থন করতে চাইছে। রিগিং করে থামানো যাচ্ছে না।

চতুর্থবারে আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম হল। মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার একান্ত অভাব। আর এবার তো আমাদের সংগঠন থাকার কথা। আমাদের বিধায়ক আছে, কর্পোরেশন আছে, কাউন্সিলার আছে। কিন্তু তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে না। এর আগের দু'বার তো মানুষের উৎসাহ ও একেবারে নিচুতলার কর্মীদের প্রচেষ্টা এই সম্বল। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হবার ফলে আমার নিজস্ব পরিকাঠামো নেই। মমতা প্রায়ই বলত, 'কৃষ্ণাদিকে সবাই ভালবাসে, কৃষ্ণাদি তো কখনও দলাদলিতে থাকে না, দল করে না।' কোনও কোনও সহকর্মীর নাম করে বলেছে, উনি কিন্তু দল করছেন। এই প্রথম আমার মনে হল শুধু ভালবাসায় কাজ হয় না। কোনও কোনও সহকর্মীকে দেখলাম দল করার ফলে কিছু লোক অন্তত সঙ্গে আছে, হয়তো নিজেদেরই কোনও উপদল বিরুদ্ধেও কাজ করছে।

এবারে রিগিং প্রচণ্ড রকম হল। প্রতিপক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাদেরই কেউ কেউ জানালেন, আপনার ভোট এবার লুট হয়ে গেছে, আমাদের দোষ দেবেন না। আপনাদের দিকে সামাল দেবার কেউ ছিল না। এমনিতেই আমাদের বুথে বসা ছেলেদের ওরা মারধোর করে তুলে দেয়। এবার অনেক জায়গায়, বুথে লোকই ছিল না। এইবার প্রথম যাদবপুর কেন্দ্রে ই. ভি. এম অর্থাৎ যন্ত্রে ভোট হল। মগরাহাট থেকে, বিষ্ণুপুর থেকে খবর আসতে লাগল বুথ দখল করে, বোতাম টেপা হয়ে যাচ্ছে। রিগিং সহজতর হয়েছে। যন্ত্রে কারচুপির অভিযোগও উঠল, তবে তা প্রমাণ করা কঠিন। ফলাফল বার হবার পর দেখেছিলাম বুথে আছে ১২০০ ভোট, তার মধ্যে সি পি এম ৯০০ কৃষ্ণা বসু ৩, সি পি এম ৯৫০, কৃষ্ণা বসু ৪, এইরকম চলছে। বলা বাহুল্য তিন বা চার আমার ভাগ্যে ওদেরই সৌজন্যে পাওয়া। একেবারে শূন্য হলে দেখতে খারাপ দেখায়।



এত বড় একটা বিপর্যয়ের পরে পার্টিতে একটা ময়নাতদন্ত খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। আমি বিদেশে চলে যাবার পর একটা মিটিং তৃণমূল ভবনে হয়েছিল। তাতে সিরিয়াস আলোচনা কিছু হয়নি বলে সহকর্মীরা জানিয়েছিলেন। মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছিল। তবে আমি দেখেছি আত্মসমালোচনার দিকে না-গেলেও মমতা রিগিং সংক্রান্ত অনেক ডকুমেন্ট তৈরি করেছিল। সেসব নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো হল। কাগজপত্র নিয়ে আমরা একটা ডেপুটেশনে রাষ্ট্রপতি কালামের কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি রিগিং-এর অভিযোগ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছিলেন। ঘনঘন অভিযোগের ফলে ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যাতে 'ফ্রি এবং ফেয়ার' হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশন নাকি যথেষ্ট কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু ফলাফল বার হলে যখন দেখা গেল প্রধান বিরোধীদল তৃণমূল মাত্র ৩০টি আসন পেয়েছে তখন সকল পক্ষই তাজ্জব হয়ে গেল।

পার্লামেন্টে আমরা যে ক'জন মহিলা বেশ বলিয়ে কইয়ে ছিলাম অনেকে এই নির্বাচনে পরাজিত হই। কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী দ্রুত তার দলে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

গিরিজা ব্যাস হলেন জাতীয় উইমেনস কমিশনের চেয়ারপার্সন। প্রভা রাও মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের দায়িত্ব পেলেন, শ্যামা সিং বিহার কংগ্রেসের। মার্গারেট আলভা এ আই সি সির সেক্রেটারি হিসেবে দিল্লিতে কাজ করতে লাগলেন।

আমার পরাজয় আমার সমর্থক ও কর্মীদের মনে আঘাত করেছিল। তাদের কাছে এই ফলাফল অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। মমতাও জোর গলায় বলল, কৃষ্ণাদি কিছুতেই হারতে পারে না। আমি সকলকেই বলেছিলাম পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়াই শোভন। এবারের নির্বাচন চলাকালে আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এর আগের তিনটি নির্বাচনেই শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম নির্বাচনের সময়ে যাদবপুরের মতো লালদুর্গে আমার মতো নবাগত একজন অ্যাকাডেমিকের কোনও চান্সই নেই— সকলে বলেছিলেন। তারপর কংগ্রেস দু'টুকরো হয়ে তৃণমূলের জন্ম হল। ভোট ভাগ হয়ে যাবার ফলে যাদবপুর পুনরুদ্ধার করে নেবে সি পি এম বিশেষজ্ঞদের তাই মত। রোজ খবর কাগজ খুলে এমনকী কত ভোটে হেরে যাব তারও পরিসংখ্যান। ভাগ্যিস

নির্বাচন চলাকালে কাগজ পড়বার অবকাশ তেমন হয় না! অথচ এই চতুর্দশ লোকসভার নির্বাচনে আমি অবাক হয়ে দেখলাম লোকে বলছে আমার জয় প্রত্যাশিত। খবর কাগজেও তার প্রতিফলন। আমার মনের মধ্যে অশনি সংকেত। ফল যখন প্রকাশ হতে শুরু হল শুনতে পেলাম টিভিতে খবর পড়া হচ্ছে— অপ্রত্যাশিতভাবে পিছিয়ে পড়ছেন...।

লোকসভার এই বিপর্যয়ের পর আমাদের পার্লামেন্টারি সহকর্মীদের যে সুখের সংসার ছিল তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমাদের সকলকে ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন ডা. রঞ্জিত পাঁজা, আনন্দমোহন বিশ্বাস, আকবর আলি খোন্দকার। আকবর খুবই অকালে চলে গেল। সে আমার একান্ত স্নেহভাজন ছিল। সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ দল পরিবর্তন করলেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল মমতার একান্ত নিকটজন। সে চলে গেল কংগ্রেসে। ডা. নীতিশ সেনগুপ্তও কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ডা. বিক্রম সরকার গেলেন এন সি পি-তে শারদ পাওয়ারের দলে। আমি রয়ে গেলাম মমতার সঙ্গে আমাদের পরাজিত বিধ্বস্ত দলে।

তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে মানুষ আমাদের উপর আশা রেখেছিল যে বহুদিন পর এক রাজনৈতিক বিকল্প বাংলার আকাশে দেখা দিয়েছে। আমি '৯৬ সালের নির্বাচন থেকেই লক্ষ করেছিলাম মানুষ পরিবর্তন চাইছে। একটি প্রকৃত বিরোধী শক্তি থাকলে আরও আগেই পরিবর্তন ঘটে যেত। তবে ২০০৪ সালের পর নানা কারণে যেন আমাদের অর্থাৎ তৃণমূলের উপর মানুষের আস্থা হ্রাস পেয়েছিল। মমতা ও তৃণমূলের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ এল বছর দুয়েক বাদে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের হাত ধরে। সে আর এক রাজনৈতিক ইতিহাস। ভবিষ্যৎ তার কথা লিখবে।

এই একই ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমরা দেখেছিলাম কেশপুর, গড়বেতায়। আমরা তৃণমূল এম পি-দের একটি দল মেদিনীপুর পৌঁছবার পর গ্রামবাসীরা আমাকে বলেছিলেন, 'মা, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। শুধু আমাদের হাতে একটু যন্তর দিন।' যন্তর? শুনলাম অপর পক্ষ লংরেঞ্জ রাইফেল ব্যবহার করছে। কোনও মন্ত্রীমশাই-এর নাম করে তারা বললে, তিনি নিজে সাপ্লাই দিচ্ছেন। এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি দেখেছিলাম। তদানীন্তন জেলাশাসককে এবং পুলিশ সুপার গৌরব দত্তকে আমি বলেছিলাম আমি মেদিনীপুরে এসেছি না বসনিয়াতে এসেছি বুঝতে পারছি না। পরবর্তীকালের



রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিশেষ করে নন্দীগ্রামে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে মানুষ স্বচক্ষে দেখে শিউরে উঠলেন। তখন সে সুযোগ ছিল না।

আমার পার্লামেন্ট জীবনের তিন কাহনের শেষ পর্বে এসে আমার মনে হয়েছে আমি এই অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক কী শিখলাম, কী পেলাম। প্রথমে একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম যে আমি পারি— আই ক্যান I can.... একেবারে এভাবে জলে নেমে না-পড়লে সেকথা জানা হত না। আমার গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মাঠে বসে কথা বলতে কোনও অসুবিধা নেই। আবার বিদেশমন্ত্রক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচনাতেও নেই কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য। আর আছে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখা। দীর্ঘদিন অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে যে-কোনও বিষয়ে দাঁড়িয়ে দু'কথা বলতেই পারি। অনেক সহ-সাংসদকে দেখেছি প্রথমদিকে খুবই আড়ষ্ট হয়ে থাকতে। পার্লামেন্টে কাগজ দেখে পড়া অচল, এক্সটেম্পোর বা তাৎক্ষণিক বক্তব্য রাখতে হয়। অনেককে দেখেছি কাগজে লিখিত না-থাকলে বলতে অসুবিধা হয়। তবে পার্লামেন্টে বলার সুযোগ পেতে হয় অথবা সুযোগ করে নিতে হয়।.প্রশ্নোত্তর পর্ব বা জিরো আওয়ারে অনেক বৃথা হাত তুলে থেকে ধীরে ধীরে বক্তা হিসেবে জায়গা করে নিতে পেরেছিলাম।

নানা জনকল্যাণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট সংগ্রামের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু সাংসদ জীবনে এই পরিচয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বেড়ে গেল অনেক। কলকাতা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আমার এলাকার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুতের যে হাহাকার দেখলাম তা মর্মন্তুদ। স্বাধীনতার এত বছর পরে দেশের সাধারণ মানুষের এই অবস্থা আমাদের সকলের লজ্জা। একক সাংসদ হিসেবে খুব কিছু করা যায় না। তবু যে সামান্য সুযোগ পেয়েছিলাম তার জন্য ধন্য বোধ করি।

রাজনীতিতে মেয়েদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম ছিল আমার পার্লামেন্টারি কাজের এক বিশেষ দিক। উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবে এবং একক চেষ্টায় যত দূর সম্ভব করেছি। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে সামান্য সংশোধন এনে পার্লামেন্টে ও বিধানসভায় কীভাবে মহিলাদের সংখ্যা অনেক বাড়ানো যায় তার জন্য বার বার সওয়াল করেছি।

সে সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মিলে একটিই মন্ত্রক ছিল তাকে বলা হত

হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট মন্ত্রক। এই মন্ত্রকের যে পার্লামেন্টারি কমিটি তার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের ঐতিহাসিক হেরিটেজ ভবন ও কেন্দ্রগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা দেখা এই কমিটির কাজের অন্তর্গত ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্যালু এডুকেশন বা মূল্যবোধের শিক্ষা কীভাবে দেওয়া যায় তাই নিয়ে অনেক আলোচনা চলেছিল। শুধু বই পড়া নয় চরিত্র গঠন, ন্যায়-অন্যায় বোধ কীভাবে ছাত্রঅবস্থায় গড়ে তোলা যায় তার জন্য দীর্ঘ রিপোর্ট সরকারকে জমা দেওয়া হয়েছিল। এই কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের, ব্রহ্মকুমারীদের এবং সাঁইবাবার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আমরা ঘুরে দেখেছিলাম। এই ধরনের পার্লামেন্টারি কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত হতে পেরে মনে এক ধরনের তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

পার্লামেন্টের অধিবেশন নানা কারণে অনেক সময়ে বানচাল হয়ে যেত, দিনের পর দিন হয়তো কাজকর্ম হল না। সেই সময়ে এই কমিটিগুলির মাধ্যমে কিছু সিরিয়াস কাজকর্ম করতে পেরে ভাল লাগত। একবার কথা হল কমিটির কাজকর্ম বা অধিবেশন প্রেসের জন্য খুলে দেওয়া হোক। বিদেশমন্ত্রক কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে আমার মত চাওয়া হলে আমি এই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম পার্লামেন্টে যখন বিশৃঙ্খলা হয় তখন বিশৃঙ্খলাকারী সদস্যরা অনেক সময়ে ওপরে প্রেস গ্যালারির দিকে চেয়ে কাগজ ছেঁড়েন বা গণ্ডগোল করেন। এর পুনরাবৃত্তি কমিটির কাজে না হওয়াই ভাল।

বিদেশনীতিতে ভারত চিরদিন নিজস্ব স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে এসেছে। স্বাধীনতার পরপরই আমরা সোভিয়েট রাশিয়া বা আমেরিকা কোনও শিবিরে যুক্ত হবনা নিরপেক্ষ থাকব এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি বা নন-অ্যালাইনমেন্ট অন্য অনেক দেশের ভাল লেগেছিল। জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রবক্তা ও নেতৃত্বে ছিল ভারত। কিন্তু আমাদের সময়ে পার্লামেন্টারি নীতির পরিপ্রেক্ষিত আলাদা। ক্ষমতার একক কেন্দ্রবিন্দু তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। তার সঙ্গে আমাদের গঠনমূলক মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। তার জন্য আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতি বিসর্জন দেবার প্রশ্ন নেই। আফগানিস্তান বা ইরাক যে-কোনও আন্তর্জাতিক সংকটের মুহূর্তে আমরা আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতিতে অটুট।



একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পার্লামেন্টের বিদেশমন্ত্রক কমিটির চেয়ারপার্সন থাকার ফলে ভারতের বিদেশনীতি কাছে থেকে দেখার এবং কখনও কখনও তার রূপায়ণে অংশ নেবার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময়ে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক নূতন মোড় নিল। ধীরে আমরা ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরব দুনিয়া ও অন্যান্য কোনও দেশকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে কোনও ছেদ পড়বে না। এশিয়ার দেশগুলির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করেছি, 'লুক ইস্ট' পলিসি চালু হয়েছে। আর আছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা— সব দেশে রাজনৈতিক অশান্তি লেগেই আছে। হিমালয়ের ক্ষুদ্র রাজ্য নেপাল তখন অগ্নিগর্ভ। মায়ানমারের সামরিক শাসকদের সঙ্গে সংঘাত চলছে সু চি-র নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের।

চারিদিকে এই অশান্ত, চিত্তবিক্ষেপের পরিবেশের মধ্যে ভারত কিন্তু তার গণতান্ত্রিক কাঠামো থেকে একবারের জন্যও বিচ্যুত হয়নি। স্বাধীনতার পরেই যখন আমরা সকল পূর্ণবয়স্ক ভারতীয়ের ভোটদানের অধিকার ঘোষণা করে দিলাম তখন মানুষ এই অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে কিনা জানা ছিল না। কার্যকালে দেখা গেল আমাদের দেশের মানুষের এক ধরনের সহজাত বিচক্ষণতা আছে। এক এক সময়ে এমনভাবে তারা মত প্রয়োগ করেছেন যেন আসমুদ্র হিমাচল সকলে পরামর্শ করে নিয়েছিলেন।

হতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্র একেবারে নিখুঁত বা ত্রুটিমুক্ত নয়। তবুও দীর্ঘ সময় গণতান্ত্রিক কাঠামো ধরে রাখতে পারা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। দেশের গণতন্ত্রকে কাছে থেকে দেখার ও সেই গণতন্ত্রে সামান্য ভূমিকা পালন করতে পারা আমার জীবনে অমূল্য অভিজ্ঞতা হয়ে রইল।

পার্লামেন্টের বাইরে আমার যে কর্মব্যস্ত জীবন তা যেমন চলছিল চলতে লাগল। সে বছর নেতাজিভবনে 'নেতাজি অরেশন' দিলেন শ্যাম বেনেগাল। চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল তখন 'নেতাজি' ছবিটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মেকিং অব দ্য ফিলম : নেতাজি।' সেবার হবিবুর রহমানের পুত্রবধূ এলেন পাকিস্তান থেকে, কুয়ালালামপুর থেকে এলেন রানি অফ ঝাঁসি রেজিমেন্টের জানকি অথিনাহাপ্পন। অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন দিয়েছিলেন বিশ্বায়নের ওপর শিশিরকুমার বসু বক্তৃতা। পাকিস্তানের বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আস্মা জাহাঙ্গিরকে সেপ্টেম্বর মাসে

শরৎ বসু স্মারক বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বললেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কী করে বন্ধুত্বর সম্পর্ক ধরে রাখা যায় তার উপর। নানা কর্মকাণ্ডের ফাঁকে আমি আমার স্মৃতিকথা লেখায় হাত দিলাম। ধীরে ধীরে লেখাটি আকার পেতে শুরু করল। লেখা তখন সবে শুরু হয়েছে সুগত তার নাম দিয়ে দিল— 'অ্যান আউটসাইডার ইন পলিটিকস।'

দেখতে দেখতে এসে গেল ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। মমতার মনে হয়েছিল সে এবার ভাল করবে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চলছিল। মার্গারেট আলভা আমাকে বলেছিল সে প্রায় জোটের চেষ্টায় সফল হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কারণে শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। সেবার নির্বাচন কমিশন খুব কড়া ভাবে নজরদারি করবে বলাতে সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা দেখা দিল। মানুষ ঠিকমতো ভোট দিতে পারলে বিরোধীদের লাভ। অঙ্ক অবশ্য সেভাবে ঠিকমতো মিলল না। আগের বিধানসভায় তৃণমূলের ছিল ষাটজন প্রতিনিধি। এবার থেমে গেল ত্রিশে।

এবারের বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পরই একদিন মমতা আমার বসুন্ধরা গৃহের দোতলার বসবার ঘরে উপস্থিত। সঙ্গে তার দুই একান্ত অনুগত দলীয় অনুচর। মমতা বললে, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়ান। এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে আমি এই প্রস্তাবে না বললাম। মমতার অনুরোধ তো অনুরোধ নয় নির্দেশ। সে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হল। আমি যে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে দু'বার এগিয়ে ছিলাম যা কিনা স্বাধীনতার পর আগে কখনও হয়নি সেকথাও সে বললে। স্রোত উলটো দিকে ঘুরেছিল সেকথা ঠিক। কিন্তু গত নির্বাচনে মাধবী মুখার্জির পরাজয়ের পর অবস্থা আগের মতো নেই।

তবে আমি কেন প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না তা আমি মমতাকে খোলাখুলি বললাম। এক আমার মনে হয় এটা হবে এক ধরনের 'গিমিক' বা তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকর্ষণের উপায়। ক'দিন হইচই হবে, কাজের কাজ হবে না। গিমিক আমার কোনওদিনই পছন্দ নয়। আমার না বলার দ্বিতীয় কারণ হল আমি সর্বভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে অভ্যস্ত এবং স্বচ্ছন্দ। আমি সম্ভব হলে সেখানেই থাকতে চাই। সবাই সব কাজ পারে না। কেউ রাজ্য রাজনীতি ভাল বোঝে, কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন ভাল পারে। অবশ্যই সব পন্থাই সমান জরুরি। প্রাক্তন আই. এ. এস দীপক ঘোষকে ওই কেন্দ্রে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল।



আমাদের গণতন্ত্রে লোকসভা ছাড়াও জনপ্রতিনিধির ভূমিকা পালন করার আর একটি কেন্দ্র হল রাজ্যসভা। রাজ্যসভায় সদস্য হওয়ার জন্য অবশ্য সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় না। বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচিত করেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অর্থাৎ সংবিধান প্রণেতারা রাজ্যসভাকে কল্পনা করেছিলেন হাউজ অব এলডার্স বা বয়োজ্যেষ্ঠদের সভা হিসেবে। সেখানে থেকে প্রাজ্ঞ মানুষেরা সুচিন্তিত মতামত জানাবেন। তারা আরও এই সভাকে সব অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্বের ভার দিয়েছিলেন। সব রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা থাকবেন তারা সেই রাজ্যের সুখ-দুঃখের কথা বলবেন। সেই কারণে তাদের হতে হবে সেই বিশেষ রাজ্যের বাসিন্দা। এই সব শর্ত রাজ্যসভায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল।

এলডার্স বা প্রবীণদের ভিড় ছিল লোকসভায়। রাজ্যসভায় অনেকে অপেক্ষাকৃত তরুণ। অনেকে যে অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন সে রাজ্যের তারা বাসিন্দা নন কোনওমতেও। পরে এই বাসিন্দা থাকার শর্ত তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর দেখেছি অনেক শিল্পপতিরা রয়েছেন। তারা এসেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে। তৃণমূল থেকে দু'বার রাজ্যসভায় প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ এল এবং পাঠানো হল। প্রথমবার মমতা আমাকে বললে সে ডেরেক ও ব্রায়ানকে পাঠাতে চায়। ডেরেক তখন অল্পদিন হল দলে এসেছে ও মমতার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাঠানো হয় 'প্রতিদিন' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী টুটু বোসকে। মমতা আমার বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিল একটু পরে আমি সংবাদমাধ্যমের কাছে নতুন নাম ঘোষণা করতে যাচ্ছি। দ্বিতীয়বার যখন সুযোগ এল শোনা গেল মমতা যোগ্য প্রার্থীর সন্ধান করছে। দিল্লি থেকে পুরনো সংসদীয় বন্ধুদের ফোন পেলাম, তুমি নাকি আসবে। মমতা দিল্লিতে কাকে বা কাদের বলে এসেছে, কৃষ্ণাদিকে পাঠাচ্ছি। যোগ্য প্রার্থী হিসেবে মমতা এবার পছন্দ করলে তার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর মুকুল রায়কে। এর পরের বিধানসভায় অবশ্য রাজ্যসভায় প্রতিনিধি পাঠাবার মতো সদস্য সংখ্যা তৃণমূলের আর ছিল না। যখন তৃণমূলের সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদির পুনর্নির্বাচনের সময় এল তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত হলেন।

পার্লামেন্টারি নির্বাচন ২০০৪-এর পরাজয় ও তারপর ২০০৬-এর বিধানসভায় আশানুরূপ ফল করতে না-পারায় বিরোধীরা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময়ে তাদের কাছে ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ এনে দিল সিঙ্গুর

ও নন্দীগ্রাম। বলতে গেলে শাসকদলই তাদের হাতে সেই সুযোগ তুলে দিলেন। হুগলি জেলার সিঙ্গুর ও মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম রাতারাতি দুটি এলাকা সর্বভারতীয় পরিচিতি তো বটেই এমনকী আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও বহু আলোচিত নাম হয়ে পড়ল। সিঙ্গুরে টাটাদের একটি নূতন ধরনের কমদামি, এক লাখ টাকার গাড়ি তৈরির জন্য রাজ্যসরকার জমি অধিগ্রহণ করে দিয়েছিলেন। আর নন্দীগ্রামে একটি কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার বাসনা রাজ্য সরকারের হয়েছিল। এ কাজের ভার ইন্দোনেশিয়ার শিল্পগোষ্ঠী সালিমকে দেওয়া হয়েছিল। তার জন্যও প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জমি।

কৃষকের কাছে তার জমি প্রাণাধিক। সেই জমি কেড়ে নেওয়া হবে এমন একটা বিপজ্জনক ধারণা তাদের মনে গেঁথে গেল। এই এলাকার কৃষিজীবী গ্রামের মানুষ অধিকাংশ ছিলেন বামফ্রন্ট অর্থাৎ কমিউনিস্ট সরকারের সমর্থক। কমিউনিস্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার একদিন স্লোগান দিয়েছিলেন, 'কেড়ে লে'— বড়লোক জোতদারের জমি কেড়ে নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের হাতে তুলে দেবার আহ্বান। আজ কৃষকের মনে হল যাদের তারা এতকাল সমর্থন করে এসেছেন তারা এবার অন্য অর্থে 'কেড়ে লে' বলছেন। দরিদ্র কৃষকের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে শিল্পপতির হাতে তুলে দিতে চাইছেন।

ত্রিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিরোধী শক্তি বলতে গেলে কিছুই ছিল না। সদিচ্ছা ও কর্মক্ষমতা থাকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প সব দিকে অগ্রগতি আনবার সুযোগ ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঘেরাও, স্ট্রাইক, কারখানায় লাল ঝাণ্ডা লাগিয়ে দেওয়া, তালা ঝুলিয়ে দেওয়া এইসব উৎপাতে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে শিল্প চলে গেল ভিনরাজ্য।

এমন সময়ে বর্তমান সরকার যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে উপলব্ধি করলেন শিল্প চাই, লগ্নি আনতে হবে দেশ-বিদেশ থেকে। তারা অস্বাভাবিক দ্রুততায় অগ্রসর হতে গিয়ে কেবলি ভুল পদক্ষেপ নিতে লাগলেন। এই বিষম তাড়াহুড়োর বর্ণনা দিতে গিয়ে বামপন্থী পণ্ডিত লেখক অশোক মিত্র মহাশয় বলেছিলেন— এ যেন 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।' ফলে, শিল্প করার আগে যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন তা হয়ে ওঠেনি। কৃষকদের বোঝানো হয়নি আজ তারা যা ক্ষতি মনে করছেন ভবিষ্যতে তা থেকে তারা উপকৃত হবেন। ন্যায্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়নি, উচ্ছেদের পর পুনর্বাসনের



নেই কোনও পরিকল্পনা। কোথায় কত জমি আছে, অধিক ফলনশীল জমি বাঁচিয়ে শিল্পের জন্য জমির সন্ধান করতে হলে যে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক থাকা প্রয়োজন সেসব তো দূরস্থান।

গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ যখন বিদ্রোহ করলেন তখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে তা দমন করার ব্যবস্থা হল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলীয় সন্ত্রাস, পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে দলের ক্যাডার। সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটি থেকে এর প্রতিবাদ উঠল। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে বিভাজন ঘটল, অনেকে প্রতিবাদী হলেন। বিরোধীদলের সামনে উপস্থিত সুবর্ণ সুযোগ।

নন্দীগ্রামের অত্যাচার, নন্দীগ্রামের পুনর্দখলের নামে সরকার পক্ষের সূর্যোদয় ঘটেছে বলে অশালীন উল্লাস এই সবের ফলে সিঙ্গুর কিছুদিন আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। সেখানে টাটার ছোট গাড়ি ন্যানোর কারখানা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কারখানা যখন উৎপাদনের মুখে তখন নতুন করে বিরোধী পক্ষ থেকে কারখানার সামনে ধরনা ও আন্দোলন শুরু হল। এই সময়ে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী একটি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেত্রীকে একসঙ্গে আলোচনায় বসাতে পেরেছিলেন। আমি এই খবর পাই ইজিপ্ট-এ নীলনদের তীরে। সুপ্রাচীন শহর লাকসৌরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আমি রাজ্যপাল মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এই দুর্ভাগা রাজ্যের জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তবে শেষ রক্ষা হল না। ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে টাটারা সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছিল সিঙ্গুরের এই সংকটের সময়ে দুই বিবদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠী আর একটু বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারতেন। এখানে অধিকাংশ কৃষক জমির জন্য দাম নিয়ে নিয়েছিলেন। কিছু 'অনিচ্ছুক' চাষি নেননি। কারখানা তৈরি হয়ে যাবার ফলে সেই জমিতে আবার চাষবাসের সুযোগ নেই। দুই বিবদমান রাজনৈতিক দলের টানাপোড়েনের ফলে রাজ্য থেকে এক সম্ভাবনাময় শিল্প চলে যাওয়াতে আখেরে ক্ষতি হল রাজ্যের সাধারণ মানুষের। 'ন্যানো' পিপলস কার বা আম জনতার মোটরগাড়ি নিয়ে সারা বিশ্বে কৌতূহল ছিল। সেই কৌতূহলের কেন্দ্র হতে পারত পশ্চিমবাংলা।

শিল্প ছাড়া আরও একটি অমূল্য ধন রাজ্য ছেড়ে কয়েকদশক ধরে চলে

যাচ্ছিল। কমিউনিস্ট শাসনকালে আমাদের মেধাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা ভিন রাজ্যে পড়াশুনো করতে চলে যেতে লাগলেন— দিল্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর— যে যেদিকে পারলেন। যারা আরও সুযোগ পেলেন তারা বিদেশে পাড়ি দিলেন। নিজের রাজ্যে তাদের মেধার স্বীকৃতি নেই। মেধার চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল। 'আজ বাংলা যা ভাবে কাল সারা ভারত তা ভাবে'— সেসব দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবুও বাঙালির প্রতিভার খ্যাতি তখনও অবশিষ্ট ছিল। ধীরে আমাদের রাজ্যের সকল ক্ষেত্রে মধ্যমেধার প্রসার ঘটল। শিল্প চলে যাওয়ার মতো মেধাসম্পন্ন তারুণ্যের চলে যাওয়া রাজ্যের ক্ষতি।

আমি ও আমার সমসাময়িকেরা ঠিক মিড নাইটস চিলড্রেন নই। স্বাধীনতা যখন এল আমাদের তখন কৈশোর, আমরা টিন-এজার। আমরা জন্মেছিলাম পরাধীন দেশে। দেশের স্বাধীনতা আমাদের কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশভাগের বেদনাও প্রত্যক্ষ করতে হল। বাংলা ও পঞ্জাবের মানুষের হাহাকার আমাদের মনে ফেলে গিয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী ছাপ। তারই মধ্যে স্বাধীন ভারতের ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা আমরা দেখলাম। আমাদের নিজেদের বেড়ে ওঠা, জীবন সংগ্রামের সঙ্গে দেশের ভাগ্যও জড়িয়েছিল। কোনও এক সময়ে দেখলাম আমরা দেশের স্বাধীনতার ছয় দশক পেরিয়ে এসেছি।

স্বাধীনতার ষাট বছর পূর্তি উৎসবে ঘটনাচক্রে আমি ছিলাম নিউইয়র্কে। ফিফথ অ্যাভেনিউ দিয়ে হেঁটে যেতে চোখে পড়ল বাতাসে উড়ছে রঙিন ব্যানার, কোথাও বা প্ল্যাকার্ড তাতে উজ্জ্বল রঙে লেখা 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'। বিদেশে ভারতের জয়ধ্বজা উড়ছে দেখে প্রসন্ন বোধ করলাম। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির সুন্দর স্থাপত্য, তারই সিঁড়িতে বসে খানিকক্ষণ দেখলাম অতিথিরা প্রবেশ করছেন হলঘরে। স্বদেশীয় এবং বিদেশি। হলঘরে আমরা আসনগ্রহণ করবার পর শুরু হল বিশিষ্ট অতিথিদের ভাষণ। ভারতের কৃতিত্বের কথা, ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রশস্তি। আমজাদ আলি তার দুই পুত্রকে দু'পাশে বসিয়ে সরোদ বাজিয়ে শোনালেন মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে।

এরই ক'দিন পরে উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে যোগ দিলাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফগ আর্ট মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণে। ছোট ছোট গোলটেবিল ঘিরে অভ্যাগতরা বসেছেন। বক্তৃতা চলছে, কে যেন বলছেন আজ কত লক্ষ



ভারতীয়ের হাতে আছে মোবাইল ফোন। খাদ্য, পানীয় পরিবেশিত হয়েছে অভ্যাগতদের জন্য। প্রাঙ্গণের একপাশে স্টেজে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র সেতার বাজাচ্ছে। আমি উঠে গিয়ে তাদের কাছে বসলাম। কানে ভেসে এল পরিচিত সুর — সা রে মা পা নি সা, নি সা র্রে, মা, গা, রে, গা, সা— রাগ দেশ। মনটা উদাস হয়ে গেল। ষাট বছর আগে স্বাধীনতা দিবসে দাঁড়িয়েছিলাম দিল্লির পথের ধূলায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিদায় ও স্বাধীন ভারতের উত্থানের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তারপর কেটে গেছে ছয় দশক। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ছিলাম পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হল-এ, শুনেছিলাম মহাত্মা গাঁধীর ভাষণ, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান। আরও ছিল জওহরলাল নেহরুর 'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি।' আজ দূর প্রবাসে হীরক জয়ন্তী উৎসবে দেশ রাগের মূর্ছনা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের করিডরে যেখানে কত ইতিহাস রচিত হয়েছে। আমারও পদচিহ্ন রয়েছে স্বল্পকাল। মনে হল আমরা যারা ঐতিহাসিক— মধ্যরাতের তরুণ প্রজন্ম— আমরা কত ইতিহাসের সাক্ষী, কত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ আমাদের এই জীবন।

# নির্দেশিকা


অজন্তা ৩৯, ৪০
অজিত পাঁজা ৪৮, ৫২, ৫৬-৫৮, ৬৭,৬৮, ৮৭, ১৩১, ১৮২
অজিতবাবু দ্র. অজিত পাঁজা
অটলবিহারী বাজপেয়ী ৪, ২৯, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৬৭, ৬৮, ৭৩-৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৪, ৮৭, ১১৪, ১২০-১২৩, ১৩৩, ১৩৮, ১৪২, ১৫০, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৭
অতুল তিওয়ারি ১৩৫
অতুল বসু ১৭৮
'অদেখা কন্যাকুমারী'— Kanyakumari Unvisited ১২৯
অনিতা বসু ৪৭, ৪৮, ৮৬, ৮৭, ৯৩, ১২৬, ১৫৩, ১৫৪
অনির্বাণ ১৭২
অপর্ণা সহায় ১৩০
অমর সিং ১৩৮
অমর্ত্য সেন ১০২, ১৭৪
অমলা ৮, ৮৩, ১০৮, ১১০, ১২৪, ১৭২
অম্বর প্রসাদ ১৩০
অমিতাদি [অমিতা সেন] ১০২
অমিতাভ ঘোষ ১০১, ১৭৪
অযোধ্যা মন্দির বিতর্ক ১৪৭
অরুণ জেটলি ৮৮
অর্জুন আপ্পাদুরাই ১৪৫
অশোক মিত্র ১৯২
(ডা.) অশোক সেনগুপ্ত ৮
অশোক হোটেল ১২১, ১৭৮
আই এ রহমান ৮০
আই এন এ দ্র. আজাদ হিন্দ ফৌজ
আউগসবুর্গ ১৫৩
আওরঙ্গজেব ১৪৯
আকবর দ্র. আকবর আলি খোন্দকার
আকবর আলি খোন্দকার ৫৮, ৬৭, ৬৯, ১৩০, ১৮২, ১৮৬
আগা শাহিদ আলি ১৬০
আগ্রা ৮০
আগ্রা বৈঠক ১২৭
আগ্রা শীর্ষ বৈঠক ১২৩
আগ্রা সামিট ১২২
আজাদ হিন্দ ফৌজ ২১, ৪৪, ৪৭, ৭৩, ৭৯, ১৪৩, ১৪৯, ১৬১, ১৭০
আজাদ হিন্দ সরকার ৪৬
আজিজ আহমদ খান ১৫৯
আদবানিজি দ্র. লালকৃষ্ণ আদবানি
'আনটু হিম এ উইটনেস' ১৪৫
আনন্দবাজার পত্রিকা ৮৩
আনন্দ মাহিন্দ্র ১৫৪
আনন্দমোহন বিশ্বাস ১৮১, ১৮২, ১৮৬
আন্দামান ৪৬, ১৭৬
আন্দ্রাবি দ্র. জলিল আনদ্রাবি
আফগানিস্তান ৪-৬, ৯১, ১৩৪, ১৫২, ১৮৮
আফতাব শেঠ ১৪৩
আফ্রিকা ৯১, ১১৭
আবদুর গফফুর ৭৩

আবদুল কালাম ৭৫, ১৪৫, ১৫৯, ১৬৯
আবদুল্লা, জর্ডানের রাজা ৯৩
আবুল বাশার ১১, ১৩, ২২, ২৫
আবুল হাসান চৌধুরী ১৭৪
আবুল হাসেম ২৮
আভা মাহাতো ১০০
আমজাদ আলি ৫৭, ১৯৩
আমিনা ১৬২
আমেদাবাদ ১১৬, ১৩৭, ১৩৮
আমেরিকা ৪, ৬, ৭৪, ৮৯, ৯০, ৯৬, ১০২, ১০৪, ১১৫, ১১৭, ১৩৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৮৮
আম্মান ৯২, ৯৪-৯৬, ৯৮
আয়ার্ল্যান্ড ১৬০
আয়েষা [জালাল] ১৩৬, ১৪৫, ১৭৪
আর এল ভাটিয়া ৮৭
আরব ৯২, ১৮৯
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৪০, ৬৮
আর্দেশির কাওয়াসজি ১২২
আলিপুর ২৫, ৬০, ৮৪
আলেকজেন্ডার ওয়ার্থ ৪৭
আস্‌মা জাহাঙ্গির ৮০, ১৮৯
আহমদ শাহ মাসুদ ৫
অ্যাঞ্জেলিকা কসটার লোসাক ৯৩, ৯৪, ১১৬
'অ্যান আউটসাইডার ইন পলিটিক্স' ১৯০
অ্যামনন রুবিনস্টাইন ১২১
অ্যালান [অ্যালান রসলিং] ১১১, ১৪৫
অ্যালেনবি রোড ১৪৫
আঁদ্রে লাজোয়ানি [Lajoinie] ১২৮

ইউ এন প্লাজা হোটেল/মিলেনিয়াম হোটেল ১০০
ইউ সি কিন ১৪২
ইউজেন চেন ১৪২
(ডা.) ইয়োশিমি ১৪২
ইকবাল আহমেদ ১৬৬
ইজরায়েল ৯২, ৯৪, ১২১, ১৮৯
ইজিপ্ট ১৯৩
ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ৮২, ১০২, ১১১
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা ৯৮
'ইন্ডিয়ান ককাস' ১৫৫
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস [ICCR] ৮৮, ১৫১, ১৭১, ১৭৫
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি দ্র. আজাদ হিন্দ ফৌজ
ইন্দিরা [ললিত মান সিং-এর স্ত্রী] ১৫৮
ইন্দিরা গাঁধী ১২, ১৫, ৬৬, ৬৮
ইন্দোনেশিয়া ১৯২
ইন্দ্রকুমার গুজরাল ৪২, ৮৭
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ২৭, ১৬৭
ইব্রাহিম মানটু [Mantu] ১১৭
ইম্ফল ১৬০
ইরাক ৮৯-৯১, ১৫১-১৫৩, ১৫৬, ১৮৮
ইলা [বসু] ১১৩
ইলোরা ৩৯
ইয়াসিন মালিক ১৬১, ১৬২
ইয়েরান নাইডু ১৪৪
ইয়োরোপ ১৯, ১১৫, ১১৭, ১২৬, ১৩৬
ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন ১১৬
ইসলামাবাদ ৮০
ইংল্যান্ড ৪, ৯৬

উইমেনস এমপাওয়ারমেন্ট কমিটি ৯৯, ১৩৭, ১৭৭, ১৮৭
উইসবাডেন ৭২, ১৫৩
উগান্ডা ১১৭
উজ্জয়িনী ৪৬
(ডা.) উডবাদিযা ৮১
উড়িষ্যা ৭৭, ৭৮
উত্তরপ্রদেশ ৪০-৪২, ১৬৪, ১৬৯
উলফগ্যাঙ থিয়েরস [Thierse], জার্মান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ১১৭

এন এন ঝা ১৭৬
এম এস গিল ৯৮, ৯৯
এমিলিয়ে [শেংকল বসু] ৪৭, ৪৮
(মিসেস) এমোরি ১৪৩
(ডা.) এরিন ব্রোচা ৮১, ১২৪, ১৩৫
এল এম সিংভি ৮৭, ১১৬
এলমার ব্রক ১১৫
এলেনা মাসেরোট্টি ১৫৮
এশিয়া ৭৬, ৯২, ১৭৪
এস এ আয়ার ১৪৫
এস বি চ্যবন ৩৬, ৪১, ৬৮

ওগাচা [Ogacha] ১১৭
ওমর আবদুল্লা ১৪১
ওমান ১১৭
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১০২
ওয়াশিংটন ৮৮, ১৩৬, ১৪৫, ১৫৪-১৫৮
'ওয়েলিং ওয়াল' ৯৪

ঔরঙ্গাবাদ ৩৯

কন্যাকুমারী ১২৯
কপিল সিবাল ১৫৩, ১৬৮, ১৭৪
কবিতা মেনডেন ১৩৫
কবিতীর্থ ৬, ১৩, ১৪, ১৬, ২৫, ৪৯, ৬২-৬৪, ৮২, ১০২, ১৭২
কমলেশ শর্মা ১০০, ১১৩, ১২৫
করণ থাপার ৯৮
করণ সিং ৮৭
করাচি ৮০, ৯৫
কর্নাটক ৪১
কর্নাটকে সাঁইবাবার কলেজ ৩৭
কর্নেল দারা ৮০
কলকাতা ৬, ১০, ১২, ৩৪, ৩৯, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৭৫, ৮১-৮৩, ৯৫, ৯৬, ১০৩, ১০৮, ১১৩, ১১৪, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৪৪, ১৫১, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৭০-১৭৫, ১৭৭
কলকাতা বিমানবন্দর ৬৮
কল্পনা [কল্পনা সেন] ১২৬
কল্যাণেশ্বরী মন্দির ১৭৩
(ডা.) কাউল ১৬১
কাকলি ঘোষদস্তিদার ১৩, ১৬, ২২, ২৫, ২৬
কানওয়াল সিবাল ৮৮, ১০০, ১৫১
কানাডা ১৭৭
কান্তি গাঙ্গুলী ৮৩
কাবুল ৬, ১০৫
কার্গিল যুদ্ধ ৮০
কার্তিক ২৭, ৩৫
কাশ্মীর ৪৯, ৫০, ৭৩, ১১৪, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৫৬, ১৫৯-১৬১, ১৭০
কাশ্মীর টাইমস পত্রিকা ১৬৬
কাসাব্লাঙ্কা ৭২
কিটস ৭৩
কুমুদ ভট্টাচার্য ৮, ১৩, ২২, ২৫
কুয়ালালামপুর ৪৬, ১৮৯
কুরবান ১৭৭
কুলদীপ নায়ার ৮৮
কে আর নারায়ণন ৭৭, ১৬৯
কেমব্রিজ ইংল্যান্ড ৯৬
কেশপুর ১৮৬
কোকিলা ১৫৩, ১৫৪
কোভালম বিচ ১২৯
ক্রিস প্যাটেন ১১৫, ১১৬
ক্রিস্টিন রোকা ১৫৬, ১৭৩
ক্রিস্টিনা রসেটি ১৭৯
(মি.) ক্রেসপো [Crespo] ১৪৪

খলিলি ৫, ১৩৪
খারদুংলা পাস ১৬৫, ১৬৬

'গঙ্গা' ১২২
গড়বেতা ১৮৬
গণি খান চৌধুরী ৪৮, ৬৫
'গাজা স্ট্রিপ' ১৬২
গাজিয়াবাদ ১২৮
গাঁধী স্মারক নিধি ৪০
গাঁধীজি ৭, ২১, ৪০, ৪৪, ৪৫, ১৪১, ১৪৯
গায়ত্রী স্পিভাক ১১৪
গিয়াসুদ্দিন মোল্লা ১২
গিরিজা ব্যাস ১০০, ১৮৫
গিল দ্র. এম এস গিল
গুজরাট ১১৬, ১৩৮-১৪১, ১৮২, ১৮৩
গুজরাল ৪২-৪৫, ৫১, ৫২, ১৬৯
গুরুবক্স সিং ধীলন ৪৭, ১২৮
গেরনট এরলার [Erler] ১১৭
'গ্রেট এসকেপ' ১৪৫, ১৭৬
গোধরা ১৩৮
গোপালকৃষ্ণ গাঁধী ৩১, ১৯৩
গোপাল ঘোষ ১৭৭
গোপীনাথন ১৫৫
গোয়া ৩৯, ৬৮, ১৩৮
গোলাম কাদের ১৭৭
গোল্ডেন মসজিদ ৯৪
গ্যারি অ্যাকারমান ৮৯

চন্দ্র প্যালেস ১৩০
চন্দ্রবাবু নাইডু ৬৭
"চরণ রেখা তব" ১০৭
চাণক্যপুরী ৯১
চারুচন্দ্র চৌধুরী ২৭
(ডা.) চিত্তরঞ্জন রানাওয়াট ১১৪, ১২৩, ১৩৫
(পি.) চিদাম্বরম ২৯, ৩৩-৩৫
চিন ৭৬, ১১৬, ১৪২, ১৬৪, ১৬৭, ১৭০
চিন্তামণি কর ১৬৯
চেন সুই বিয়ান ১৪২
চেন্নাই ১৪৪
চোকিলা আইয়ার ৮৮
চৌরঙ্গি ৬, ৩০

জওহরলাল নেহরু ১৬, ৪০, ৪৪, ৪৫, ১৬৯, ১৯৫
জন শিলসি ১৬০, ১৬২
জনা কৃষ্ণমূর্তি ৮৮
জম্মু ১২৮, ১৬৬
জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট ৪৯, ১৬১
জয়ন্ত ভট্টাচার্য ১৮১
জয়ন্তী নটরাজন ৭২
জয়ন্তী রবি ১৩৮
জয়পুর ৩৭, ১৩০
জয়ললিতা ৬৭, ৭৬, ৭৭
জয়শ্রী মোহন্ত ১০০
জয়া প্রদা ৮৮
জর্জ ফার্নানডেজ ১০৯, ১১০, ১১৮, ১৩০, ১৭০
জর্জ বুশ ১৭৫
জর্ডান ৯২, ৯৫
জলন্ধর ৪৬
জলিল আনদ্রাবি ৪৯, ৫০, ১৫৯, ১৬০, ১৬১
জহর দাস ১৮
জাতীয় মিউজিয়াম ৪১
জানকি অথিনাহাপ্পন ৪৬, ১৮৯
জাপান ৪৭, ৭৪, ১৪৪
জাবাল ৯৫
জারোশ ৯৬
জালালউদ্দিন রুমি ৫
জাস্টিস ভর্মা ১২৪
জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল ১০০
জার্মানি ৪৮, ৭২, ১০৯, ১২৫, ১২৬, ১৪৬, ১৬৭
জিতেন্দ্রপ্রসাদ ৪১, ৪২, ৪৫, ৫০, ৫১, ১৬৯
জিন্না ১১৭



জিন্না হাউস ১১৭
জিম ম্যাকডরমট ৮৯
জিলানি ৪
জুবিন [Zubin] মেটা ১৫৪
জেনারেল কাটাকুরা ৪৭
জেনারেল ত্রিপাঠী ১৫৩
জেনারেল ফুজিওয়ারা ৪৭
জেনেভা ৭৩
জেরুজালেম ৯৪, ৯৫
জোকা ৮
জোয়াজিয়াম ভ্যাল আর্টসেন [Aartsen] ১১৮
জ্যান সেকোওস্‌কি ৮৯
জ্যোতি বসু ১০, ২০, ২১, ২৭, ৬৪
জ্যোতিবাবু দ্র. জ্যোতি বসু

ঝিলম নদী ৫০, ১৬০

টলি ক্লাব ১০৬, ১০৭
টাইমস অব ইন্ডিয়া ৯৮
টাউন হল ১০৯, ১৭২
টাটা ১৯২, ১৯৩
টি এন চতুর্বেদি ৮৭
টিপু ৬৩, ৮১, ১০৬, ১১২, ১২৪, ১৩৬, ১৪৫
'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি' ১৯৫
টুইন টাওয়ার ১০১
টুরেন ১৪২
টুংকু ১২৫, ১৭৫
টেরেশিট্রা ১৫৬
টোকিও ৪৭, ১৪৩
টোনি ব্লেয়ার ১২১, ১৩৫
Tryst with Destiny বক্তৃতা ১৬৯

ডলি [রায়] ১০৯
ডায়মন্ডহারবার ১১
'ডায়েট' ১৪৩
ডেড সি ৯৩, ৯৪
ডেনমার্ক ১৫৮, ১৫৯
ডেভিড গুড ১৭৪
ডোনা [গাঙ্গুলী] ১৭২

তপন [মল্লিক] ১১১
তরুণ দাস ১৫৪
তাইওয়ান ১৪২
তাইপে ১৪১, ১৪২
তাইপে বিমানবন্দর ১৪২
তাজ প্যালেস দ্র. তাজমহল হোটেল
তাজ বেঙ্গল ১২৫
তাজমহল হোটেল ১২১, ১২২, ১২৫
তানজানিয়া ১১৭
তিয়েনামেন স্কোয়ার ১১৬
তিরুপতি ১৩৭
তুষার [রায়চৌধুরী] ২১-২৩, ২৬, ৫৯, ৬৩, ৮২
তেহেলকা কেলেঙ্কারি ১৩০, ১৩১
ত্রিবান্দ্রম ১২৯

দক্ষিণেশ্বর ১১৩
দিলীপ রায় ১২৯
দিল্লি ১৩, ১৫, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪৬-৪৮, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬৬-৬৮, ৭৫-৭৮, ৮২, ৮৮, ৯১, ৯৬, ১০২-১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৫, ১৩৫, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৩, ১৫৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৫, ১৯১, ১৯৪, ১৯৫
দিগ্বিজয় সিং ১৩, ১৪৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৮৭
দীনেশদা দ্র. দীনেশ ত্রিবেদী
দীনেশ ত্রিবেদী ১৪০, ১৯১
দীপঙ্কর চক্রবর্তী ৪৯
দুবাই ৯৪
দুলাল দাসঠাকুর ১৮

দেবগৌড়া ৪১, ৪২
দেবী পাল ৪৮
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২১

নওয়াজ শরিফ ৭৫, ৮০
নগসুন্দরম ৭৩, ১০৬
'নচে' ৬৪
নটবর সিং ৮৮, ১১৬
নন-অ্যালাইনড মুভমেন্ট ৯০
নন্দনা [সেন] ১০২
নন্দীগ্রাম ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩
নমিতা [বাজপেয়ী কন্যা] ১২৩
নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭, ৬৭, ১০৯, ১৩১, ১৩৩
নরসিমহা রাও ২৯, ৪১, ৪৭, ৪৮
নরেন্দ্র মোদি ১৩৮, ১৪০
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ৩৭
নরেশ্বর দয়াল ১২৭
নাইজেরিয়া ১১৭
নাইন-ইলেভেন ১২৮
নাজমা হেপতুল্লা ৩০, ৯২, ৯৩, ১০০
নাজুমা ১৫০
নানমন হাসপাতাল ১৪২
নামিবিয়া ১৫০
নারায়ণ মুরথি ১৭০
নিউইয়র্ক ৯৯-১০১, ১১৩, ১২৩, ১২৯, ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৯৪
নিউইয়র্ক কনসুলেট ১২৬
নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি ১৯৪
নিকোবর ১৭৬
নিরুপমা রাও ৮৮
নিশি হোংগানজি মন্দির ১৪২
(ড.) নীতিশ সেনগুপ্ত ১৮২, ১৮৬
নীতিশকুমার ৭৩, ১৩৩
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪৬, ১২৯
নূর ইয়ালমান ১৭৪
নূর বানু ৪১

নেতাজি দ্র. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
'নেতাজি অরেশন' ৪৭, ১৮৯
নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ৫১
নেতাজি অ্যাওয়ার্ড ৪৭
নেতাজি ভবন ২৭, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৬০, ৭৩, ৭৫, ৮২, ১০২, ১০৬, ১০৯, ১১১, ১১২, ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৫, ১৬১, ১৭০, ১৭৪, ১৮৯
নেতাজি মিউজিয়াম ৪১, ১৪৪
নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো ৪১, ৪৬, ৭৩, ১২৮, ১৩৫, ১৪৫, ১৫৩, ১৬১
নেতাজি শতবার্ষিকী কমিটি ৪৩
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৬, ২০, ২১, ৩০, ৪০, ৪১, ৪৩-৪৮, ৫০, ৬৭, ৭৫, ৭৯, ৮৬, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১১২, ১১৩, ১৩৬, ১৪১-১৪৩, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৬১, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৬, ১৯৫
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর ৫৩, ৬৮, ৮২
নেতাজির স্মারক বক্তৃতা ১৪৫
নেদারল্যান্ডস ১১৭
নেপাল ৯৩, ১১৮, ১৭৪, ১৮৯
নেহরু দ্র. জওহরলাল নেহরু
নেহরুজি দ্র. জওহরলাল নেহরু
নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ৪০
ন্যান্সি পেলোসি ১৫৫
ন্যানো ১৯৩
'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট অব ডেমোক্রেসি' ১৫৬
ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস, চিন ১১৬
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ৪৪
ন্যাশনাল লাইব্রেরি ২৬, ৪১

'পঞ্চবটি' গৃহ ১২৭
পঞ্জাব ২০, ২৮, ৪৫, ৪৬, ৭৯, ১৭৬, ১৯৪
পটসডাম ১২৫, ১২৬



পশ্চিমবঙ্গ ৭, ৫০, ৫৫, ৮৪, ১৩০, ১৩১
পশ্চিমবাংলা ১২, ১৬, ২৪, ২৭, ৩১, ৩৫, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৭৮, ১৩০, ১৩২, ১৫৯, ১৯২, ১৯৩
পহালগাম ১৬৩
পাকিস্তান ৪, ৬, ৪৩, ৭৩-৭৬, ৭৯, ৮০, ৮২, ৯০, ৯৫, ১১৪, ১২৮, ১৫৮, ১৫৯, ১৭০, ১৭৪, ১৮৯
পারভেজ মুশারফ ৮০, ১২১-১২৩, ১২৭
পার্থসারথী ৭৯
পাঁচমহল ১৩৭
পাঁচমহল ত্রাণ শিবির ১৩৮
পি এম সৈয়দ ৭৩
পিউস মাসেকা [Msekwa] ১১৭
পিটার কোচ [Koch], নেদারল্যান্ডস-এর অ্যামবাসাডর ১১৭
পিস কিপিং ফোর্স ১২৬
পুটিন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ১০৪
পুত্তাপুর্তি ৩৭
পুষ্প ১১৯
পূর্ণ সাংমা ৩৩, ৪৪, ৪৫, ৫২, ৬৭, ৭৭, ১২৮, ১৮০
পৃথ্বিরাজ চৌহান ২৯
পেশোয়ার ৮০, ১৬৬
পোখরান ৭৫
পোল্যান্ড ১৪৬
প্যাটেন দ্র. ক্রিস প্যাটেন
প্রণব বর্ধন ১৮৯
প্রণব মুখার্জি ৪৭, ৪৮, ১১১
প্রণব মুখোপাধ্যায় দ্র. প্রণব মুখার্জি
প্রদীপ ভট্টাচার্য ৪৮
প্রদোষ দাশগুপ্ত [ভাস্কর] ১৭৭
প্রফুল্ল মোহন্ত ১০০
প্রভা রাও ১২৫, ১৮৫
প্রমিতা মল্লিক ১১০, ১১১
প্রিন্সেস সার্ভাথ ৯৫, ৯৬
প্রিয়রঞ্জন দ্র. প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ৩৫, ৪৮, ১৭০, ১৮০
প্রীতি [সতীশ মেটার স্ত্রী] ১০০, ১১৩
প্রেসিডেন্সি কলেজ ৮, ১৩৫, ১৬৩
প্রেসিডেন্সি জেল ৮২

ফগ আর্ট মিউজিয়াম ১৯৪
ফলি নরিম্যান ৮৮
ফারুক আবদুল্লা ১৬০
ফিকি ১৪৭, ১৭৩, ১৭৮
ফিলিপ মরিও [Philip Morillon] ১১৫
ফুলনদেবী ১০০, ১০১
ফেজ ৭২
ফ্রান্সিস জেভিয়ার ১৭৬
ফ্ল্যানসিস জে আউমে [Ayme] ১১৭

বরখা দত্ত ১০৭
বরোদা ১১৬, ১৩৭, ১৩৮
বসনিয়া ১৮৬
বসন্ত চৌধুরী ৮৬
বসুন্ধরা ১০৯
বসুন্ধরা গৃহ ৫৬, ৫৮, ৮৬, ১০৬, ১১১, ১১৩, ১২৯, ১৪৪, ১৫১, ১৯০ [দেখুন বসুন্ধরা]
বসুন্ধরা রাজে ৩০, ১০২
'বসুবাড়ি' ১০৭
বস্টন ৮১, ৯৯, ১০১, ১০২, ১১৩, ১১৪, ১২৯, ১৩৬, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮
বাংলা ১৭৬, ১৯৩
বাংলাদেশ ৯৩, ১১৪, ১১৮, ১৪৬, ১৭৪, ১৮৯
বাংলা ভাগ ২৮, ১৪১
বাঙ্গালোর ১৯৪
বাজপেয়ী দ্র. অটলবিহারী বাজপেয়ী
বাজপেয়ীজি দ্র. অটলবিহারী বাজপেয়ী
বাভেরিয়া ১১৭
বারুইপুর ৬, ১৩, ১৪, ১৬, ২৫, ৪৮, ৫৮, ৬৫, ৮২, ১২৭, ১৮৩

বার্নালা ৪৫
বার্লিন ১২৫, ১২৬, ১৫৩, ১৫৪
বালযোগী ৭০, ৭২, ৭৮, ৯২, ১২১, ১৮০
(ডা.) বিক্রম সরকার ৫৭, ৫৮, ৬৭, ১৩১, ১৪০, ১৭৩, ১৮২, ১৮৬
বিক্রমকেশরি দেও ১৫৪
বিক্রমচন্দ্র ১০৮
ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল ৮১, ১২৩, ১২৪
বিজয় গোয়েল ৭৬
বিজয় চক ৪৬
বিজয় নাম্বিয়ার ১২৫, ১৩৬, ১৫৫, ১৫৮
বিজয়া ঠাকুর ১১৩
বিমান বসু ১৩২
বিল কার্বি ১৫৮, ১৭৪
বিল ক্লিন্টন ৮৯, ৯০, ১৫৭
বিশ্বনাথন ১৪৪, ১৬৪, ১৬৬
বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ৪৬
বিষ্ণুপুর ৬, ১০, ১৩, ১৫, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৫, ৪৮, ৫৮, ৬৩, ৬৫, ১৩৪, ১৮৩, ১৮৪
বিহার ৪০, ৪৮, ৭৩, ১০০, ১৮৫
বুদ্ধদেববাবু দ্র. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৬, ১৮, ২৪, ২৫, ২৬, ৬৪, ১৩২, ১৩৩, ১৯০
বেগম নূর ৪৫, ১৬৯
বেজিং ৯৭
বেথলেহেম ৯৪
বেদ ভাসিন ১৬৬
বেলুড় ৩৭
বৈষ্ণোদেবী ১৬৬
'বোস, দ্য ফরগটেন হিরো' ১৭০
(মিসেস) ব্যাটরা ৬
(মি.) ব্ল্যাকউইল ৪-৬, ১৩৪, ১৫২
ব্রহ্মকুমারী ৩৭, ৮৮
ব্রাউনিং ১৯, ২০
ব্রাসেলস ১১৫
ব্রাহিমি রিপোর্ট ১২৬
ব্রিনমোর কলেজ আমেরিকা ৯৬
ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট ১৫৫

ভঙ (Vong) [রেস্তোরাঁ] ১৪৫, ১৫৪
ভবতোষ দত্ত ৪৭
ভবানীপুর আর্ট ফ্রেমিং ১০৪
ভবানী সিং ১৩০
ভাবনা চিকলিয়া ১০০
ভারতবর্ষ ৪, ৫, ৭৪, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৫, ১১৯, ১৭৪, ১৮৮-১৯০, ১৯৪
ভারতী রায় ১০০
ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ৮৯, ৯০, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৭৮, ১৮৯
ভারত-জাপান সম্পর্ক ১৪৩
ভারত-জার্মান সম্পর্ক ১১৭
ভারত-পাক সম্পর্ক ৪, ১৭১
ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ১৫৮
ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক ১১৯
ভারত-ভাগ ১৪১
ভারত-ভুটান সম্পর্ক ১১৮
ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ১১৭
'ভারতমিত্র' বা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড' ১৫৫
ভাসিন দ্র. হর্ষ ভাসিন
ভিয়েনা ১৩৪
ভুটান ১১৭, ১৭৪
ভেখ বাহাদুর থাপা ১১৮
ভেঙ্কটরমণ ৪৬, ১৭৬
ভেঙ্কাইয়া নাইডু ৮৮
ভেড্রিন দ্র. হিউবার্ট ভেড্রিন ১১৯
ভেনিস ৩৪
ভোলাবাবু ৯

মগরাহাট ৬, ১০-১৪, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ৫৮, ৬১, ৬৫, ১২৭, ১৮৩, ১৮৪
মণি দ্র. প্রমিতা মল্লিক
মণিপা ৫৭, ১০৮
মণিপুর ১৭
মণিশঙ্কর আয়ার ৫৭
মধ্যপ্রদেশ ৪৬, ১৭৮
মনমোহন সিং ২৯, ৩৩, ৩৪, ৪৩, ১৫১
মনিয়া [দত্ত] ১১৩
মনোরঞ্জন ভক্ত ৩৪
মনোহর যোশি ১৮০
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৬, ২৬, ৩০-৩২, ৩৫, ৪৮, ৫০-৫২, ৫৪-৫৮, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৮৪-৮৭, ১০৭, ১০৯, ১২৪, ১৩০-১৩৩, ১৩৯, ১৪০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯০, ১৯১
মমতা দ্র. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মরক্কো ৭১-৭৩, ১১৭
মসিয়ঁ ফসোঁ [Fauchon] ১৪৪
মহম্মদ জমান কিয়ানি ৮০
মহাত্মা গাঁধী ৪৪, ৬৬, ১৫০
দ্র. গাঁধীজি
মহাদেব নস্কর ১৩, ২২, ২৫
মহারাষ্ট্র ৮১
মাউন্ট আবু ৩৭
মাউন্টব্যাটেন ১৭০
মাদার টেরেসা ১৫৭
মাধবী মুখার্জি দ্র. মাধবী মুখোপাধ্যায়
মাধবী মুখোপাধ্যায় ১৩২, ১৩৩, ১৯০
মানস সরোবর ১৬৪
মান সিং ১০৬, ১৩০
মানেকা গাঁধী ৭৩, ৮৮
মানুদা দ্র. সিদ্ধার্থশংকর রায়
মান্দালয় জেল ১১০
মায়ানমার ১১৮, ১৮৯
মায়াবতী ৭৭, ১০০, ১৪০
মারাকেশ ৭২
মারিজুদ্দিন ১২৯
মার্গারেট দ্র. মার্গারেট আলভা
মার্গারেট আলভা ৯২, ৯৩, ৯৮, ১০০, ১৩৮, ১৮৬, ১৯০
মার্টিন পাফ ৯৩, ১২৬, ১৫৩
মালয়েশিয়া ৪৬
মালিনী ভট্টাচার্য ১৬, ১৯, ২০, ৬২
মাৎসুসিমা ১৪৩
মি. ঘোরাই ১৩৫
মিনতি সেন ১৬৩
মুফতি মহম্মদ সৈয়দ ১৬১
মুফতি সাহেব দ্র. মুফতি মহম্মদ সৈয়দ
মুবাশির হাসান ৮০
মুম্বাই ৮১, ৮৩, ১২৩-১২৫, ১৪৪, ১৯৩
মুলায়ম সিং যাদব ৩৫, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৯৮
মুশারফ দ্র. পারভেজ মুশারফ
মুসলিম লিগ ২৮
মেখটিলড ১১৪
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৮২
মেদিনীপুর ১৮৬, ১৯২
মেহবুবা ১৬১
মোচিজুকি ১৪৩, ১৪৪
মোরে শহর ১৭
মোর্শেদ খান ১৪৬
মৌর্য শেরাটন ১২১

'যমুনা' ১২২
যশোবন্ত সিনহা ৮৮
যশোবন্ত সিংহ ৮৮, ৯০, ১২১, ১২২, ১২৭, ১৫৬
যশোর ১৩০
যশোরেশ্বরীর কালীমন্দির ১৩০
যাদবপুর ৬-৯, ১৩, ১৫-১৮, ২২-২৬, ৩০, ৪৯, ৫৯, ৬১-৬৬, ৮৩, ৮৪, ১০২, ১৩২, ১৩৩, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৪৯, ১৩৫
যামিনী রায় ১৭৭
'যে তরণীখানি' ১১৫, ১২৯

রঙ্কু ঘোষ ১৬

রঙ্কুদা ১৬, ১৮, ১৯, ২১-২৪, ২৬, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৮২ দ্র. রঙ্কু ঘোষ
রঙ্গচারি ১৫৩, ১৫৪
রঙ্গনাথ মিশ্র ৮৭
রঞ্জন ১৭২
রঞ্জিতদা দ্র. (ডা.) রঞ্জিত পাঁজা
(ডা.) রঞ্জিত পাঁজা ৫৭, ৫৮, ৬৭, ১৪০, ১৭৩, ১৮১
রণজিৎ গুহ ১১৪, ১৩৪
রণেন সেন ৪, ১২৬, ১৩৭, ১৭৪
রতন ১০, ১৮, ২২, ২৬, ৫৯, ১৭২
রতন মুখার্জি ২৭, ৩৪, ৫২, ১২৪, ১৮১
রতনলাল ব্রাহ্মণ ২৭
রত্না শূর ১৭৫
রত্না সিং ৪১
রবীন্দ্রনাথ ৩১, ১১০
রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার ১৭৫
রস আইল্যান্ড ১৭৭
রহমান [এ আর রহমান] ৪৬
রাওলপিণ্ডি ৮০
রাঙাকাকাবাবু [নেতাজি] ১০৩, ১১১-১১৩, ১৪৫
রাজদীপ সরদেশাই ৯৮
রাজস্থান ৩৬, ৩৭, ১৭৮
রাজা মহম্মদ আরশাদ ৮০
রাজা হাসান [রাজা হুসেনের ছোট ভাই] ৭১
রাজা হুসেন ৯৩, ৯৫
রাজীব গাঁধী ৩০, ১৪১
রাজীবপ্রতাপ রুডি ১৩৮
(ডা.) রানাওয়াট দ্র. চিত্তরঞ্জন রানাওয়াট
রানি অফ ঝাঁসি রেজিমেন্ট ১৮৯
রানিয়া [জর্ডানের রাজার স্ত্রী] ৯৩
রাবাট [মরক্কোর রাজধানী] ৭২
রাম জেঠমালানি ৬৯
রামকৃষ্ণ মিশন ১৮৮
রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান ১১১
রামবিলাস পাসোয়ান ৬৯
রামপিয়ারি রাম ১৩, ১৪, ২৫, ৬২
রামমন্দির বিতর্ক ১৪৭
রামমোহন রাও ১৫৪
রাষ্ট্রপতি ভবন ৪৬
রাসগোত্র সাহেব ১৬৪
রিখটার [জার্মান রাষ্ট্রদূত] ১১৭, ১৪৬, ১৫২
রীতা ভার্মা ৭৩, ৭৪
রেণুকা চৌধুরী ১৩৭
রেনকোজি মন্দির ৪৭, ১৪৩

(ডা.) লড ১৩৫
লন্ডন ৮১, ৮৩, ৯৫, ৯৯-১০২, ১১৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৫, ১৫৮, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫
ললিত মান সিং ৪, ৮৮, ১০৫, ১৩৬, ১৪৫, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮
লক্ষ্মীকান্ত বোস ৮
লাওস ১৭৭
লাদাখ ১৬৪-১৬৬
লালকৃষ্ণ আদবানি ৭৪, ১২২, ১২৪, ২৬৮
লালকেল্লা ৪৬, ৪৭
লালন ১০, ১৮
লালুপ্রসাদ যাদব ৬৯, ৭১, ১৬৮
লাহোর ৭৯, ৮০
লাহোর ফোর্ট কারাগার ৮০
লিওনপো ভাগো শেরিং, ভুটানের রাষ্ট্রদূত ১১৮
লি পেঙ ১১৬
লে ১৬৪, ১৬৫
লেনক্স হিল হাসপাতাল ১১৪
লেনার্ড গর্ডন ৮৭, ১১৪, ১২৬, ১২৯
লেনি গর্ডন ১০১
লোগান এয়ারপোর্ট ১২৯
লোথার ফ্রাঙ্ক ১৫৩
ল্যারি সার্মাস ১৫৮, ১৭৪



শম্ভু ২৬, ১৭২
শরৎচন্দ্র বসু ২৮, ১১০, ১১১, ১২৮, ১৪১
শরৎ বসু লেকচার ১৭৪
শরৎ বসু স্মারক বক্তৃতা ১৯০
শরৎ বসু হল ১৩৫
শরদ পাওয়ার ৪১, ৫১, ১৮৬
শর্মিলা [বসু] ৩৪, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৮৬, ৮৭, ৯৬, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১১-১১৩, ১২৯, ১৪৫
শশী ত্রিপাঠী ১২৭
শহিদ মিনার ৫১
শংকরদয়াল শর্মা ২৯, ৪৬, ১৬৯
(জেনারেল) শংকর রায়চৌধুরী ১৫৪, ১৫৬
শায়েস্তা সুরাবর্দি [সুরাবর্দির ভগিনী] ২৮, ৯৫, ৯৬
শারদ যাদব ৪৩
শারদা ১০০
শাহ আলম ক্যাম্প ১৩৭
শাহিদ আলি ১৬০,
শিগেমোটো ওকুদা ১৪৩
শিবরাজ পাতিল ৯৮
শিবশংকর মেনন ১৫৮
শিবুসাওয়া জুনিয়র ১৪৩
শিবুসাওয়া সিনিয়র ১৪৩
শিশির ২৭, ৭৩, ৮৬, ৮৭, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০১-১০৩, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৪২, ১৪৬, ১৫৩, ১৭৬
শিশিরকুমার ৮, ১২-১৪, ১৮-২০, ২৬, ৩০, ৩২-৩৪, ৪০-৪২, ৪৪-৪৮, ৫০-৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৭২, ৭৩, ৭৯-৮৪, ৮৬, ৯৬, ৯৯, ১০২-১০৭, ১০৯-১১৩, ১২৪, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৬ দ্র. শিশির, শিশিরকুমার বসু, শিশিরদা, ডা. শিশির বসু, ডা. শিশিরকুমার বসু
শিশিরকুমার বক্তৃতা ৮৭
(ডা.) শিশিরকুমার বসু ৬, ৯, ১৪, ২৮, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৮৬, ১০৫, ১৩৫, ১৪৫, ১৬৯ শিশির, শিশিরকুমার, শিশিরদা, ডা. শিশির বসু
শিশিরকুমার বসু বক্তৃতা ১৮৯ দ্র. শিশিরকুমার বক্তৃতা
'শিশিরকুমার বসু সরণি' ১৪৫
শিশিরদা ১০৯
[দেখুন, শিশির, শিশিরকুমার, শিশিরকুমার বসু, ডা. বসু, ডা. শিশিরকুমার বসু, ডা. শিশির বসু]
শীলা জ্যাকসন লি ৮৯
শেরিফ প্রবীর রায় ১৪৫
শেলি [ইংরেজ কবি] ২০
শৈলজ [সাংসদ] ২০
শোপেনহাওয়ার ১৪৮
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ১৩-১৫, ২২, ২৫
শ্যামবাজার ৫৪, ৫৬, ৫৭
শ্যাম বেনেগাল ১৩৫, ১৩৬, ১৭০, ১৮৯
শ্যামা সিং ১৮৫
শ্রীঅরবিন্দ ১৪৮, ১৪৯
শ্রীনগর ৪৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৪
শ্রীরাম ১৪৯
শ্রীলঙ্কা ১৭৪, ১৮৯
শ্রোয়েডার [জার্মান চানসেলর] ১১৭

ষোলো আনা মসজিদ ১৭৭

(জেনারেল) সতীশ নাম্বিয়ার ১১৫, ১২৫
সতীশ মেটা ১০০, ১১৩
সতীশ লাম্বা ৬, ১৩৪
সত্য পাল ১০০, ১১৩
সত্যব্রত চতুর্বেদি ১৫৪
সত্যব্রত পাল ১৭৫
সনিয়া দ্র. সনিয়া গাঁধী
সনিয়া গাঁধী ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৭৬-৭৮, ৮৯, ১২২, ১৬৮, ১৮৫

সনিয়া ভার্মা ৯৮
সন্তোষমোহন দেব ৩৩-৩৫
সরশুনা ২০, ২১
সলিল [দত্ত] ১১৩
সংগ্রামপুর ১০, ১১
'সাউথ এশিয়া ইনিশিয়েটিভ' ১৭৪
'সাউথ এশিয়া উইদাউট বর্ডার' ১৭৪
সামা জাইদি ১৩৪
সায়গন ১৪২
সার্ক সামিট ৭৫
সার্ভাথ দ্র. প্রিন্সেস সার্ভাথ, সার্ভাথ এল হাসান
সার্ভাথ এল হাসান ৯৫
সালভাডোর ডালি ১০৪
সালিম ১৯২
সাংমা দ্র. পূর্ণ সাংমা
স্বামী বিবেকানন্দ ১৪৮
সাঁইবাবা দেখুন সাইবাবা ৩৭-৩৯, ১৮৮
সাঁওতাল পরগনা ১৭৩
সি আই আই ১১৮, ১৪৭, ১৫৪, ১৭৩
সিউ লিয়েন অ্যানেত লু ১৪২
সিঙ্গুর ১৮৬, ১৯১-১৯৩
সিঙ্গাপুর ৭৯
সিদ্দিক ১৬৫, ১৬৬
সিদ্ধার্থশংকর রায় ৩০, ৭৮, ১০৯
স্নিগ্ধা মুখার্জি ১২৯
'স্পিরিট অ্যান্ড ফর্ম অব ইন্ডিয়ান পলিটি' ১৪৯
সীতারাম কেশরি ৪১, ৪২, ৫০, ৫১
সুইজারল্যান্ড ১৭৭
সুগত [বসু] ২০, ২৪-২৬, ৩২, ৪৬, ৫৫, ৫৮-৬০, ৬৪, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৯৬, ৯৯-১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৬, ১২৩-১২৭, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৪২-১৪৫, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৬১, ১৬৫, ১৭০, ১৭৪, ১৯০
সু চি ১১৮, ১৮৯
সুদীপ ৫৭, ৫৮, ৬৭, ৭৩, ১৩১, ১৪১
সুদীপদা দ্র. সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭, ৬৭, ৮৭, ১৪০, ১৮২, ১৮৬
সুধা মুরথি ১৭০
সুধীন্দ্র কুলকার্নি ৮১, ১০৯, ১১০, ১২৩
সুন্দরম দ্র. নগসুন্দরম
সুফল ১৩৪
সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি ৪৩
সুব্রত মুখার্জি দ্র. সুব্রত মুখোপাধ্যায়
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ১৫, ১০৯, ১৪৫, ১৭১, ১৭৩, ১৭৯
সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ৭৬
সুভাষচন্দ্র দ্র. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
সুভাষচন্দ্র বসু দ্র. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
'সুভাষ নগর' ৫১
সুভাষবাবু দ্র. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
সুমন চট্টোপাধ্যায় ১২৯
সুমন্ত্র [বসু] ১০, ১৫, ২৪-২৬, ৪৬, ৫৫, ৬০, ৬৩-৬৫, ৮১, ৮৬, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৬-১০৯, ১১১, ১১২, ১২৬, ১২৯, ১৪৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬৫, ১৭৪, ১৭৫
সুমিত্রা মহাজন ৫২, ১০০
সুরজিৎ সিং বার্নালা ৪৫
সুরাবর্দি দ্র. শায়েস্তা সুরাবর্দি
সুরেশ প্রভু ৮৮, ১৫৩
সুশীল সিন্ধে ৮৭, ১২৫
সুষমা স্বরাজ ১৭৮
সেনেগাল ৯১
সেন্টার অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ১৫৬
সেন্ট্রাল হল ২, ১৬৭-১৬৯, ১৯৫
সেলিম শেরওয়ানি ১৫৪
সেলুলার জেল ১৭৬
সৈয়দ দ্র. পি. এম সৈয়দ ৭৩, ৭৪
সৈয়দা আবিদা হুসেন ১৭৪
সোনাল মান সিং ১৭১
সোনালী দ্র. সোনালী গুহ
সোনালী গুহ ৭, ১৩, ২২, ২৫, ২৬, ৬১
সোভিয়েট রাশিয়া ৯০, ১৮৮
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৫, ৬৬, ৭১, ১৫০, ১৫২, ১৮০
সোমেন মিত্র ৭, ৮, ১৩, ১৪, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ১৮১
সৌগত দ্র. সৌগত রায়
সৌগত রায় ৫৬, ১১০
সৌরভ গাঙ্গুলি ১৭১
স্ট্রোব টলবট ৯০, ১৫৬

'হজ' বিল ১২৫
হবিবুর রহমান ৮, ১৪২, ১৮৯
হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৯২
'হলোকস্ট মিউজিয়াম' ৯৪
হর্ষ ভাসিন ১৫৮, ১৫৯
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬, ১৪৪, ১৫৮, ১৭০, ১৭৪, ১৯৪
হাম্‌রে [Hamre] ১৫৬
হামিদ আনসারি ১৫২
হায়দ্রাবাদ হাউস ১২০, ১২১
হায়াসিদা ১৪২
হাংরি টাইডস ১৭৪
হিউবার্ট ভেড্রিন [Vedrine] ১১৮, ১১৯
হিথরো বিমানবন্দর ১৪৪
হিমাচল প্রদেশ ১৬৫
হিমাচল সোম ৮৮
হিরাবায়াশি [জাপানি রাষ্ট্রদূত] ১২৮, ১২৯
হিলারি ক্লিন্টন ১৫৬, ১৫৭
হেমেন গুপ্ত ১৩৬
হেমেন বড়ুয়া ১০৫
'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন' ১৫৬
হেস্টিংস গণনাকেন্দ্র ৬৫
হো চি মিন সরণি ১৭৫
হোটেল ক্লি [Klee] ১৫৩
হোমি ভাবা [অধ্যাপক, হার্ভার্ড] ১৭৪